

মাধ্যমিক কৃষি-বিজ্ঞান

হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

DAS GUPTA & CO. PRIVATE LTD.
CALCUTTA

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক নির্দ্ধারিত উচ্চতর মাধ্যমিক ও বহু
উদ্দেশ্যমূলক বিদ্যালয়ের **নবম শ্রেণীর** সম্পূর্ণ
পাঠ্যবিধান অনুযায়ী প্রণীত।

মাধ্যমিক কৃষিবিজ্ঞান

প্রথম খণ্ড

শ্রীহারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ফুলিয়া—গভর্ণমেণ্ট এগ্রিক্যাল্‌চারল্‌ ইন্‌স্‌টিউটের অধ্যক্ষ (অবসর প্রাপ্ত)
বেঙ্গল কো-অপারেটিভ জার্ণাল ও ভাণ্ডার পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক।

দাশ গুপ্ত এণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিমিটেড
৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক : এ. সি. দাশগুপ্ত
৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ—মে ১৯৬০

মুল্য—ছয় টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে
এক্সপ্রেস প্রিণ্টার্স প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ

কৃষিরসায়ন

দ্বিতীয় ভাগ

উদ্ভিদবিদ্যা

তৃতীয় ভাগ

প্রাণিবিদ্যা

চতুর্থ ভাগ

সাধারণ কৃষি, মাটির পরিচর্য্যা ও ফসল উৎপাদন

ষষ্ঠ ভাগ

মৎস্য চাষ

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুখবন্ধ

অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য হইতে রসায়ন বিষয়ে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা দ্বারা ছাত্রদের পক্ষে উচ্চতর শ্রেণীর কৃষি-রসায়নের পাঠ্য-বিধান অনুধাবন করা সম্ভবপর হয় না। কৃষিরসায়ন পাঠ্যারম্ভের পূর্ব্বে রসায়ন শাস্ত্রের মূল বিষয়-গুলির সহিত কিছু পরিচয় থাকা একান্ত আবশ্যক। স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে ইহা উপলব্ধি করিয়া রসায়ন বিদ্যার প্রাথমিক বিষয়গুলি এই পুস্তকের কুঞ্জিকায় সন্নিবেশ করা হইল। প্রারম্ভে কুঞ্জিকা অংশটি অনুশীলন করিয়া লইলে কৃষি-রসায়নের পাঠ্যবিধান অনুধাবন করা ছাত্রদের পক্ষে সহজসাধ্য হইবে।

উদ্ভিদের রোগ, জৈবপদার্থ ও মাটির মধ্যে জৈবনিক ক্রিয়া, অ্যাল্‌জি ও ব্যাক্‌টিরিয়া দ্বারা মাটিতে নাইট্রোজেন সংযোগ প্রভৃতি বিষয়গুলি বোধগম্য করিবার জন্য অ্যাল্‌জি, ফ্যান্‌জি ও ব্যাক্‌টিরিয়া সম্বন্ধে প্রথমে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এইগুলির সহিত ছাত্রদের পরিচিতির উদ্দেশ্যে এই পুস্তকের উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগের সহিতও একটি কুঞ্জিকা প্রদত্ত হইল।

উচ্চতর বহু উদ্দেশ্যমূলক বিদ্যালয়গুলিতে বর্ত্তমানে বিজ্ঞানশাস্ত্রবিদ প্রধান শিক্ষক বিরল। কলাশাস্ত্রবিদ প্রধান শিক্ষক মহোদয়গণের কৃষি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা অস্পষ্ট থাকা স্বাভাবিক। কৃষিশিক্ষণ সুষ্ঠুভাবে পরিচালন এবং তৎসংক্রান্ত আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ বিষয়ে তাঁহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব অনেক সময় অসুবিধা সৃষ্টি করে। এই পুস্তক ঐ সকল অসুবিধা দূর করিবার পক্ষে সহায়ক হইতে পারে।

মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ কর্তৃক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ইংরাজি ভাষায় হইবার সিদ্ধান্ত হওয়ায় ছাত্রদের বুঝিবার পক্ষে সুবিধার জন্য বৈজ্ঞানিক ও দুরূহ শব্দ-সমূহ ইংরাজি ও বাংলা পরিভাষায় লিখিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ।

মাধ্যমিক কৃষি-বিজ্ঞান পুস্তক রচনায় যে সকল পুস্তকের সাহায্য লওয়া হইয়াছে সেইগুলির তালিকা প্রদত্ত হইল।

শ্রীহারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

References

Lyon, Buckman and Brady—Nature and properties of soils

G. W. Robinson —The Soil

A. K. Y. N. Aiyer —Principles of crop Husbandry in India.

Field crops of India.

B. M. Pugh —Production of Field crops in India.

A. M. Smith —Fertilizers and Manures.

C. P. Dutt & B. M. Pugh—Farm Science and crop production in India.

J. A. Daji —Manures and Manuring.

Directorate of Agri. W. B.—Rapid chemical tests of Soils to estimate crops and soil rquirements of Manures and fertilizers.

B. M. Pugh —Soil Sceince and Climatology.

Ramiah and Srivastav —Agricultural Implements for Indian farmer.

N. N. Dastur —Clean Milk.

K. C. Mahanta —Introduction to Animal Husbandry.

A. K. Y. N. Aiyer —Milk and Milk Products.

R. N. Sinha —Dairy chemistry.

R. L. Kaura —Cattle Development in U. P.

A. K. Fawkes —Poultry farming in the east.

K. H. Alikunhi —Fish culture in India.

C. B. Hall —Pond and fish culture.

K. C. Saha —Mach chaser katha.

A. C. Dutt	—Class Book of Botany.
H. C. Mukhopadhya	—Udvid Bidya.
Kundu and Chatterjee	—Text-book of Biology.
C. N. Acharya	—Preperation of compost Manure from wastes.
S. V. G. Rajan	—Composts their importance and their manufacture.
M. N. Basak	—Water Hyacinth compost.
W. B. Hayes	—Fruit growing in India.
Farminger	—Gardening in India.
Dr. H. C. Chaudhuri	—Potato Cultivation in W. Bengal.
R. K. Tandon and S. P. Dhandyal	—Principles and Methods of farm Management.
B. B. Mundkur	—Fungi and Plant disease.
S. Chowdhury	—Plant diseasa.
Publication of the Govt. of India.	—India in 1958.

Publications of the Indian Council of Agricultural Research.

Publications of the Directorate of Agriculture—W. Bengal.

প্রথম খণ্ড পরিচিতি

প্রথম পরীক্ষাপত্র

প্রথম ভাগ—কৃষি-রসায়ন

দ্বিতীয় ভাগ—উদ্ভিদবিদ্যা

তৃতীয় ভাগ—প্রাণিবিদ্যা

দ্বিতীয় পরীক্ষাপত্র

চতুর্থ ভাগ—সাধারণ কৃষি, মাটির পরিচর্য্যা
ও ফসল উৎপাদন।

তৃতীয় পরীক্ষাপত্র

পঞ্চম ভাগ—খামার পরিচালন ও পশু পালন।

ষষ্ঠ ভাগ—মৎস্য চাষ।

প্রথম পরীক্ষাপত্র

প্রথম ভাগ

কৃষি-রসায়ন

SYLLABUS

Nitrogen—Occurence, importance in nature, preperation, properties. Compounds of Nitrogen—ammonia ; sulphate, chloride and nitrate of ammonia ; their preperation, properties and uses. Manufacture of Ammonium Sulphate, Sindri fertilizer factory.

Practical—Preperation of Nitrogen and ammonia in the Laboratory, occurence of Nitrogen in the air (Demonstration). Examination of Ammonium nitrate, Sulphate and Chloride Crystalline structure, solubility, changes on exposure to air, action of lime.

সূচী

কৃষি-রসায়ন

কুঞ্জিকা

বর্ত্তমান কালকে বিজ্ঞানের যুগ বলা হয়। চিন্তাশীলমানুষ পরীক্ষা ও নিরীক্ষা ব্যতীত কোন কিছু স্বীকার করিতে নারাজ। এই বিচার শক্তি হইতে বিজ্ঞানের উদ্ভব। বিজ্ঞানের অর্থ বিশিষ্ট জ্ঞান। বিজ্ঞান শাস্ত্র নানা শাখায় বিভক্ত। উহাদের মধ্যে যে শাখায় পদার্থের উপাদান, গঠন, তাহার প্রকৃতি ও ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় তাহাকে রসায়নশাস্ত্র বলা হয়। এই শাস্ত্রের গোড়ার কথা হইল পদার্থের উৎপত্তি অর্থাৎ বিভিন্ন পদার্থ কিরূপে গঠিত হইয়াছে।

অণু (Molecule)

অসংখ্য পদার্থের সমবায়ে বিশ্বগঠিত। ১০০টি মূল পদার্থ হইতে যাবতীয় পদার্থ গঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক পদার্থ আবার কয়েকটি অণুর দ্বারা গঠিত। পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ যাহা মুক্ত অবস্থায় থাকিতে পারে এবং পদার্থের সকল ধর্ম্ম (properties) অর্থাৎ বিশেষগুণ উহাতে বর্ত্তমান থাকে তাহাকে অণু (Molecule) বলে, অর্থাৎ যৌগিক পদার্থের স্বাধীন সত্ত্বা বিশিষ্ট ক্ষুদ্রতম অংশ। পদার্থের প্রতিটি অণু একই প্রকার হয়, ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের অণু বিভিন্ন। পদার্থের ধর্ম্ম, উহার অণুরই ধর্ম্ম।

পরমাণু (Atom) :—অণুকে আবার আরো ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা যায়। অণুকে বিভক্ত করিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহার নাম পরমাণু (atom)। পরমাণু হইল মৌলিক পদার্থের (Elements) ক্ষুদ্রতম বিভাজন, যাহার রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে

পারে। ইহা কখনও একক বা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকিতে পারে না। Atom শব্দের অর্থ যাহাকে আর ভাগ করা যায় না, অর্থাৎ বস্তুর অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম অংশ। ইহাই ছিল প্রাচীন বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা ও ধারণা। বহুকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষে মহর্ষি কণাদ তাঁহার বৈশেষিক দর্শনে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

জলের একটি অণুকে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় ইহার মধ্যে তিনটি পরমাণু রহিয়াছে। একটি অক্সিজেন গ্যাসের, আর দুইটি হাইড্রোজেন গ্যাসের। সেইজন্য জলের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা H_2O। H_2 অর্থাৎ হাইড্রোজেনের দুই পরমাণু এবং অক্সিজেনর একটি পরমাণু। এই তিনটি পরমাণু মিলিয়া জলের একটি অণু গঠিত। সাধারণ খড়িমাটির (chalk) একটি অণুতে ৫টি পরমাণু রহিয়াছে— ক্যাল্‌সিয়ামের (calcium) একটি, কার্বনের (carbon) একটি এবং অক্সিজেনের তিনটি মিলিয়া খড়ির একটি অণু $CaCo_3$ গঠিত হইয়াছে।

পরমাণুর বিভাজন :—যদিও প্রাচীন বিজ্ঞানীরা পরমাণুই পদার্থের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য অংশ বলিয়াছিলেন কিন্তু আধুনিক কালের বিজ্ঞানীরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে পরমাণুকেও বিশ্লেষণ করা যায়। অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণিকা দ্বারা উহা গঠিত। কণিকাগুলির মধ্যে ইলেক্‌ট্রন, প্রোটন্‌ ও নিউট্রন্‌ প্রধান।

বিজ্ঞানীরা এক একটি পরমাণুকে এক একটি সৌরমণ্ডলের সহিত তুলনা করিয়াছেন। সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া যেমন গ্রহগণ অবিরাম ঘুরিতেছে এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বহুলক্ষ মাইল ব্যবধান রহিয়াছে, তেমনি এই পরমাণুর মধ্যে একটি কেন্দ্রক (Nucleus) আছে। উহাকে মধ্যে রাখিয়া ঐ কণিকাগুলি অসম্ভব বেগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কেন্দ্রক ও কণিকাগুলির মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান। আবার উহাদের পরস্পরের মধ্যেও ব্যবধান কম নয়। কেন্দ্রক্‌কে ঘিরিয়া যে ইলেক্‌ট্রন কণিকাগুলি প্রচণ্ড বেগে

ঘুরিতেছে সেইগুলি অপরাবিদ্যুতায়িত (Charged with Negative electricity) এবং প্রোটন কণিকাগুলি পরাবিদ্যুতায়িত (charged with positive electricity) এবং নিউট্রন কণিকাগুলি তড়িৎ নিরপেক্ষ (Electrically neutral)। সুতরাং পরমাণু, পদার্থের শেষ বিভাজন নয়। পরমাণু মাত্রই ইলেক্‌ট্রন্, প্রোটন্ ও নিউট্রন দ্বারা গঠিত। সমস্ত মৌলিক পদার্থের গঠনের মূল উপাদান একই। বিভিন্ন মৌলের মধ্যে যে পার্থক্য লক্ষিত হয় তাহার কারণ উহাদের পরমাণুর মধ্যে ইলেক্‌ট্রন্ ও প্রোটনের সংখ্যার তারতম্য। পরমাণু সমগ্রভাবে তড়িৎ নিরপেক্ষ।

যৌগিক পদার্থ (Compound) :—যে সব পদার্থের অণু বিভিন্ন প্রকার পরমাণুর সংযোগে গঠিত তাহাদের বলা হয় যৌগিক পদার্থ (Compound)। জল, খড়িমাটি, লবণ প্রভৃতি যৌগিক পদার্থ। ইহাদের প্রতিটি অণুর মধ্যে দুই বা দুইএর অধিক উপাদানের পরমাণু সংযুক্ত রহিয়াছে, যেমন জল H_2O, খড়িমাটি $CaCO_3$ সাধারণ লবণ NaCl।

মৌলিক পদার্থ (Element) :—কিন্তু O, H, Ca, C প্রভৃতি প্রত্যেকেই এক একটি মৌলিক উপাদান। ইহাদের একটি অণু বিশ্লেষণ করিলে একটি মাত্র O, H, Ca অথবা Cএর পরমাণু পাওয়া যাইবে। একটি হাইড্রোজেনের অণু ভাগ করিলে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যাইবে না।

সাধারণ মিশ্রণ (Mechanical mixture) :—দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ মিশাইলে যে পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহাকে মিশ্রপদার্থ বলে (Mechanical mixture)। মিশ্র পদার্থের মধ্যে যে সব উপাদান থাকে তাহাদের স্ব স্ব ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকে, এবং উপাদানগুলির পরিমাণ বা ওজনের অনুপাতের কোন স্থিরতা থাকে না। উহারা মিশিয়া এক হইয়া যায় না। উপাদানগুলিকে সহজে পৃথক করা যায়। যেমন বায়ু—উহার উপাদান নাইট্রোজেন,

অক্সিজেন, কার্ব্বনডাইঅক্সাইড, জলীয় বাষ্প, আর্গন প্রভৃতি গ্যাস মিশ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে।

যৌগিক পদার্থ (Chemical compound) ঃ—দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে কোন পদার্থ উৎপন্ন হইলে তাহাকে যৌগিক পদার্থ (Chemical compound) বলে। যে সকল উপাদান দ্বারা ঐ পদার্থ গঠিত হয় সেই উপাদানগুলির স্ব স্ব ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্ম্মবিশিষ্ট পদার্থে পরিণত হয়। যৌগিক পদার্থের উপাদানগুলি সর্ব্বদাই নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে থাকে। উপাদানগুলির তারতম্য ঘটিলে ভিন্ন পদার্থে পরিণত হয়। যৌগিক পদার্থের উপাদানগুলি সহজে পৃথক করা যায় না। উপাদানগুলি মিলিত হইয়া পদার্থের গঠনকালে তাপের উদ্ভব হয়। যেমন চূণের সহিত জল মিশাইলে রাসায়নিক সংযোগ হইয়া তাপের উদ্ভব হয়।

পদার্থের ধর্ম্ম (Properties) ঃ—পদার্থের বিশেষ গুণকে উহার ধর্ম্ম বলে। একটি পদার্থকে অন্য পদার্থে রূপান্তরিত না করিয়া উহার যে সকল ধর্ম্ম লক্ষ্য করা যায় সেইগুলি উহার ভৌতধর্ম্ম (Physical properties), রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যে ধর্ম্মগুলি প্রকাশ পায় সেইগুলি রাসায়নিক ধর্ম্ম (Chemical properties)।

পদার্থের আকৃতি, বর্ণ, দ্রাব্যতা, ঘনত্ব, স্ফুটনাঙ্ক, হিমাঙ্ক প্রভৃতি উহার ভৌতধর্ম্ম। যেমন বিশুদ্ধ বালি বর্ণহীন, বালুকণা কোণাকৃতি, পরস্পর সংযুক্ত থাকে না, জল অপেক্ষা ভারি, অতি দ্রুত জল শোষণ সক্ষম, এইগুলি বালির ভৌতধর্ম্ম। বিশুদ্ধ বালি কেলাসিত সিলিকা, ইহা বালির রাসায়নিক ধর্ম্ম।

মৌলিক পদার্থের সংজ্ঞা ঃ—বর্ত্তমানে প্রায় ১০০টি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কৃষি রসায়ন আলোচনাকালে যেগুলির সহিত সচরাচর পরিচয় ঘটে সেইগুলির বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা প্রদত্ত হইল। প্রয়োজনবোধে অন্যান্যগুলি যে কোন রসায়ন পুস্তকে

দেখা যাইতে পারে। মৌলিক পদার্থগুলি চারি প্রকার ঃ—খনিজ (Metal), অখনিজ (Nonmetal), তরল (Liquid) এবং গ্যাসীয় (Gaseous)। যে সকল ধাতু বিশেষ ঔজ্জ্বল্য বিশিষ্ট হয় (possess a piculiar lustre known as metallic lustre) তাহারা খনিজ (Metal) শ্রেণীর অন্তর্গত। যাহাদের ঐরূপ ঔজ্জ্বল্য নাই তাহারা অখনিজ (Non-Metal)। পদার্থের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

কঠিন খনিজ (Solid metals)

Sodium—Na	Copper—Cu
Potassium—K	Zinc—Zn
Magnesium—Mg.	Tin—Sn
Calcium—Ca	Lead—Pb.
Aluminium—Al.	Molybdenum—Mo
Manganese—Mn.	Silver—Ag.
Iron—Fe	Gold—Au.
Cobalt—Co	Nickel—Ni

অখনিজ (Non-Metals)

Boron—B.	Phosphorous—P
Carbon—C	Sulphur—S
Silicon—Si.	Iodine—I

গ্যাসীয় (Gasesous)

Hydrogen—H	Oxygen—O
Nitrogen—N	Chlorine—Cl.

তরল (Liquid)

Mercury—Hg. (Metal) Bromine—Br. (Nonmetal)

যোজ্যতা (Valency)

দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের পরমাণুর রাসায়নিক শক্তি (Chemical force) সংযোগে যৌগিক পদার্থের একটি অণুগঠিত হয়। এই সংযোগ যথেচ্ছভাবে হয় না, বিশেষ নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক পরমাণুর সংযোগ ঘটে। একটি অক্সিজেন পরমাণু দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হইয়া একটি জলের অণুগঠন করে H_2O। একটি ক্যালসিয়ামের পরমাণু একটি অক্সিজেনের পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হইয়া একটি চূণের অণু CO গঠন করে। এইরূপে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু অন্য মৌলের এক বা একাধিক সংখ্যক পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হইয়া উহাদের এক একটি অণু সৃষ্টি করে। এইরূপ প্রত্যেকটি মৌল পরমাণুর ভিন্ন মৌল পরমাণুর সহিত সংযোগের একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা আছে। ইহা উক্ত মৌলের যোজ্যতা। মৌলের সংযোগ শক্তিকে (Combining Capacity) উহার যোজ্যতা (Valency) বলে।

একটি হাইড্রোজেনের পরমাণুকে একক (unit) হিসাবে ধরিয়া মৌলিক পদার্থের যোজ্যতা নির্দ্ধারণ করা হয়। কতকগুলি মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেনের সহিত সংযুক্ত হয় না, কিন্তু ক্লোরিন্, ফ্লোরিন প্রভৃতির সহিত তাহাদের সংযোগ ঘটে। ক্লোরিন ও ফ্লোরিনের যোজ্যতা হাইড্রোজেনের সমান অর্থাৎ এক। সুতরাং ঐ মৌলগুলির যোজ্যতা ক্লোরিনের অনুপাতে ধরা হয়, যেমন স্বর্ণ (gold) হাইড্রোজেনের সহিত সংযুক্ত হয় না। কিন্তু এক পরমাণু স্বর্ণ তিন পরমাণু ক্লোরিনের সহিত সংযুক্ত হয়, সেই কারণে স্বর্ণের যোজ্যতা তিন ধরা হয়।

অম্ল (Acid), ক্ষারক (Base) ও ক্ষার (Alkali)

প্রকৃতিজাত সকল পদার্থ অম্ল, ক্ষার কিম্বা ঐ দুই ধর্ম্ম নিরপেক্ষ হয়।

অম্ল ঃ—ইহা যৌগিক পদার্থ। ইহার মধ্যে হাইড্রোজেন থাকে।

এই হাইড্রোজেন খনিজ অথবা খনিজের মত ধর্ম্মবিশিষ্ট কতকগুলি মৌলিক পদার্থ, যেমন অ্যামোনিয়া NH_3, দ্বারা সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে অপসারণ করা যায়। হাইড্রোজেন অপসারিত হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা লবণ (salt)। যেমন—Hydrochloric acid —HCl, Hydrocyanic acid—HCN, Hydrosulphuric acid—H_2S। কোন কোন অম্লে হাইড্রোজেন ব্যতীত অক্সিজেনও থাকে, ইহাদিগকে Oxy acid বলে, যেমন—Sulphuric acid H_2SO_4, Nitric acid HNO_3 Nitrous acid HNO_2, Phosphoric acid H_3PO_4।

অ্যাসিডের সংজ্ঞা (Nomenclature of acids) :—অ্যাসিডে অক্সিজেনের অনুপাত কম থাকিলে 'ous', অধিক থাকিলে 'ic' যুক্ত হয়। অতি অল্প থাকিলে Hypo (below), অত্যধিক থাকিলে per যুক্ত হয়, যেমন—

HNO_2—Nitrous acid
HNO_3—Nitric acid
$H_2N_2O_2$—Hyponitrous acid
H_2SO_3—Sulphurous acid
H_2SO_4—Sulphuric acid
$H_2S_2O_4$—Hyposulphurous acid
$H_2S_2O_8$—Per sulphuric acid
H_3PO_3—Phosphorous acid
H_3PO_4—Phosphoric acid
H_3PO_2—Hypophosphorous acid.

বিজ্ঞানীরা অ্যাসিডকে দুইভাগে বিভক্ত করেন—(i) অজৈব বা খনিজ অ্যাসিড (Inorganic), উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলি এই বিভাগের অন্তর্গত।

(ii) জৈব অম্ল (organic acid), যেমন—acetic acid, vine-

garএ থাকে, Tartaric, Citric, Malic, Oxalic, Formic acids প্রভৃতি উদ্ভিদের মধ্যে পাওয়া যায়। জৈব পদার্থ পচিয়া Humic acid উৎপন্ন হয়।

অম্লের পরীক্ষা

(i) স্বাদে—অম্ল,

(ii) স্পর্শে—নীল লিটমাস লালবর্ণ ধারণ করে।

খনিজ অম্লগুলির মধ্যে তিনটি প্রধান :—হাইড্রোক্লোরিক, সাল্‌ফিউরিক্ ও নাইট্রিক্ অ্যাসিড।

ক্ষারক (Base) :—এই পদার্থ খনিজের অক্সাইড বা হাইড্রক্‌সাইড খনিজের সহিত অক্সিজেন যুক্ত থাকিলে অক্সাইড এবং খনিজের অক্সাইডের সহিত জলের রাসায়নিক সংযোগে হয় হাইড্রকসাইড যেমন, Na_2O সোডিয়াম অক্সাইড, $Na_2O+H_2O=2NaOH$ সোডিয়াম হাইড্রকসাইড।

ক্ষারকের সহিত সংযোগে অম্ল নিরপেক্ষধর্মী বা শমিত হইয়া যায় (Neutralised)। ঐ পদার্থে ক্ষারকের ক্ষারত্ব এবং অম্লের অম্লত্ব অন্তর্হিত হইয়া দুইটি পদার্থে পরিণত হয়—একটি লবণ (Salt) অপরটি জল। যেমন—

Oxide—$CaO+2HCl=CaCl_2+H_2o$

(Base) (acid) (Salt) (water)

Hydroxide—$Zn(OH)_2+H_2SO_4=ZnSO_4+2H_2O$

Group of elements act like base—$(NH_4)OH+HNO_3=(NH_4)NO_3+H_2O$.

খনিজের অক্সাইড ক্ষারময় (basic) এবং অখনিজের অক্সাইড অম্লময় (acidic) হয়।

ক্ষার (Alkali) :—তীব্র ক্ষারককে (base) বলে ক্ষার (alkali)। ক্ষার জলে দ্রবনীয়। ঐ দ্রবণ স্পর্শে পিচ্ছিল, (Soapy in touch)। Caustic Soda NaOH, Caustic

Potash KOH, Calcium Hydroxide $Ca(OH)_2$ প্রভৃতি বিশিষ্ট ক্ষারের উদাহরণ।

ক্ষারের পরীক্ষা—

(i) স্বাদ—ক্ষারময়,

(ii) ক্ষারদ্রবণ জলে দ্রবীত হয়,

(iii) স্পর্শে পিচ্ছিল (Soapy),

(iv) লাল লিট্মাস্ নীলবর্ণে পরিণত হয়।

লবণ (Salts) ঃ—লবণ যৌগিক-পদার্থ। অম্লের সহিত খনিজ অথবা খনিজের মত গুণবিশিষ্ট কতকগুলি মৌলিক পদার্থ সংযোগে অম্লের হাইড্রোজেন বিযুক্ত হইয়া যাইলে দুইটি পদার্থ পাওয়া যায় একটি লবণ অপরটি জল, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। লবণ তিন প্রকার—

(১) শমিত লবণ (Neutral or Normal Salt), যেমন—KNO_3, Na_2SO_4, NaCl, Na_3PO_4 ;

(২) অম্ললবণ (acid Salt)—অম্লের অণুগুলি হইতে হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি সম্পূর্ণ অপসারিত না হইয়া কিছু থাকিয়া যাইলে উহাকে অম্ললবণ বলে। যেমন $NaHSO_4$, Na_2HPO_4। অম্ললবণের সহিত ক্ষার মিশাইয়া উহাকে শমিত লবণে পরিণত করা যায় ;

(৩) ক্ষারলবণ (Basic Salt) শমিত লবণ উৎপাদনকালে অম্লের সহিত যে পরিমাণ ক্ষারকের প্রয়োজন হয় তদপেক্ষা অধিকমাত্রায় ক্ষারক সংযুক্ত হইলে ক্ষারক লবণ হয়। যেমন $Pb(OH)_2$ white lead।

লবণের পরীক্ষা

লিটমাস্ দ্বারা লবণ দ্রবণ অম্ল, ক্ষার বা শমিত নির্ণয় করা যায়।

লবণের নামকরণ (Nomenclature of Salts) ঃ—অম্লের প্রকার অনুযায়ী লবণের নামকরণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ Oxy acid—"ic" হইলে লবণ হয় "ate" এবং "ous" হইলে লবণ হয় "ite"। ic অম্ল হইতে ate লবণ এবং ous অম্ল হইতে ite লবণ হয়। যেমন ঃ

Oxy acids	*Salts*
Sulphuric acid	Calcium Sulphate
Phosphoric acid	Sodium phosphate
Nitrous acid	Ammonium Nitrite
Nitric acid	ammonium Nitrate

Hydrochloric acid জাত লবণকে Chlorides, Sulphuric acid জাত লবণকে Sulphates, Nitric acid জাত লবণকে Nitrates বলে।

শমিত পদার্থ (Neutrals) ঃ—পদার্থে অম্ল অথবা ক্ষারের কোন ধর্ম্ম না থাকিলে তাহাকে শমিত পদার্থ (neutral) বলে। যদিও H_2Oর মধ্যে হাইড্রোজেন রহিয়াছে কিন্তু ঐ হাইড্রোজেন খনিজ দ্বারা অপসারন করা যায় না, সুতরাং উহা অম্ল নয়। আবার ইহা কোন Oxide বা Hydroxideও নয়। সুতরাং ইহা ক্ষারক নয়। অতএব ইহা শমিত পদার্থ। শমিত পদার্থ দ্বারা লিট্‌মসবর্ণের কোন পরিবর্তন হয় না।

দ্রবণ ও দ্রাব্যতা

দ্রবণ, দ্রাবক, দ্রাব (Solution, Solvent, Solute) :— তরল পদার্থের সহিত যে কোন পদার্থ—কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় ওত-প্রোতভাবে মিশিয়া দ্রবীভূত হইলে ঐ তরল মিশ্রণকে বলে দ্রবণ (Solution)। দ্রবণের মধ্যে যেটি অধিক থাকে তাহাকে দ্রাবক (Solvent) এবং যেটি কম থাকে তাহাকে দ্রাব (Solute) বলে। যেমন জলে চিনি, কোহল ও অ্যামোনিয়া গ্যাস দ্রবীত হয়। ঐ চিনির জল, কোহল জল, অ্যামোনিয়াম জল চিনি, কোহল ও অ্যামোনিয়ার দ্রবণ, জল—দ্রাবক, চিনি, কোহল ও অ্যামোনিয়া দ্রাব।

সম্পৃক্ত দ্রবণ (Saturated Solution) :—যে সকল কঠিন পদার্থ তরল পদার্থে দ্রবিত হয়, তাহাদের স্বাভাবিক তাপে (at ordinary temperature) ক্রমান্বয়ে তরল পদার্থে মিশাইতে থাকিলে এমন একটি অবস্থা আসে যখন উহা আর দ্রবিত হয় না। ঐরূপ দ্রবণকে সম্পৃক্ত দ্রবণ বলে (saturated solution)।

অতিপৃক্ত দ্রবণ ও কেলাসন (Super saturated solution and Crystallisation) :—তাপ বৃদ্ধি করিলে ঐ কঠিন পদার্থ অধিক পরিমাণে দ্রবিত হয়। উহাকে অতিপৃক্ত দ্রবণ বলে। অতিপৃক্ত দ্রবণ শীতল হইলে ঐ অতিরিক্ত পদার্থ কঠিন হইয়া দানা বাঁধিয়া যায়। দানাগুলি জ্যামিতিক আকার ধারণ করে। বিভিন্ন পদার্থের দানার আকার বিভিন্ন প্রকার হয়। সাধারণ লবণের দানার আকার জ্যামিতিক ঘনকের মত, ফট্‌কিরির আকার সমঅষ্টতলী (Regular Octahedron)। প্রত্যেক পদার্থের দানার একটা আকৃতিক বৈশিষ্ট্য থাকে। দানার আকৃতি দেখিয়া পদার্থটি চেনা যায়। দানাগুলিকে বলে স্ফটিক (Crystals) এবং উক্ত প্রক্রিয়াকে বলে স্ফটিকীকরণ বা কেলাসন (Crystallisation)।

কেলাসন জল (Water of Crystallisation) :—দানা বাঁধিবারকালে কোন কোন পদার্থের স্ফটিকের মধ্যে কিছু জল থাকিয়া যায়। প্রতিটি অণুর সহিত নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক জলের অণু সংযুক্ত হয়। স্ফটিকের মধ্যে এইপ্রকার জলকে বলে কেলাসন জল এবং ঐরূপ পদার্থকে বলে সোদক (Hydrate)। তাপ প্রয়োগ করিলে ঐ জল নির্গত হইয়া যায়। পদার্থ আর দানার আকারে থাকে না, চূর্ণ বা গুঁড়ায় পরিণত হয়। যেমন তুঁতের মধ্যে (Blue vitriol) $CuSO_4$ থাকে $5H_2O$, Sodium Sulphate Na_2SO_4 এর মধ্যে থাকে $10H_2O$।

সোদক লবণ :—যে সকল স্ফটিকের মধ্যে কেলাসন জল থাকে তাহাদের বলে সোদক লবণ (Hydrated salt)। তাপ প্রয়োগে কেলাসন জল বাহির করিয়া দিলে উহা চূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন উহাকে বলে **নিরুদক লবণ** (Anhydrous or dehydrated salt)।

অনিয়তকার পদার্থ (Amorphous) :—যে সকল পদার্থের স্ফটিক হয় না, তাহাদের বলে অনিয়তকার পদার্থ।

উদত্যাগী লবণ (Efflorescent salt) :—সাধারণ অবস্থায় বায়ুর মধ্যে উন্মুক্ত থাকাকালে যেসব স্ফটিকের কেলাসন জল ধীরে ধীরে বিমুক্ত হইয়া যায় এবং স্ফটিক চূর্ণ অবস্থায় পরিণত হয় তাহাদের বলে উদত্যাগী পদার্থ। যেমন সাধারণ কাপড় কাচা সোডা Na_2CO_3, $10H_2O$। ইহার ১০টি H_2O অণুর ৯টি অণু বাহির হইয়া যায় এবং সোডা গুঁড়া অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

উদগ্রাহী পদার্থ (Deliquescent substance) :—কোন পদার্থের স্ফটিক স্বাভাবিক তাপে বায়ুতে উন্মুক্ত থাকাকালে বায়ু হইতে জলীয় বাষ্প শোষণ করিয়া দ্রবীভূত হইয়া যায়, এইরূপ পদার্থকে বলে উদগ্রাহী পদার্থ এবং ঐরূপ অবস্থান্তর ঘটাকে বলে উদগ্রহ (Deliquescence)। Calcium chloride, Mag-

nesium chloride, Potassium carbonate, Zinc Nitrate প্রভৃতি উদগ্রাহী লবণ।

জলাকর্ষী (Hygroscopic) :—যে সকল পদার্থ বায়ু হইতে জলীয় বাষ্প শোষণ করিয়া লয় তাহাদের জলাকর্ষী বা উদশোষক বলে। ইহারা কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় হইতে পারে। যেমন কঠিন—Lime চূণ, তরল—Conc. H_2SO_4 ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড, গ্যাসীয়—HCl গ্যাস। জলাকর্ষী স্ফটিক উদগ্রাহী পদার্থের পর্য্যায়ে পড়ে।

কলয়েড (Colloid) :—যে সকল পদার্থ দ্রাবকের মত জলে দ্রবিত হইয়া ওতপ্রোতভাবে সম্পূর্ণ মিশিয়া যায় না এবং উহাদের অতি সূক্ষ্ম কনিকাগুলি ফিলটার কাগজের ছিদ্রের মধ্য দিয়া চলিয়া যায় এবং বহুক্ষণ রাখিয়া দিলেও বিশেষ থিতায় না তাহাদের কলয়েড (Colloid) বলে, যেমন সাবান জল, বালির জল ইত্যাদি।

কয়েকটি সাধারণ পরীক্ষা পদ্ধতি

আস্রাবণ (Decantation) :—বালি জলে মিশাইলে জল অপেক্ষা ভারি বলিয়া কিছুক্ষণ পরে থিতাইয়া পাত্রের তলায় পড়িয়া যায়। পাত্রটি সাবধানে কাৎ করিয়া ধীরে ধীরে জল ঢালিয়া লইলে বালি থিতান অবস্থায় পাত্রের তলায় থাকে। এই প্রক্রিয়াকে আস্রাবণ বলে।

পরিস্রাবণ (Filtration) :—কাদা কিম্বা খড়ির গুঁড়া পাত্রের তলায় না থিতাইয়া জলে ভাসিতে থাকে (suspended) ফিল্টার কাগজে উহাদের ছাঁকিয়া লওয়া যায়। ইহাকে পরিস্রাবণ বলে।

পাতন (Distillation) :—লবণ জলে গলিয়া যায়। তাপ প্রয়োগ করিলে ঐ দ্রবণ হইতে জল বাষ্পীভূত হইয়া যায় এবং লবণ পাত্রের তলায় পড়িয়া থাকে। তরল পদার্থকে প্রথমে বাষ্পীভবন করিয়া পরে ঘনীভবন প্রক্রিয়ায় দ্রবণ হইতে দ্রবনীয় পদার্থকে পৃথক করাকে বলে পাতন।

কঠিন পদার্থের অন্তর্ধুম পাতন বা ধ্বংসপাতন (Destructive Distillation) :—তাপ প্রয়োগকালে কঠিন পদার্থকে পাত্র মধ্যে (বকযন্ত্রে Retort) এমন অবস্থায় রাখা হয় যাহাতে উহার মধ্যে বায়ু অবাধে প্রবেশ করিয়া পদার্থটিকে পুড়াইয়া না ফেলে। এই প্রকারে তাপ প্রয়োগ করিলে ঐ কঠিন পদার্থটির মধ্যস্থ উদ্বাহী উপাদান মুক্ত হইয়া যায়। তখন ঐ মুক্ত পদার্থটিকে পাতন করিয়া শীতল করিয়া লওয়া হয়। এই প্রক্রিয়াকে অন্তর্ধুম পাতন বা ধ্বংস পাতন বলে। কাঁচা কয়লা হইতে এই প্রক্রিয়ায় আলকাতরা, কোল গ্যাস এবং কোল গ্যাস হইতে এ্যামোনিয়া প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়।

উর্দ্ধপাতন (Sublimation) :—কোন কোন কঠিন পদার্থে তাপ প্রয়োগ করিলে তরল না হইয়া গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণত হয়। ঐ গ্যাসকে শীতল করিলে উহা আবার কঠিন অবস্থায় ফিরিয়া আসে। ইহাকে উর্দ্ধপাতন বলে।

উদ্বায়ী পদার্থ (Volatile substance) :—স্বাভাবিক তাপে উন্মুক্ত অবস্থায় থাকিলে কোন কোন পদার্থের আপনা হইতে উর্দ্ধপাতন ঘটে অর্থাৎ উবিয়া যায়। এইরূপ পদার্থকে উদ্বায়ী পদার্থ বলে। যেমন কর্পূর, আইওডিন্, ন্যাপথালিন প্রভৃতি।

প্রথম অধ্যায়

নাইট্রোজেন (Nitrogen)

N_2

বায়ুর মোট আয়তনের প্রায় ⅘ ভাগ, ৭৮.০৬ শতাংশ নাইট্রোজেন মৌলিক অবস্থায় বায়ুর মধ্যে থাকে। বায়ুতে কেবল অক্সিজেন থাকিলে উহার দাহিকা শক্তিতে সব কিছু পুড়িয়া যাইত। নাইট্রোজেন বায়ুর মধ্যে মিশ্রিত থাকায় অক্সিজেনের তেজ সংযত রহিয়াছে।

খনিজ যৌগিক অবস্থায় (Inorganic compound) নাইট্রোজেন মাটির মধ্যে প্রধানতঃ নাইটার বা সোরা KNO_3 পট্যাসিয়াম্ নাইট্রেট্ এবং চিলি সল্টপিটার সোডিয়াম নাইট্রেট $NaNO_3$ রূপে পাওয়া যায়। অ্যামোনিয়ামলবণরূপেও মাটিতে থাকে। জল ও বায়ুর মধ্যেও সামান্য পরিমাণ অ্যামোনিয়া NH_3 থাকে।

জৈব যৌগিক অবস্থায় (Organic compound) জীব ও উদ্ভিদ দেহের প্রোটিনের মধ্যে নাইট্রোজেন থাকে। প্রোটিনের মুখ্য উপাদান নাইট্রোজেন।

উদ্ভিদ ও জীবের পুষ্টির জন্য নাইট্রোজেন অত্যাবশ্যক। আমাদের দেহের শতকরা তিন ভাগই নাইট্রোজেন। বাতাসে প্রচুর নাইট্রোজেন থাকিলেও উদ্ভিদ বা প্রাণী বাতাস হইতে প্রত্যক্ষভাবে উহা লইতে পারে না। মাটির মধ্যে প্রধানতঃ জৈব পদার্থের পচন এবং উহার জৈবনিক ও রাসয়নিক পরিবর্তনের ফলে মাটিতে নাইট্রেটের উদ্ভব হয়। ঐ নাইট্রেট এবং খনিজ নাইট্রেট হইতে উদ্ভিদ আবশ্যকীয় নাইট্রোজেন গ্রহণ করিয়া দেহ গঠন ও খাদ্য প্রস্তুত করে। প্রাণীগণ উদ্ভিদ হইতে উহা আহরণ করিয়া জীবনধারণ করে।

দক্ষিণ আমেরিকার চিলি ও পেরু দেশের মাটির মধ্যে বিস্তৃত সোডিয়াম নাইট্রেট স্তর আছে। ইহাকে চিলি সল্টপিটার বলা হয়।

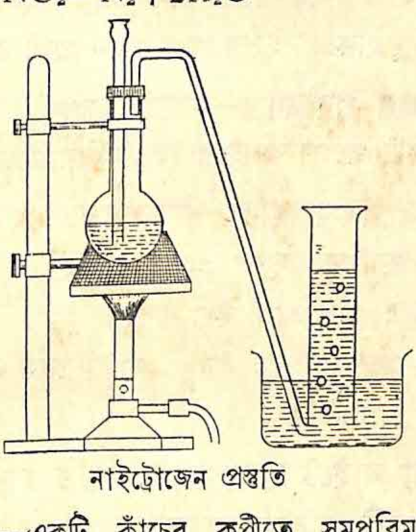
প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত (১৯১৪-১৮) চিলি সল্টপিটার জমির সার ও নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুতের জন্য সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইত। ভারতবর্ষে বহুস্থানে মাটির উপর পটাসিয়াম নাইট্রেট বা নাইটার, উদত্যাগী লবণ (Efflorescence)রূপে পাওয়া যায়। ইহাকে দেশী সোরা (Indian saltpetre) বলে। কিছু সাররূপে ইহা ব্যবহার হইত, অধিকাংশ বিদেশে রপ্তানী হইত।

বিজ্ঞানাগারে নাইট্রোজেন প্রস্তুতি

বিজ্ঞানাগারে সোডিয়াম নাইট্রাইট $NaNO_2$ এবং অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের NH_4Cl দ্রবণ মিশ্রিত করিয়া নাইট্রোজেন প্রস্তুত করা সুবিধাজনক হয়। এই দুই পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে প্রথমে অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট উৎপন্ন হয়, পরে উহা বিযোজিত হইয়া নাইট্রোজেন গ্যাস নির্গত হয়।

$$NH_4Cl + NaNO_2 = NH_4NO_2 + NaCl$$

$$NH_4\,NO_2 = N_2 + 2H_2O$$



নাইট্রোজেন প্রস্তুতি

পরীক্ষা :—একটি কাঁচের কূপীতে সমপরিমাণ সোডিয়াম নাইট্রাইট ও অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সম্পৃক্ত দ্রবণ লও। কূপীর মুখে দুইটি ছিদ্র যুক্ত একটি রবারের ছিপি আঁটিয়া দাও। ছিপির

একটি ছিদ্র দিয়া একটি থিসিল্ ফানেল এবং অপর ছিদ্র দিয়া একটি লম্বা বক্র কাঁচনল পরাইয়া দাও। একটি গ্যাসজার জলে ভরিয়া নলের অপর মুখে একটি জলপাত্র উল্টা করিয়া রাখ। এখন কূপীটি একটি তারের জালির উপর রাখিয়া ধীরে ধীরে তাপ প্রয়োগ করিলে নাইট্রোজেন গ্যাস বাহির হইতে থাকিবে। গ্যাস বাহির হইতে আরম্ভ করিলে তাপ দেওয়া বন্ধ করিতে হয়, নচেৎ বেশী উত্তপ্ত হইলে অধিক গ্যাস বাহির হইয়া বিস্ফোরণ ঘটিতে পারে। নাইট্রোজেন জলে বিশেষ দ্রবনীয় নয় বলিয়া উহা গ্যাসজারের জল অপসারিত করিয়া উহার ভিতরে ভরিয়া যাইবে। এখন ঐ গ্যাসজারের মুখ একটি কাঁচের চাক্তি দিয়া বন্ধ করিয়া বাহির করিয়া আন।

নাইট্রোজেনের ধর্ম্ম :—নাইট্রোজেন বর্ণ, গন্ধ, স্বাদহীন, স্বচ্ছ গ্যাসীয় পদার্থ। ইহা বিষাক্ত নহে। ইহা নিষ্ক্রিয়, সহজে অন্য পদার্থের সহিত সংযুক্ত হয় না। তাপস্পর্শে জ্বলিয়া উঠে না, কিম্বা দহন কার্য্যে সাহায্য করে না। জলে অতি সামান্যই দ্রবিত হয়। বায়ু অপেক্ষা কিছু হাল্কা। ইহার মধ্যে কোন প্রাণী বাঁচিতে পারে না।

নাইট্রোজেন পরীক্ষা :—নাইট্রোজেনপূর্ণ গ্যাসজারের ভিতর একটি জ্বলন্ত কাঠি প্রবেশ করাইলে উহা নিভিয়া যায়!

নাইটোজেনের ব্যবহার:—নাইট্রোজেনের সাহায্যে অ্যামোনিয়া গ্যাস, নাইট্রিক অ্যাসিড প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। ইলেক্ট্রিক বাল্ব, গ্যাস থার্মোমিটার প্রভৃতিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। রাসায়নিক সার প্রস্তুত করিবার জন্যও ব্যবহৃত হয়। নাইট্রোজেন ঘটিত খাদ্য উদ্ভিদ ও জীবের পক্ষে অপরিহার্য্য।

বায়ু মধ্যে নাইট্রোজেনের অবস্থিতি পরীক্ষা :—একটি জলপূর্ণ পাত্রে একটি সমচিহ্নিত বেল্জার স্থাপন কর। একটি প্রজ্বলনী চামচে একটুকরা ফস্ফরাস্ লইয়া উহা জ্বালিয়া বেল্জারের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দাও। কিছুক্ষণ জ্বলিবার পর ফস্ফরাস্টি নিভিয়া যাইলে

দেখা যাইবে যে বেল্‌জারের আয়তনের এক পঞ্চমাংশ স্থানে পাত্রের জল উঠিয়াছে। বায়ুর অক্সিজেনের সহিত ফস্‌ফরাসের সংযোগের ফলে একপঞ্চমাংশ স্থান শূন্য হইয়াছিল, সেই শূন্যস্থান জল অধিকার করিয়াছে। এখন বেল্‌জারের মধ্যে অবশিষ্ট $\frac{4}{5}$ অংশ বায়বীয় পদার্থ পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে উহা নাইট্রোজেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(Ammonia) NH_3

বায়ু এবং প্রাকৃতিক জলে অ্যামোনিয়া অতি সামান্য পরিমাণে থাকে (in traces)। বৃষ্টির জলেও সামান্য অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট থাকে। মাটির মধ্যে, বিশেষ আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে ইহা সাল্‌ফেট ও ক্লোরাইড অবস্থায় পাওয়া যায়। জান্তব ও উদ্ভিদ দেহ পচনের সময় অ্যামোনিয়া গ্যাস NH_3 উদ্ভব হয়। সাধারণতঃ কোল গ্যাস হইতে তরল অ্যামোনিয়া (Ammoniacal liquor) প্রস্তুত করা হয়। নাইট্রোজেন ঘটিত জৈব পদার্থ যেমন শিং, খুর, হাড় প্রভৃতি অন্তর্ধূম পাতন (Destructive distillation) করিয়া এবং অ্যামোনিয়া ঘটিত লবণগুলি—Chloride, nitrate, sulphate প্রভৃতি হইতে অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করা যায়।

বিজ্ঞানাগারে অ্যামোনিয়া প্রস্তুতি

যে কোন অ্যামোনিয়া ঘটিত লবণের সহিত কোন ক্ষার পদার্থ উত্তপ্ত করিলে অ্যামোনিয়া NH_3 পাওয়া যায়। বিজ্ঞানাগারে অ্যামোনিয়া প্রস্তুতের জন্য সাধারণতঃ সল্‌অ্যামোনিয়াক্ বা অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের NH_4Cl সহিত চূণ (quicklime) CaO, কিম্বা Slaked lime $Ca(OH)_2$, অথবা Sodium Hydroxide NaOH মিশাইয়া তাপ দিলে অ্যামোনিয়া গ্যাস নির্গত হয়।

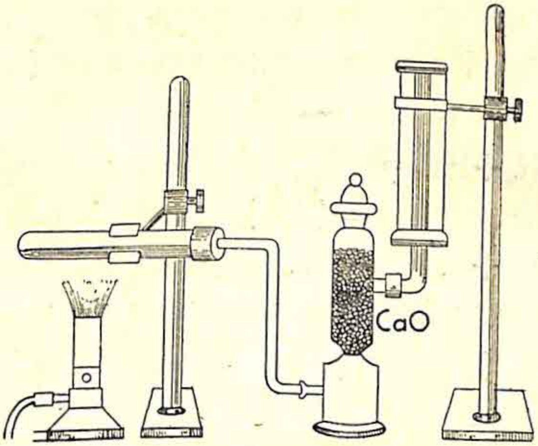
$$2NH_4Cl + CaO = 2NH_3 + CaCl_2 + H_2O$$

$$2NH_4Cl + Ca(OH)_2 = 2NH_3 + CaCl_2 + 2H_2O$$

$$NH_4Cl + NaOH = NaCl + NH_3 + H_2O.$$

পরীক্ষা :—একভাগ অ্যামোনিয়ম ক্লোরাইড চূর্ণের সহিত উহার ওজনের দ্বিগুণ পরিমাণ চূণ একটি খলের মধ্যে মিশাইয়া লও। একটি

কঠিন পরীক্ষা নলের মধ্যে ঐ মিশ্রচূর্ণ লও। পরীক্ষা নলটির মুখ একটি ছিদ্রযুক্ত ছিপি দিয়া আঁটিয়া একটি বাঁকানল সংযোগ কর। নলের অপর মুখ শুষ্ক কলিচূণ পূর্ণ (quick lime) একটি স্তম্ভের (Tower) নীচের মুখের সহিত সংযুক্ত কর। স্তম্ভের উপর মুখে আর



অ্যামোনিয়া প্রস্তুতি

একটি বাঁকানল লাগাইয়া উহার মুখে একটি শূন্য গ্যাসজার উল্টাইয়া রাখ। এখন পরীক্ষা নলটিতে তাপ প্রয়োগ করিলে অ্যামোনিয়া গ্যাস বাহির হইয়া স্তম্ভের চূণের মধ্য দিয়া গ্যাসজারে প্রবেশ করিবে। চূণের মধ্য দিয়া গ্যাস যাইবার কালে শুষ্ক হইয়া যাইবে। অ্যামোনিয়া গ্যাস জারের মধ্যকার বায়ু বাহির করিয়া দিয়া ঐস্থান অধিকার করিবে।

ভৌতধর্ম্ম :—ইহা তীব্র গন্ধযুক্ত, বর্ণহীন গ্যাসীয় পদার্থ। ইহার উগ্র ঝাঁঝে চক্ষু হইতে জল বাহির হইয়া যায়। স্বাদ ক্ষারময় (alkaline)। বায়ু অপেক্ষা হাল্কা এবং জলে সম্পূর্ণ দ্রবনীয়। জলে দ্রবিত অ্যামোনিয়াকে ammonium hydroxide or ammonium hydrate NH_4OH বলে। গাঢ় দ্রবণকে (strong solution) Liquor ammonia or ammoniacal liquor বলে। এই দ্রবণকে উত্তপ্ত করিলে NH_3 গ্যাস নির্গত হইয়া যায়। উচ্চ তাপ ও তড়িৎ প্রয়োগ করিলে ইহা বিযুক্ত হইয়া যায় (decomposed)।

চাপ ও নিম্নতাপে বা শৈত্য প্রয়োগে তরলীভূত হইয়া যায় (liquified)। তরল অ্যামোনিয়া বরফ প্রস্তুত ও রেফ্রিজেটার শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

রাসায়নিক ধর্ম্ম—ইহার দাহিকা শক্তি নাই। বায়ুতে প্রজ্বলিত হয় না। কিন্তু অক্সিজেনের সহিত মিশিলে পীতাভ শিখায় (yellowish flame) জ্বলে। ইহা ক্ষার পদার্থ। ইহার সংযোগে লাল লিটমাস নীল বর্ণ ধারণ করে। অম্লকে প্রশমন করিয়া (neutralise) লবণ উৎপন্ন করে। যেমন :—

(1) $NH_3+HCl=NH_4Cl$ ammonium chloride.

(2) $2NH_3+H_2SO_4=(NH_4)_2SO_4$ ammonium sulphate.

(3) $NH_3+HNO_3=NH_4NO_3$ ammonium nitrate.

অ্যামোনিয়া ঘটিত যাবতীয় লবণের সহিত চূণ সংযোগ করিলে বিক্রিয়া ঘটে (reaction) এবং অ্যামোনিয়া গ্যাস নিষ্ক্রান্ত হইয়া যায়।

অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড

(Ammonium Chloride, Salammoniac)

NH_4Cl.

হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে অ্যামোনিয়া গ্যাস শোষিত (absorbed) হইলে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড প্রস্তুত হয়। $NH_3+HCl=NH_4Cl$, $NH_4OH+HCl=NH_4Cl+H_2O$.

অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেটের সহিত সাধারণ লবণ মিশাইয়া উত্তপ্ত করিলে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়। $(NH_4)_2SO_4+2NaCl=2NH_4Cl+Na_2SO_4$.

ধর্ম্ম :—ইহা পালকের মত নরম কেলাসিত পদার্থ (feathery crystalline solid)। তাপ প্রয়োগ করিলে ইহা বিযোজিত হইয়া NH_3 বাহির হইয়া যায় এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অবশিষ্ট থাকে। ইহা জলে দ্রবনীয় এবং জলের তাপ শোষণ করিয়া উহার তাপ হ্রাস করিয়া দেয়।

ব্যবহার :—ব্যাটারীর সেল প্রস্তুত করিতে, বিজ্ঞানাগারে প্রতিক্রিয়া সাধক পদার্থ (Reagent) হিসাবে, ঔষধে, লৌহ গ্যাল্ভা-নাইজ করিতে এবং বস্ত্র-বয়ন শিল্পে ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট
(Ammonium nitrate)

$(NH_4)NO_3$

অ্যামোনিয়া গ্যাস দ্বারা নাইট্রিক অ্যাসিড HNO_3 প্রশমন (neutralise) করিলে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট পাওয়া যায়—$NH_3 + HNO_3 = (NH_4)NO_3$।

ধর্ম্ম :—ইহা কেলাসিত কঠিন পদার্থ। জলে দ্রবীভূত হয়। তাপ প্রয়োগ করিলে প্রথমে গলিয়া যায় পরে বিশ্লেষিত হইয়া Nitrous oxide গ্যাস N_2O বাহির হয়।

ব্যবহার :—আতসবাজি (Fire works) ও তাপ হ্রাসকারী মিশ্রণ (Freezing mixture) প্রস্তুত করিবার জন্য ইহার প্রয়োজন হয়।

অ্যামোনিয়াম সালফেট (Ammonium Sulphate)

$(NH_4)_2 SO_4$

ধর্ম্ম :—ইহা বর্ণহীন কেলাসিত কঠিন (acid salt) অম্ল লবণ, জলে সহজেই গলিয়া যায়।

ব্যবহার :—জমির সারের জন্য ইহা সর্ব্বত্রই বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এই সারের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। অন্যান্য অ্যামেনিয়া ঘটিত লবণ এবং ফট্‌কিরি প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য এবং বিজ্ঞানাগারে নানা প্রয়োজনে অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট ব্যবহৃত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

শিল্পপদ্ধতিতে অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট্‌ প্রস্তুতি

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে কাঁচা কয়লার গ্যাস (Coal gas) হইতে অ্যামোনিয়া নিষ্কাষণ করিয়া লঘু সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড যোগে অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট্‌ প্রস্তুত করা হইত।

কাঁচা কয়লায় ১—২% নাইট্রোজেন থাকে। কাঁচা কয়লার অন্তর্ধূম পাতন করিলে কোল গ্যাস নির্গত হয়। ঐ গ্যাসের সহিত কয়লার অধিকাংশ নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়া রূপে বাহির হইয়া আসে। কোল গ্যাস জলের মধ্য দিয়া পরিচালন করিয়া পরিশ্রুত ও শীতল করা হয়। NH_3 জলে দ্রবীত হইয়া যায় এবং ঐ দ্রবণ হইতে আল্‌কাত্‌রা (coaltar) পৃথক করিয়া ফেলা হয়। তাহার পর ঐ দ্রবণ চূণের সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত করিলে পরিশ্রুত NH_3 গ্যাস বাহির হইয়া আসে। ঐ গ্যাস তখন লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে পরিচালন করা হয়। তাহার ফলে ঐ দুই পদার্থের রাসায়নিক সংযোগ ঘটে, $2NH_3 + H_2SO_4 = (NH_4)_2SO_4$ এবং সাদা কেলাসিত অ্যামোনিয়াম সালফেট্‌ পাওয়া যায়।

বিশুদ্ধ অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেটে ২১·২% নাইট্রোজেন থাকে। শিল্পজাত অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেটে সাধারণতঃ ২০·৬% নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। Calcium carbonate, Basic slag প্রভৃতির সংস্পর্শে আসিলে অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট্‌ হইতে নাইট্রোজন বিযুক্ত হইয় যায়। এইজন্য ইহা জমিতে সাররূপে প্রয়োগ করিবার কালে চূণজাতীয় পদার্থের সহিত উহার সংমিশ্রণ ঘটিতে দেওয়া হয় না।

বর্ত্তমানে প্রসিদ্ধ জার্ম্মান বিজ্ঞানী হাবের আবিষ্কৃত পদ্ধতি অনুসারে অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট্‌ প্রস্তুত করা হয়। বিহারের সিন্ধ্রি কারখানায় উক্তপদ্ধতি অবলম্বনে অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট্‌ প্রস্তুত

হইতেছে। ভাক্‌রা নাঙ্গালে সিন্ধ্রির অনুরূপ কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট্‌ কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা হইয়াছে।

হাবের প্রণালী (Haber Process)

এই পদ্ধতিতে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসের প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটাইয়া অ্যামোনিয়া উৎপাদন করা হয়। $N_2 + 3H_2 = 2NH_3$।

১ঃ৩ আয়তন অনুপাতে বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের মিশ্রণে ২০০ অ্যাটমস্‌ফিয়ার চাপ প্রয়োগ করা হয়। তাহার পর ৫০০°—৫৫০° সেঃ উত্তপ্ত প্রকোষ্ঠের মধ্যে উহাদের চালনা করা হয়। ঐ প্রকোষ্ঠে সূক্ষ্ম লৌহচূর্ণ ও মলেব্‌ডেনাম (Molybdenum) থাকে। ঐ দুইটি প্রভাবকরূপে (Promoter) নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের সংযোগ সাধনে সহায়তা করে। গ্যাস দুইটির কতকাংশ সংযুক্ত হইয়া NH_3তে পরিণত হয় এবং কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাস মিলিত হয় না, মুক্ত থাকিয়া যায়। তাহার পর সমস্ত গ্যাসে চাপ প্রয়োগ করিয়া শীতল করা হয়। তাহার ফলে অ্যামোনিয়া তরলীভূত হইয়া যায়। কিন্তু মুক্ত গ্যাস দুইটি তরল হয় না। তরল অ্যামোনিয়া অপসারণ করিয়া লঘু সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড যোগে অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট প্রস্তুত করা হয়। মুক্ত গ্যাস দুইটি নূতন হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাসের সহিত মিশাইয়া পুনরায় পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়া উৎপাদন করা হয়।

সিন্ধ্রি সার কারখানা

বিহার রাজ্যের অন্তঃপাতী ঝরিয়া কয়লাখনি অঞ্চলের নিকট দশ বৎসর পূর্ব্বে একটি জলা-জঙ্গলময় স্থান ছিল। জনমানবের বসতির কোন চিহ্ন সেখানে দেখা যাইত না। আজ সেখানে বিরাট কারখানা ও একটি শহর গড়িয়া উঠিয়াছে। এই স্থানটির নাম সিন্ধ্রি।

১৯৪৭ সালে আমেরিকান সায়নামাইড কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট

নিউইয়র্কের কেমিক্যাল কনস্ট্রাক্শান্ করপোরেশন নামে একটি আমেরিকান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সিন্ধ্রি কারখানাটির নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করেন। কারখানার নক্সা তাঁহারাই প্রস্তুত করেন। চারি বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯৫১ সালের ৩১ অক্টোবর সিন্ধ্রির কারখানাটি প্রথম চালু হয়। ১৯৫৬ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত সেখানে ১২ লক্ষ টন অ্যামোনিয়াম সালফেট্ প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহার ফলে ভারতবর্ষের ৪২ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচিয়া যায়। এই সার কারখানাটি এখন এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম এবং পৃথিবীর সর্ব্বাধুনিক সারখানাগুলির অন্যতম। বিরাট এই কারখানা। দেড়বর্গ মাইল স্থান জুড়িয়া ইহার অবস্থিতি। চারিটি দেশের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতা এইস্থানে মিলিত হইয়াছে—বৃটেন, আমেরিকা, ইটালি এবং ভারতবর্ষ।

ইংলণ্ডের গ্যাস কর্পোরেশন কারখানার যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করিয়াছিল। এই কারখানা নির্ম্মাণকার্য্যে ভারতীয় ইন্জিনিয়ার ও কারিগরেরা ইংরাজ, আমেরিকান ও ইটালিয়ান্ ইন্জিনিয়ার ও কারিগরদিগের সহিত সমানে কাজ করিয়াছিলেন। এই কারখানা নির্ম্মাণ করিতে ব্যয় হইয়াছিল সাড়ে পঁচিশ কোটি টাকা। সিন্ধ্রির কারখানায় দৈনিক এক হাজার টন সার প্রস্তুত হইতেছে। আট হাজার লোক এখানে সারাদিন-রাত কাজ করে। আর একটি কারখানা বাড়ী তৈয়ার হইলে উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। এই নূতন পরিকল্পনার ব্যয় ধরা হইয়াছে ১১ কোটি টাকা। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী দৈনিক ৭০ টন ইউরিয়া, অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সংযোগ ৪০০ টন অ্যামোনিয়াম সাল্ফেট্ নাইট্রেট্ প্রস্তুত হইবে। এই ব্যবস্থায় দৈনিক এক হাজার টন হইতে ১৪৭০ টন সার প্রস্তুত হইবে।

সার সংরক্ষণ ঘরটি এক বিরাট ডিম্বাকৃতির মত। দৈর্ঘ্যে এক ফার্লং বা ⅛ মাইল, প্রস্থে ১৪৪ ফিট, উচ্চতায় ৮০ ফিট। ৮০

হাজার টন দ্রব্য ইহার মধ্যে রাখা যায়। ঘরটি নির্ব্বাত ও নিরম্বু (air tight and water proof)। এই প্রকার আর একটি সার সংরক্ষণ ঘর নির্ম্মিত হইতেছে।

সার কারখানার পাশে একটি সিমেণ্ট কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এখানে সিন্ধ্রি সার কারখানার উপজাত (byeproduct) খড়িমাটি সিমেণ্ট প্রস্তুতে ব্যবহৃত হইতেছে। এই কারখানায় দৈনিক ৩০০ টন সিমেণ্ট প্রস্তুত হইতেছে। ইহা ব্যতীত আরো কয়েকটি উপজাত শিল্পদ্রব্য বেন্‌জোল্‌, বেনজিন্‌ এবং আল্‌কাতরা তৈয়ার হইতেছে। Nitro chalk এবং Methynol প্রস্তুতের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে আরো অনেক প্রকার পরিপূরক শ্রমশিল্পের উদ্ভব হইবে।

এই কারখানা সংলগ্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হইতে ৮০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হইতেছে এবং দৈনিক ১ কোটি ২০ লক্ষ গ্যালন জলের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সিন্ধ্রির নিকট দিয়া প্রবাহিত দামোদর নদে বাঁধ দিয়া এক কৃত্রিম হ্রদ সৃষ্টি করা হইয়াছে।

সিন্ধ্রি কারখানা ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শিল্পোদ্যোগের প্রথম ও প্রধান নিদর্শন।

সিন্ধ্রি কারখানায় হাবের প্রণালীর কিছু তারতম্য করিয়া নিম্নোক্ত প্রকারে অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট্‌ উৎপাদন করা হইতেছে।

কয়লার অন্তর্ধূম পাতন দ্বারা কোল গ্যাস (Coal gas) নিষ্কাশন করিয়া শীতল জলের মধ্যে পরিচালন করা হয়, তাহাতে কোল গ্যাসের মধ্যস্থ অ্যামোনিয়া জলে দ্রবীভূত হয় এবং আলকাতরা (Coal tar) জলের তলায় থিতাইয়া পড়ে। আল্‌কাতরা পৃথক করিয়া অ্যামোনিয়াম দ্রবণের মধ্যে কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস CO_2 চাপ সহযোগে জলে প্রলম্বিত (Suspension in watter) জিপ্‌সাম চূর্ণের মধ্যে (Gypsum—Calcium sulphate $CaSO_4$) চালিত করিয়া

অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট প্রস্তুত করা করা হয়। ইহাতে এইরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটে—

$$2NH_3+CO_2+H_2O+CaSO_4$$
$$=CaCO_3+(NH_4)_2SO_4$$

ভারতবর্ষে প্রচুর কয়লা পাওয়া যায় এবং জিপসামেরও অভাব নাই। এই দুইটি সহজলভ্য ও কম মূল্যের বলিয়া সিন্ধ্রিকারখানায় এইপ্রকার কাঁচা মাল (Raw materials) হইতে অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট প্রস্তুত করা সুবিধাজনক হইয়াছে।

Chemistry Practical

বিজ্ঞানাগারে রাসায়নিক নিরীক্ষা

Ammonium Chloride or Salammoniac

NH_4Cl

অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড বা নিশাদল

(i) ইহা পালকের মত শুভ্র দানাদার কেলাসিত কঠিন পদার্থ (feathery crystalline solid) ;

(ii) জলে দ্রবীত হয় ;

(iii) জলের তাপ শোষণ করিয়া উহার তাপমাত্রা হ্রাস করে ;

(iv) তাপ প্রয়োগ করিলে NH_3 বিযুক্ত হইয়া যায় এবং HCl হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অবশিষ্ট থাকে ;

(v) চূণের সহিত (CaO) মিশাইলে NH_3 তীব্র গন্ধ পাওয়া যায়।

হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিরীক্ষা

(i) Silver nitrate $AgNo_3$ অথবা Mercurous saltsএর দ্রবণের সহিত অদ্রাব্য সাদা অধঃক্ষেপ precipitate উৎপাদন করে ;

(ii) নীল লিট্‌মাস্‌কে লাল বর্ণে পরিবর্ত্তন করে।

Ammonium Nitrate $(NH_4)NO_3$

অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট

(i) ইহা দানাদার কেলাসিত কঠিন পদার্থ (Crystalline solid) ;

(ii) জলে দ্রবনীয় ;

(iii) জলের তাপ সামান্য হ্রাস করে ;

(iv) তাপ প্রয়োগ করিলে প্রথমে গলিয়া যায়, পরে বিয়োজিত হইয়া N_2O Nitrous oxide বাদামী ধূমরূপে (Brown fumes) নির্গত হয়।

(v) চূণের সহিত মিশাইলে তীব্র অ্যামোনিয়ার গন্ধ পাওয়া যায়।

Ammonium Sulphate $(NH_4)_2SO_4$

অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট

(i) ইহা বর্ণহীন কঠিন কেলাসিত পদার্থ ;

(ii) জলে সহজেই গলিয়া যায় ;

(iii) চূণের সহিত মিশাইলে তীব্র অ্যামোনিয়ার গন্ধ নির্গত হয়।

Ammonia নিরীক্ষা

(i) বিশিষ্ট তীব্র গন্ধ ;

(ii) লাল লিট্‌মাস্ নীল করে ;

(iii) অ্যামোনিয়ার সহিত HCl গ্যাস গাঢ় সাদা ধূমরূপে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড উৎপাদন করে।

(iv) Nessler's Solution সহযোগে বাদামী বর্ণের অধঃক্ষেপ সৃষ্টি করে ;

(v) Mercurous saltsএর দ্রবণের সহিত কাল বর্ণের অধঃক্ষেপ উৎপন্ন হয়।

দ্বিতীয় ভাগ

উদ্ভিদ বিদ্যা

SYLLABUS

1. The life history of a pea and maize plant from the germination of seeds to the formation of seeds.
2. Morphology of Vegetative plant organs : Stem, root and leaf, their modification, function and significance (with particular emphasis on plants of agricultural importance).
3. Morphology of flowers, pollination, fertilization, formation of fruits and seeds, dessemination, germination of seeds.
4. Structure of a plant cell.

উদ্ভিদ বিদ্যা

কুঞ্জিকা

জীববিদ্যা :—যে বিজ্ঞানের সাহায্যে জীবন্ত পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায় তাহাকে জীববিজ্ঞান (Biology) বলে। জীববিজ্ঞান দুইভাগে বিভক্ত—যে বিভাগে উদ্ভিদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় তাহা উদ্ভিদবিদ্যা (Botany) আর যাহাতে পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি প্রাণীদের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা প্রাণিবিদ্যা (Zoology)।

উদ্ভিদের শ্রেণী বিভাগ

(Classification of plant kingdom)

উদ্ভিদ জগৎ বিশাল। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে এমন কি মৃত্তিকার অভ্যন্তরে সর্ব্বত্রই ইহারা পরিব্যাপ্ত। উদ্ভিদজগৎকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। অপুষ্পক—যাহাদের ফুল হয় না, (Cryptogams) আর যাহাদের ফুল হয় তাহারা সপুষ্পক (Phanerogams)। সপুষ্পক উদ্ভিদদিগের সাধারণতঃ বীজ হইতে বংশ বিস্তার হয়। অপুষ্পক উদ্ভিদদিগের ফুল হয় না, সুতরাং সপুষ্পক উদ্ভিদের মত তাহাদের বংশ বিস্তার হয় না। ইহাদের মধ্যে কাহারও দেহকোষ বিভক্ত হইয়া, আবার কাহারও রেণু (Spore) দ্বারা জনন সংঘটিত হয়।

অপুষ্পক উদ্ভিদ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) সমাঙ্গদেহী (Thallophyta), (২) ব্রাইওফাইটা (Bryophyta), (৩) টেরিডোফাইটা (Pteridophyta)।

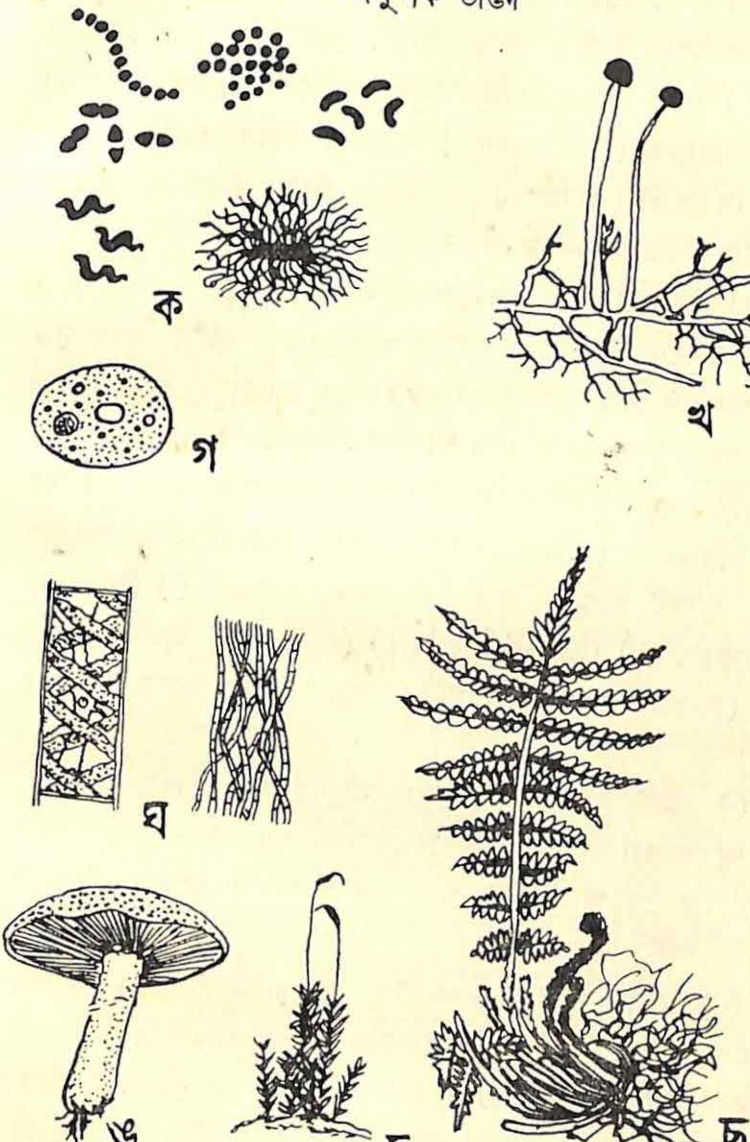
অপুষ্পক উদ্ভিদের শ্রেণী বিভাগ
(Classification of cryptogams)

- Thallophyta সমাঙ্গদেহী
  - Algae শৈবাল
  - Fungi ছত্রাক
    - Mucor মিউকোর
    - Yeast ঈষ্ট্
    - Agaricus অ্যাগারিকাস্
    - Bacteria ব্যাক্টিরিয়া
      - Saprophytic মৃতজীবী
      - Pathogenic রোগ উৎপাদক
      - Nitrogenfixing নাইট্রোজেন সংস্থাপক
      - Nitrifying নাইট্রোজেনকারী
- Bryophyta ব্রাইওফাইটা
- Pteridophyta টেরিডোফাইটা

(১) সমাঙ্গদেহী : ইহারা নিম্নতম শ্রেণীর আদিম উদ্ভিদ। ইহাদের আকৃতি অতি ক্ষুদ্র, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত দেখা যায় না। কেহ কেহ আবার ২৫—৩০ মিটার পর্য্যন্ত বৃহৎ হয়। ইহাদের গঠন অতি সরল। মূল, কাণ্ড ও পাতার কোন বিভেদ নাই। সমুদয় দেহগঠন Thallus বা সূত্রের মত। ইহারা এক-কোষী হইতে বহুকোষী হইয়া থাকে। সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদ মূলতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—(ক) Algae শৈবাল ও (খ) Fungi ছত্রাক। যাহাদের ক্লোরোফিল থাকে তাহারা শৈবাল আর যাহাদের উহা থাকে না এবং কেবলমাত্র রেণু (spore) দ্বারা বংশ বিস্তার হয় তাহারা ছত্রাক শ্রেণীর অন্তর্গত।

(ক) শৈবাল : ইহাদের ক্লোরোফিল্ থাকায় বায়ু হইতে কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করিয়া সূর্য্যালোকের সাহায্যে খাদ্য প্রস্তুত করে। ইহারা স্বভোজী (autophytes)। আর্দ্রভূমি, সিক্তশৈলগাত্রে,

অপুষ্পক উদ্ভিদ



ক—বিভিন্ন আকারের ব্যাক্‌টিরিয়া
খ—মিউকোর
গ—ঈষ্ট
ঘ—শৈবাল
ঙ—অ্যাগারিকাস্‌
চ—মস্‌
ছ—ফার্ণ

নদী, কূপ ও পুষ্করিণীর ধারে, উদ্ভিদগাত্রে ও উদ্ভিদের কলার (tissue) অভ্যন্তরে ইহারা জন্মে। কয়েক জাতীয় শৈবাল মিঠা জলে (fresh water) এবং কয়েক জাতি সমুদ্রজলে জন্মে। সমুদ্রজলে যাহারা থাকে তাহাদের (sea weeds) সামুদ্রিক উদ্ভিদ বলে। পুকুর-ঘাটের সিঁড়ি জলে ডুবিয়া থাকিলে তাহার উপর যে শেওলা জন্মিতে দেখা যায় সেইগুলি আল্‌জি বা শৈবাল।

(খ) **ছত্রাক**ঃ ইহাদের ক্লোরোফিল থাকে না, সুতরাং খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে না, ইহারা পরভোজী। সজীব অথবা মৃত এবং পচনশীল জৈব পদার্থ হইতে ইহারা খাদ্য সংগ্রহ করে। যাহারা মৃত পদার্থ হইতে খাদ্য গ্রহণ করে তাহাদের বলে (Sapraphyte) **মৃতজীবী**, আর যাহারা জীবন্ত প্রাণী হইতে খাদ্য লইয়া থাকে তাহাদের বলে **পরজীবী** (Parasite)। ছত্রাক আলো এবং অন্ধকার উভয় স্থানেই জন্মে। ইহারা বহুপ্রকার, তন্মধ্যে (i) (Mucor) **মিউকোর**, (ii) (Yeast) **ঈষ্ট**, (iii) (Agaricus) **অ্যাগারিকাস্** (iv) (Bacteria) **ব্যাক্‌টিরিয়ার** সহিত সচরাচর আমাদের পরিচয় ঘটে।

(i) **মিউকোর**ঃ ভিজা জুতা, ঘোড়ার নাদ, গোবর, পাঁউরুটি, পচা তরিতরকারীর উপর বর্ষাকালে যে সাদা, সাদা রোমের মত পদার্থ দেখা যায় সেইগুলি মিউকোর। চল্‌তি ভাষায় ইহাদের "ছাতা" বলে। মিউকোর মৃতজীবী।

(ii) **ঈষ্ট**—ইহারাও মৃতজীবী। গুড় বা চিনির জলে ইহাদের সংযোগ ঘটিলে ঐজল গাঁজিয়া যায় (fermentation), শর্করা তখন কোহলে (alcohal) পরিণত হয় এবং বুদ বুদ সৃষ্টি হইয়া কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস নির্গত হইতে থাকে তাহাতে গাঁজা বা ফেনার উদ্ভব হয়। খেজুর বা তালের রস গাঁজিয়া যে তাড়ি উৎপন্ন হয় তাহা ঐ ঈষ্টের কার্য্য।

(iii) **অ্যাগারিকাস্**ঃ যাহাদের সচরাচর ব্যাঙের ছাতা বলে

তাহাই অ্যাগারিকাস্। ইহারাও মৃতজীবী। বর্ষাকালে মাঠে, ঘাস-যুক্ত স্থানে, পচা পোয়াল ও সারগাদায় ইহাদের জন্মিতে দেখা যায়। কয়েক প্রকার ব্যাঙের ছাতা খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় আবার অনেক-গুলি বিষাক্ত।

(iv) **ব্যাক্টিরিয়া** ঃ উদ্ভিদজগতে ইহারা নিম্নতম শ্রেণীর এক-কোষী উদ্ভিদ। জলে, মৃত্তিকার অভ্যন্তরে সজীব অথবা মৃত প্রাণীদেহে, সর্ব্বত্রই ইহারা অবস্থিত রহিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশ জাতি অক্সি-জেনময় স্থানে থাকে। ইহাদের বলে aerobic ব্যাক্টিরিয়া, আর যাহারা অক্সিজেনশূন্য স্থানে বাস করে তাহাদের বলে anaerobic ব্যাক্টিরিয়া। কোন কোন জাতির ব্যাক্টিরিয়া উভয় অবস্থায় থাকিতে পারে। ব্যাক্টিরিয়াদের দেহগঠন নানাপ্রকার হইয়া থাকে, গোলাকৃতি (spherical), প্যাঁচের মত (spiral) কিম্বা দণ্ডাকৃতি (Rod shaped)। গোলাকৃতিগুলিকে বলে Cocci কক্‌সি, প্যাঁচা-কৃতিগুলিকে বলে স্পাইরিলা Spirilla এবং দণ্ডাকৃতিগুলিকে বলে Bacillus ব্যাসিলাস্।

পচন (Putrifaction), গাঁজান বা সন্ধান (fermentation), পরিপাক (digestion), রোগোৎপত্তি (disease production), অ্যামোনিয়া প্রভৃতিকে নাইট্রোজেনে রূপান্তরিত করা (Nitrification), মৃত্তিকায় নাইট্রোজেন সংস্থাপন (fixation of nitrogen in soil) প্রভৃতি, বিভিন্ন জাতীয় ব্যাক্টিরিয়া দ্বারা সংঘটিত হয়। বহুপ্রকার ব্যাক্টিরিয়া আছে। কয়েকজাতীয় ব্যাক্টিরিয়ার সহিত কৃষিবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সংস্রব রহিয়াছে, আবার অনেকগুলির সহিত আমাদের সচরাচর পরিচয় ঘটিয়া থাকে, যেমন মৃতজীবী, রোগ উৎপাদক, নাইট্রোজেন সংস্থাপক ও অ্যামোনিয়া প্রভৃতি রূপান্তরকারী ব্যাক্টিরিয়া।

মৃতজীবী ব্যাক্টিরিয়া ঃ ইহারা মৃত বা অর্দ্ধমৃত প্রাণী ও উদ্ভিদ এবং জৈবপদার্থ আক্রমণ করিয়া উহাদের উপাদানগুলি ভাঙ্গিয়া দেয়

এবং তাহা হইতে যে রস উদ্ভূত হয় তাহা খাইয়া বৃদ্ধি পায়। পদার্থের উপাদানগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার ফলে (Putrefaction) পদার্থের পচন হয়, অর্থাৎ পচিয়া যায় এবং (fermentation) গাঁজিয়া যায়। তাহার পর উহা হিউমাস নামক পদার্থে পরিণত হয়। হিউমাস মাটির অন্যতম বিশিষ্ট উপাদান। উদ্ভিদের অতি প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদন নাইট্রোজেন, এই হিউমাস হইতে উদ্ভিদ পাইয়া থাকে।

রোগউৎপাদক ব্যাক্‌টিরিয়া : ইহারা প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহে রোগ উৎপাদন করে। কেহ, কেহ দেহকলাগুলিকে (Tissues) প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণ করে, আবার কাহারও দেহ নিঃসৃত বিষ হইতে (Toxins) অথবা উভয় প্রকারে রোগ সৃষ্টি হয়। যক্ষ্মা, ডিফ্‌থিরিয়া, টাইফয়েড, তড়্‌কা (Tetanus), কলেরা, আমাশয় প্রভৃতি রোগ ইহাদেরই কীর্ত্তি। উদ্ভিদেরও নানাপ্রকার রোগ ব্যাকৃটিরিয়া দ্বারা সংঘটিত হয়।

নাইট্রোজেন সংস্থাপক ব্যাকটিরিয়া : ইহারা শিম্বিগোত্রীয় উদ্ভিদের (Leguminous Plants) মূলে অর্বুদ উৎপাদন করিয়া তাহার মধ্যে বাস করে এবং বায়ু হইতে মুক্ত নাইট্রোজেন শোষণ করিয়া মাটি নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ করে।

নাইট্রোজেনকারী ব্যাকটিরিয়া : ইহারা মাটির মধ্যে থাকে। মৃত্তিকাস্থ অ্যামোনিয়াকে ইহারা নাইট্রেটে পরিণত করে।

কৃষিকার্য্যে উক্ত তিন প্রকার ব্যাক্‌টিরিয়ার প্রয়োজন অপরিহার্য্য।

এইস্থানে ব্যাক্‌টিরিয়া সম্বন্ধে সাধারণভাবে পরিচয় দেওয়া হইল যাহাতে দশম ও একাদশ শ্রেণীতে কৃষিবিজ্ঞান আলোচনাকালে ব্যাক্‌টিরিয়া প্রসঙ্গ সহজবোধ্য হয়।

(২) **ব্রাওফাইটা** : ইহারা মস্‌জাতীয় উদ্ভিদ। বর্ষাকালে আর্দ্রস্থানে বিশেষতঃ প্রাচীর ও ছাদের গায়ে, বৃক্ষকাণ্ডে, ইট বা পাথরের উপরে মখমলের মত সবুজবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু উদ্ভিদ একত্র সংলগ্ন হইয়া জন্মিতে দেখা যায়। উহাদের মস্‌ বলে। উহাদের কাণ্ড ও

পাতা আছে কিন্তু মূল নাই। কাণ্ড সূক্ষ্ম তারের মত। উহার গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সবুজবর্ণের পাতা থাকে। কাণ্ডের উপর অংশের পাতাগুলি গুচ্ছাকারে থাকে। উহাদের প্রকৃত মূলের পরিবর্ত্তে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম চুলের মত থাকে। সেইগুলিকে রাইজোড (Rhizodes) বলে। ঐগুলি মূলের কার্য্য করে। সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদ অপেক্ষা ইহাদের অপেক্ষাকৃত উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদ বলিয়া গণ্য করা হয়, যেহেতু এই শ্রেণীর উদ্ভিদে কাণ্ড ও পাতার আবির্ভাব হইয়াছে।

(৩) **টেরিডোফাইটা**ঃ ইহারা ফার্ণজাতীয় উদ্ভিদ। ঢেঁকি-শাক (fern), শুশ্‌নি শাক প্রভৃতি ইহাদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সচরাচর ইহারা ছায়াযুক্ত আর্দ্রস্থানের মাটির উপর জন্মে। ইহাদের মূল, কাণ্ড ও পাতা হয়। ঢেঁকিশাকের কাণ্ড মাটির নীচে সমান্তরালে থাকে, উহা মৃদ্গত কাণ্ড (Rhizome)। যদিও ইহাদের মূল, কাণ্ড ও পাতা থাকে কিন্তু ফুল হয় না। পাতার নীচের পৃষ্ঠে রেণু (spore) জন্মে। সেইগুলি হইতে ইহাদের বংশ বিস্তার ঘটে। ইহারা ব্রাওফাইটা অপেক্ষা উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদ।

সপুষ্পক উদ্ভিদের শ্রেণী বিভাগ

(Classification of Phanerogams)

সপুষ্পক উদ্ভিদ দুই ভাগে বিভক্ত ঃ—নগ্ন বা ব্যক্তবীজী (Gymnosperm) ও আবৃত বা গুপ্তবীজী (Angiosperm)।

সপুষ্পক উদ্ভিদ
- নগ্নবীজী (Gymnosperm)
- আবৃতবীজী (Angiosperm)
  - একবীজপত্রী (Monocotyledons)
  - দ্বিবীজপত্রী (Dicotyledons)

নগ্নবীজী (Gymnos—naked নগ্ন, Sperma—seed বীজ)

ইহাদের ফল হয় না, সুতরাং ফলের দ্বারা বীজ আবৃত থাকে না। ইহারা সবীজ উদ্ভিদের প্রাথমিক পর্য্যায়ের উদ্ভিদ। পাইন, ঝাউ, সাইকাস প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।



সাইকাস

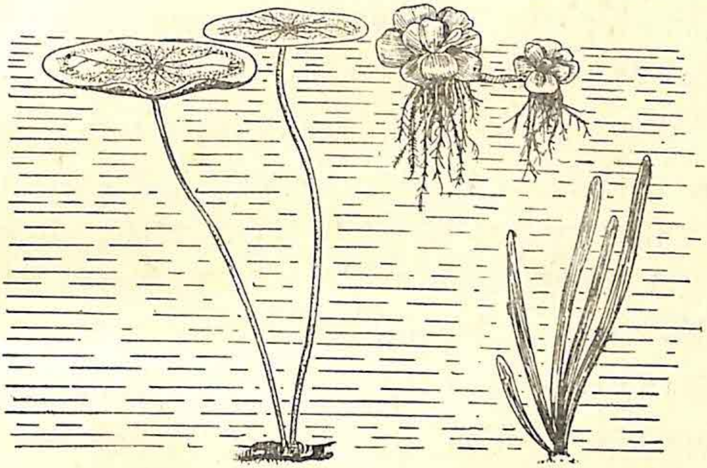
আবৃত বা গুপ্তবীজী (Angio-Vessel—পাত্র)

ইহাদের বীজ ফলের অভ্যন্তরে থাকে। সাধারণ সপুষ্পক উদ্ভিদ আবৃতবীজী। আবৃতবীজী উদ্ভিদ দুই প্রকার—(ক) একবীজপত্রী, (Monocotyledon) ইহাদের একটি মাত্র বীজপত্র থাকে, যেমন ধান, ভুট্টা, যব, গম ইত্যাদি। (খ) দ্বিবীজপত্রী (Dicotyledon), ইহাদের দুইটি বীজপত্র থাকে যেমন, ছোলা, মটর, তেঁতুল, কুমড়া, সীম ইত্যাদি।

উদ্ভিদের অতিরিক্ত শ্রেণী বিভাগ

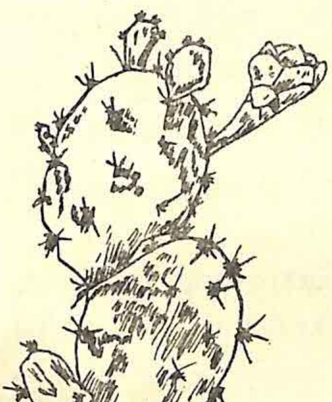
(ক) **বাসস্থান অনুযায়ী**—বাসস্থান অনুযায়ী উদ্ভিদদিগকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয় :—(i) **জলজ উদ্ভিদ** (aquatic plants or hydrophytes), (ii) **স্থলজ উদ্ভিদ** (Terrestrial plants or Geophytes)।

জলজ উদ্ভিদদিগের মধ্যে কতকগুলি জলে ভাসিয়া থাকে যেমন, কচুরিপানা, টোপাপানা প্রভৃতি। কয়েকপ্রকার জলজ উদ্ভিদের কাণ্ড পাঁকের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে কিন্তু তাহাদের পাতা জলের উপরে



জলজ উদ্ভিদ

ভাসিয়া থাকে যেমন, পদ্ম, শালুক প্রভৃতি। কতকগুলি আবার জলের মধ্যে ডুবিয়া থাকে যেমন, শৈবাল, ঝাঁঝি।



ফণি মনসা

স্থলজ উদ্ভিদ আবার দুই প্রকার—(i) সাধারণ উদ্ভিদ (Mesophytes)—যে স্থানের মৃত্তিকায় সাধারণভাবে জল থাকে সেই সকল স্থানের উদ্ভিদ; (ii) **জাঙ্গল** উদ্ভিদ (Xerophytes), যে সকল স্থানের মৃত্তিকায় জলের পরিমাণ অত্যন্ত কম, অর্থাৎ মরুভূমি অঞ্চলের উদ্ভিদ। ফণি মনসা, ক্যাক্‌টাস, ঘৃত-কুমারী, ঝাউ, বাব্‌লা, খেজুর প্রভৃতি জাঙ্গল উদ্ভিদ।

(খ) **পরিপোষণ অনুযায়ী** ঃ পরিপোষণ অনুসারে উদ্ভিদ দুই

প্রকারের হয়—(১) **স্বভোজী** (autophytes), ও (২) **পরভোজী** (heterophytes)।

স্বভোজী উদ্ভিদ—যাহারা বায়ু, জল ও মৃত্তিকা হইতে খাদ্যোপাদান সংগ্রহ করিয়া ক্লোরোফিল ও সূর্য্যালোকের সাহায্যে খাদ্য প্রস্তুত করে, যেমন সাধারণ সবুজ উদ্ভিদ।

অর্কিড, রাস্না প্রভৃতি উদ্ভিদ অন্য বৃক্ষের উপর জন্মিলেও তাহাদের সবুজ পাতা থাকে এবং বায়বীয় মূলের সাহায্যে বায়ু হইতে জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করিয়া খাদ্য প্রস্তুত করে। ইহাদের বলে **পরাশ্রয়ী** (Epiphytes)।

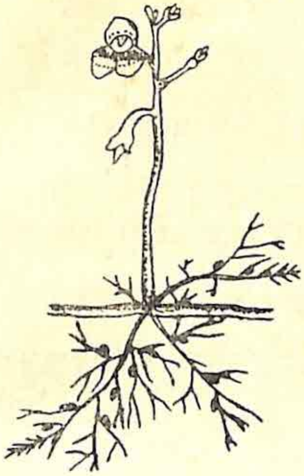
(২) **পরভোজী** উদ্ভিদ ঃ ইহারা খাদ্য প্রস্তুত করে না। ইহাদের চারিটি ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) **পরজীবী** (Parasite) যাহারা সজীব আশ্রয় বৃক্ষ হইতে খাদ্য শোষণ করিয়া জীবনধারণ করে ; (খ) **মৃতজীবী** (Saprophyte) ইহারা মৃত উদ্ভিদ দেহ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে।

(ক) পরজীবী উদ্ভিদ আবার দুই প্রকার ঃ—(i) **পূর্ণ পরজীবী** (Total parasite), ও (ii) **আংশিক পরজীবী**। পূর্ণ পরজীবী উদ্ভিদের সবুজ পাতা থাকে না, আশ্রয় বৃক্ষ হইতে রস শোষণ করিয়া বৃদ্ধি পায়, যেমন আলোক লতা। আংশিক পরজীবী উদ্ভিদের সবুজ পাতা হয়। পাতার সাহায্যে কিছু খাদ্য প্রস্তুত করে, অবশিষ্ট খাদ্য আশ্রয় বৃক্ষ হইতে আহরণ করে, যেমন—লোরেন্‌থাস্, পুরাতন আম গাছের ডালের উপর ইহাদের জন্মিতে দেখা যায়, চন্দন (Sandal wood) প্রভৃতি।

(খ) **মৃতজীবী উদ্ভিদ** ঃ—পচনশীল জৈব পদার্থের উপর ইহারা জন্মে এবং উহাদের নিঃসৃত রস হইতে খাদ্য গ্রহণ করে। ইহারা পরজীবীদের মত পূর্ণ অথবা আংশিক মৃতজীবী হয়। অধিকাংশ ছত্রাক ও ব্যাক্‌টিরিয়া পূর্ণমৃতজীবী। আংশিক মৃতজীবী উদ্ভিদ সবুজ বর্ণ বিশিষ্ট হয়, সুতরাং কিছু খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে, যেমন মনোট্রোপ নামক উদ্ভিদ।

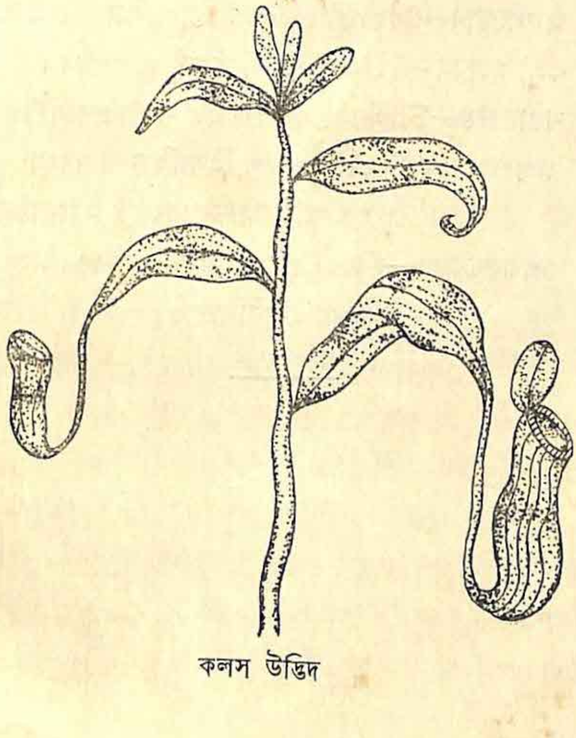
(গ) **অন্যোন্যজীবী** (Symbionts) (sym-together, bios-

life) দুইটি জীব পরস্পরের সাহচর্য্যে জীবনধারণ করিলে তাহাদের অন্যোন্যজীবী (Symbionts) বলে এবং পরস্পর নির্ভরতাকে অন্যোন্যজীবত্ব (Symbiosis) বলে। শিম্বিগোত্রীয় উদ্ভিদের মূলে নাইট্রোজেন সংস্থাপক ব্যাক্‌টিরিয়া বাস করে, উহারা বায়ু হইতে মুক্ত নাইট্রোজেন শোষণ করিয়া আশ্রয়-বৃক্ষকে সরবরাহ করে এবং আশ্রয়বৃক্ষ হইতে শ্বেতসার লইয়া জীবনধারণ করে।



ঝাঁঝি

(ঘ) **পতঙ্গভূক উদ্ভিদ** (Insectivorous) :—ঝাঁঝি, কলস প্রভৃতি উদ্ভিদ, অঙ্গে নানাপ্রকার ফাঁদ সৃষ্টি করিয়া পতঙ্গ ধরিয়া উহাদের দেহ হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে। ইহাদের পতঙ্গভূক উদ্ভিদ বলে।



কলস উদ্ভিদ

পরিপোষণ অনুযায়ী উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ

- উদ্ভিদ
  - স্বভোজী
    - সাধারণ উদ্ভিদ
    - পরাশ্রয়ী
  - পরভোজী
    - পরজীবী
    - মৃতজীবী
    - অন্যোন্যজীবী
    - পতঙ্গভূক

সপুষ্পক উদ্ভিদের অঙ্গ

সপুষ্পক উদ্ভিদের অঙ্গ মূলতঃ দুইটি—**বর্দ্ধনশীল অঙ্গ** (organs of vegetation) যথা মূল, কাণ্ড ও পাতা, এবং **জননঅঙ্গ** (organs of reproduction) যথা, ফুল, ফল ও বীজ, এইগুলি উদ্ভিদের বংশ রক্ষা ও বিস্তারের জন্য প্রয়োজন।

উদ্ভিদ বিদ্যার বিভাগ

১। অঙ্গসংস্থান—Morphology উদ্ভিদের আকৃতি ও বহির্গঠন।

২। কলা সংস্থান—Histology উদ্ভিদের অন্তর্গঠন।

৩। শরীরবৃত্তি—Physiology জৈবিক কার্য্যপ্রণালী।

৪। বাস্তুসংস্থান—Ecology পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী দেহের অভিযোজন বিষয়ক আলোচনা।

৫। শ্রেণীবদ্ধকরণ—Systematic Botany বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ।

অঙ্গ-সংস্থান
(Morphology)

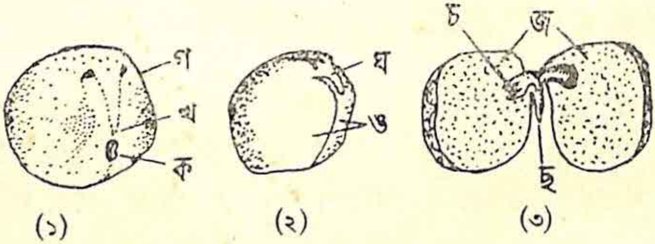
প্রথম অধ্যায়

বীজ ও অঙ্কুরোদ্গম (Seed and germination)

দ্বিবীজপত্রী বীজের গঠন (Structure of Dicotyledonous seed) সচরাচর দ্বিবীজপত্রী বীজের দুইটি আবরণ বা ত্বক (Seed coat) থাকে। বাহিরের আবরণ বা খোসাকে বলে **বহিস্ত্বক** (Testa)। ইহা সাধারণতঃ শক্ত বা খোলার মত হয়। ভিতরেরটিকে বলে **অন্তস্ত্বক** (Tegmen)। ইহা পাতলা ছালের মত। বহু-বীজের অন্তস্ত্বক থাকে না। ছোলার বীজে বহিস্ত্বক ও অন্তস্ত্বক সংযুক্ত থাকে, মটরবীজের সূক্ষ্ম পাতলা অন্তস্ত্বক থাকে। রেড়ির বীজের বহিস্ত্বক কঠিন খোলা, উহার নীচে অন্তস্ত্বক পাতলা ছালের মত থাকে। বীজের বহিস্ত্বকের উপর একটা দাগ দেখা যায়। ফলের মধ্যে বীজ ঐস্থানে যুক্ত ছিল। ঐ দাগটিকে বলে ডিম্বক নাভী—(Hilum)। উহার নিকটে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে, উহাকে ডিম্বকরন্ধ্র (Micropyle) বলে। অঙ্কুরোদ্গমকালে ঐ ছিদ্র দিয়া ভ্রূণমূল নির্গত হয়। ভ্রূণমূলকে প্রচলিত ভাষায় কলা বা অঙ্কুর বলে।

বীজত্বক ছাড়াইলে ভিতরের অংশ অন্তর্বীজ বাহির হয়। ছোলা বা মটরের একজোড়া দল বা দানা থাকে। ইহারা বীজপত্র (Co-tyledon)। ইহাদের পৃথক করিলে দেখা যায় একটি দণ্ডের সহিত ঐ দল দুইটি সংযুক্ত রহিয়াছে। ঐ দণ্ডটিকে বলে **ভ্রূণাক্ষ** (axis of the embryo)। ঐ দুই বীজপত্র সমেত দণ্ডটি বীজের **ভ্রূণ**

(Embryo)। ভ্রূণাক্ষের নীম্নাংশ **ভ্রূণমূল** (Radicle) এবং উপরের অংশ ভ্রূণমুকুল (Plumule)। ঐ ভাবীমূল ও ভাবী-কাণ্ডের মাঝখানে বীজপত্র দুইটি ভ্রূণাক্ষের সহিত যুক্ত থাকে। ভ্রূণাক্ষের যে অংশটি ভ্রূণমুকুল ও বীজপত্রের সংযোগস্থানের মধ্যে থাকে তাহাকে **বীজপত্রাধিকাণ্ড** (অধি=উপর) (Epicotyl) বলে। আর যে অংশটি ভ্রূণমূল ও বীজপত্রের সংযোগের মধ্যে থাকে তাহাকে



মটর বীজ

১। ক— ডিম্বক নাভী
খ—ডিম্বক রন্ধ্র
গ—বীজত্বক

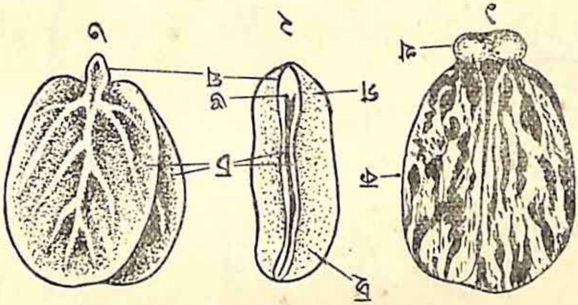
২। খোসা ছাড়াইবার পর ভ্রূণ
ঘ –ভ্রূণ মুকুল
ঙ—বীজপত্র

৩। চ—ভ্রূণ মুকুল
ছ—ভ্রূণ মূল
জ—দুইটি বীজপত্র

বলে **বীজপত্রাবকাণ্ড** (অব=নীচে) (Hypocotyl)। স্থূল বীজ-পত্রের মধ্যে ভ্রূণের খাদ্য সঞ্চিত থাকে। ঐ খাদ্য শোষণ করিয়া ভ্রূণ বৃদ্ধি পায়। সাধারণ দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের ভ্রূণের খাদ্য বীজপত্রের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। বীজপত্রের মধ্যে ভ্রূণখাদ্য সঞ্চিত থাকিলে তাহাকে বলে **অসস্থল বীজ** (Nonendospermic or exalb-uminous)।

বহু উদ্ভিদের বীজ আবার ভিন্নপ্রকার হয়, যেমন রেড়ির বীজ। রেড়ির বীজের বহিস্ত্বক কঠিন খোলা। উহার নীচে একটা পাত্‌লা ছালের মত পর্দ্দা থাকে উহা অন্তস্ত্বক। তাহার পরে থাকে সাদা

স্থূল শাঁস। শাঁসের মধ্যে তুইটি পাত্‌লা বীজপত্র থাকে। বীজপত্র তুইটির গায়ে পাতার শিরার মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা উপশিরা থাকে। মটর, ছোলা প্রভৃতির ভ্রূণের খাদ্য বীজপত্রের মধ্যে সঞ্চিত থাকে, কিন্তু রেড়ির ভ্রূণখাদ্য বীজপত্রের বাহিরে শাঁসের মধ্যে থাকে। যাহাদের খাদ্য বীজপত্রের বাহিরে থাকে তাহাদের বলে **সস্থল** বীজ (albuminous or endospermic)। এইজন্য অসস্থল বীজের বীজপত্র স্থূল এবং সস্থল বীজের বীজপত্র খুব পাত্‌লা হয়।

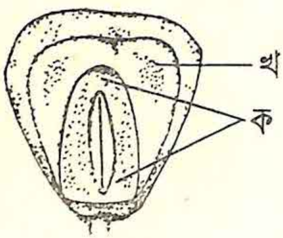


রেড়ি বীজ

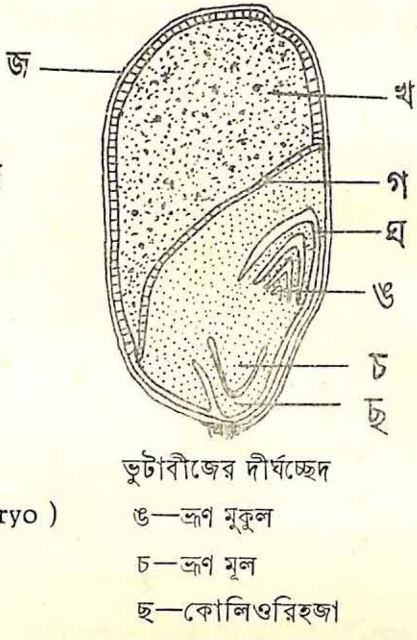
ক—বহিস্ত্বক
খ—ক্যারাঙ্কল
গ—দীর্ঘচ্ছেদ
ঘ—ভ্রূণ মূল
ঙ—ভ্রূণ মুকুল
চ—বীজপত্র
ছ—সস্য

একবীজপত্রী বীজের গঠন (Structure of monocotyledonous seed) :—একবীজপত্রী বীজের বীজত্বক ও ফলত্বক (Pericarp) পৃথক থাকে না, সংযুক্ত হইয়া থাকে। বীজত্বকের পৃথক অস্তিত্ব নাই। ধান বা ভুট্টার একটি দানা লম্বালম্বিভাবে কাটিলে দেখা যায় যে ফলের আবরণ ও বীজের আবরণ মিলিয়া বাহিরের খোসা শক্ত হইয়া রহিয়াছে। উহা একটি সম্পূর্ণ ফল। ধানের খোসাটি ছাড়াইয়া ফেলিলে উহার একপ্রান্তে অথবা ভুট্টার দানার ত্বকের উপরের দিকের একপার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র অস্বচ্ছস্থান দেখা যায়, ঐ স্থানটিকে বলে Deltoid area। উহার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ভ্রূণ নিহিত

থাকে। দানার অবশিষ্ট অংশ সস্য (Endosperm)। চাল কাঁড়িবার সময় ভ্রূণটি খসিয়া পড়ে। পরীক্ষা করিলে দেখা যায় ভ্রূণ ও সস্যের মধ্যে ঢলের মত একটি পর্দ্দা রহিয়াছে। উহাই বীজপত্র। একবীজ-পত্রী উদ্ভিদের বীজের ঐপ্রকার বীজপত্রকে বলে স্কুটেলাম (Scutellum)। ইহার সাহায্যে ভ্রূণ, সস্য হইতে খাদ্য শোষণ করিয়া বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ইহা সস্যল বীজ। বীজপত্রের উপরের যে অংশ



ভুটাবীজ



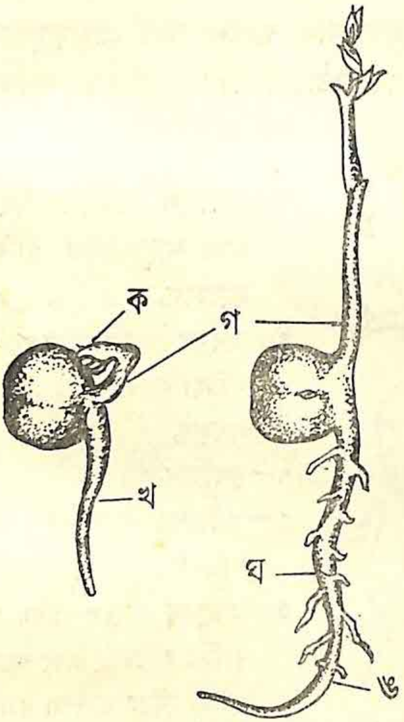
ভুটাবীজের দীর্ঘচ্ছেদ

ক—ডেল্‌টয়েড এলাকা (Embryo)
খ—সস্য (Endosperm)
গ—স্কুটেলাম
ঘ—কোলিওপ্‌টাইল
ঙ—ভ্রূণ মুকুল
চ—ভ্রূণ মূল
ছ—কোলিওরিহজা
জ—সংযুক্ত বীজত্বক ও ফলত্বক

ভ্রূণ মুকুলকে আবৃত করিয়া রাখে উহাকে বলে **কলিওপ্‌টাইল** (coleoptile) এবং বীজপত্রের নীচের যে অংশ ভ্রূণমূলকে আবৃত করিয়া রাখে তাহাকে বলে **কলিওরিহজা** (coleorhiza)। ভ্রূণমূল যখন বাহির হয় তখন ঐ খোসার মত কলিওরিহজা দ্বারা আবৃত থাকে এবং ভ্রূণমুকুল কোলিওপ্‌টাইল দ্বারা আবৃত থাকে। ধান, যব, গম, ভুট্টা, ঘাস, বাঁশ, আখ, তাল, খেজুর, নারিকেল প্রভৃতি একবীজপত্রী উদ্ভিদ।

অঙ্কুরোদ্গম (Germination)

বীজের মধ্যে ভ্রূণ সুপ্ত অবস্থায় থাকে। বিভিন্নজাতীয় বীজের প্রসুপ্তিকাল ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে, একবৎসর হইতে বহুবৎসর পর্য্যন্ত অঙ্কুরোদ্গম শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে। পরিমত জল, তাপ ও বায়ুর সংস্পর্শ পাইলে ভ্রূণের সুপ্তি ভাঙ্গিয়া যায়। জল শোষণ করিয়া বীজ স্ফীত হয় এবং ডিম্বকরন্ধ্র দিয়া প্রথমে ভ্রূণ মূল বাহির হয়। ইহাই বীজের অঙ্কুরোদ্গম। ঐ তিনটির একটির অভাব



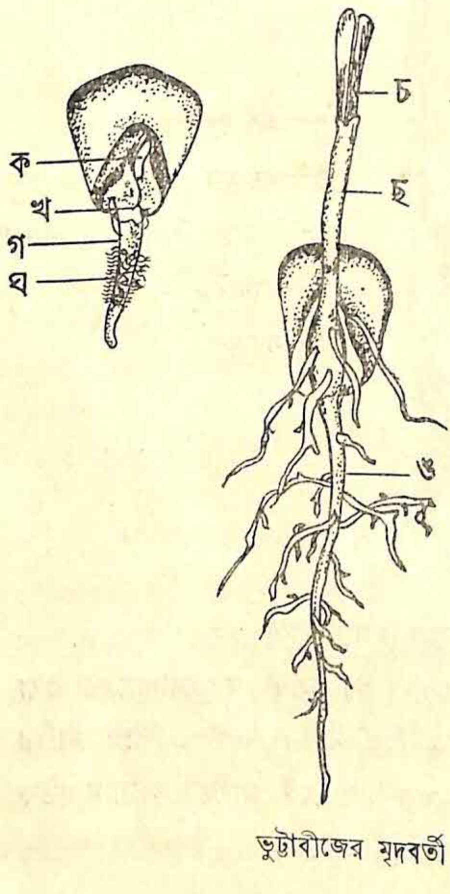
ক—ভ্রূণ মুকুল
খ—ভ্রূণ মূল
গ—বীজপত্রাধিকাণ্ড (Epicotyl)
ঘ—প্রাথমিক মূল
ঙ—লম্ব মূল

মটর বীজের মৃদবর্ত্তী অঙ্কুরোদ্গম

অথবা আধিক্য হইলে অঙ্কুরোদ্গম হয় না। অঙ্কুরোদ্গমের জন্য অন্ধকারই প্রশস্ত, তীব্র আলোকে বিঘ্ন ঘটে। এইজন্য বীজ মাটির ভিতরে পুঁতিতে হয়। বীজ যেরূপ ভাবেই মাটিতে লাগান হউক ভ্রূণমূল নিম্নগামী এবং ভ্রূণমুকুল ঊর্দ্ধমুখী হইবে।

বীজের অঙ্কুরোদ্গম দুই প্রকারের হইয়া থাকে—অঙ্কুরোদ্গমকালে যাহাদের বীজপত্র মাটির ভিতরে থাকিয়া যায় **মৃদবর্ত্তী** (Hypogeal germination), আর অঙ্কুরোদ্গমকালে যাহাদের বীজপত্র মাটির উপরে উঠিয়া আসে তাহাদের বলে **মৃদভেদী**।

মৃদবর্ত্তী অঙ্কুরোদ্গম Hypogeal germination—অঙ্কুরোদ্গমের সময় সাধারণতঃ একবীজপত্রী উদ্ভিদের বীজের বীজপত্র মাটির ভিতরে থাকিয়া যায়। প্রথমে বীজপত্রাধিকাণ্ড (Epicotyl) বৃদ্ধি পায়। প্রথমে ইহা বাঁকা থাকে পরে সোজা হইবার সময় ভ্রূণ মুকুলকে বীজত্বকের বাহির আনিয়া উপরে উঠাইয়া দেয়। বীজপত্র কখনও

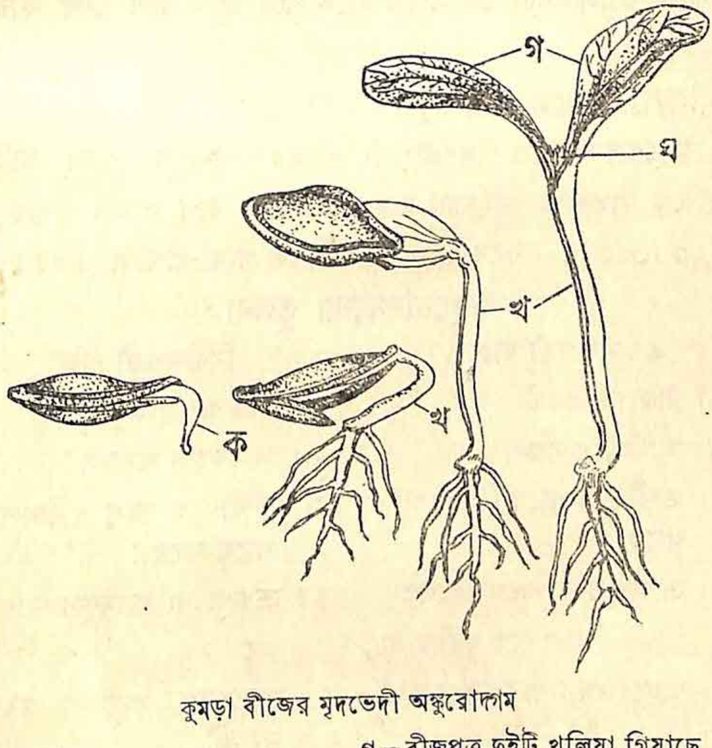


ক—ভ্রূণমুকুল কোলিপ্‌টাইল দ্বারা আবৃত হইয়া বাহির হইতেছে,
খ—ভ্রূণমূল কোলিওরিজা ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছে,
গ—ভ্রূণমূল,
ঘ—মূলরোম,
ঙ—ভ্রূণমূলের প্রাথমিক মূলে পরিণতি,
চ—ভ্রূণমুকুল হইতে প্রথম পত্র বাহির হইতেছে এবং কাণ্ডের গোড়া হইতে গুচ্ছমূল বাহির হইতেছে,
ছ—কোলিওপটাইল ভ্রূণমুকুলকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে।

ভুট্টাবীজের মৃদবর্ত্তী অঙ্কুরোদ্গম

বীজত্বকের বাহিরে আসে না। ধান, ভুট্টা প্রভৃতির এইরূপ অঙ্কুরোদ্গম হয়। কতকগুলি দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ যেমন ছোলা, মটর, আম প্রভৃতির অঙ্কুরোদ্গম মৃদবর্ত্তী।

মৃদ্‌ভেদী অঙ্কুরোদ্গম (Epigeal germination) :—শিম, তেঁতুল, কুমড়া, রেড়ি প্রভৃতি বীজের অঙ্কুরোদ্গমকালে বীজপত্র মাটির উপরে উঠিয়া আসে। ইহাদের প্রথমে বীজপত্রাবকাণ্ডের (Hypocotyl) বৃদ্ধি হয়। প্রথমে উহা বাঁকা থাকে পরে সোজা হইয়া বীজত্বকসহ বীজপত্র দুইটিকে টানিয়া মাটির উপরে আনে।



কুমড়া বীজের মৃদভেদী অঙ্কুরোদ্গম

ক—ভ্রূণমূল
গ—বীজপত্র দুইটি খুলিয়া গিয়াছে
খ—বীজপত্রাবকাণ্ড (Hypocotyl)
ঘ—ভ্রূণমুকুল নির্গত হইয়াছে

সাধারণতঃ একপত্রবীজী উদ্ভিদের মৃদ্‌বর্ত্তী এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের মৃদ্‌ভেদী অঙ্কুরোদ্গম হইয়া থাকে। বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ বীজের

অঙ্কুরোদ্গমকালে ভিন্ন, ভিন্ন হয়। কঠিন আবরণযুক্ত বীজের অঙ্কুরোদ্গম হইতে বিলম্ব হয়, ক্ষুদ্র এবং পাত্‌লা আবরণযুক্ত বীজের অঙ্কুরোদ্গম শীঘ্র হয়।

একবীজপত্রী বীজের ভ্রূণমূল:

অঙ্কুরোদ্গমকালে একবীজপত্রী বীজের ভাবীমূল নির্গত হইয়া নীচের দিকে যায়। কিন্তু ঐ মূল শীঘ্র মরিয়া যায় এবং ভ্রূণাক্ষের গোড়া হইতে গুচ্ছমূল (fibrous roots) বাহির হয়। ইতিমধ্যে ভাবীকাণ্ড মাটি ভেদ করিয়া উপরের দিকে উঠিতে থাকে। প্রথমে ঐ কাণ্ড কোলিঅপ্‌টাইলে আবৃত থাকে পরে ঐ আবরণ ভেদ করিয়া বৃদ্ধি পায়।

দ্বিবীজপত্রী বীজের ভ্রূণমূল:

অঙ্কুরোদ্গমকালে দ্বিবীজপত্রী বীজের ভাবীমূল সোজা মাটির নিম্নদিকে লম্বভাবে বাড়িয়া যায়। উহাকে বলে প্রধান বা লম্বমূল (Tap root)। ক্রমে উহার গাত্র হইতে শাখা-প্রশাখা বাহির হয়।

অঙ্কুরোদ্গমের তুলনা

একবীজপত্রী বীজ	দ্বিবীজপত্রী বীজ
১। বীজপত্র একটি	১। বীজপত্র তুইটি
২। অধিকাংশ সস্থল	২। অধিকাংশ অসস্থল
৩। ভাবীকাণ্ড পার্শ্বে (lateral) থাকে	৩। ভাবীকাণ্ড অন্তে ও বীজপত্র পার্শ্বে থাকে।
৪। ভ্রূণমুকুল কলিওপটাইলের সহিত বীজ হইতে বাহির হয়,	৪। ভ্রূণমূল বা ভ্রূণমুকুল আবৃত থাকে না,
৫। অঙ্কুরোদ্গম সচরাচর মৃদবর্ত্তী	৫। অঙ্কুরোদ্গম মৃদ্‌ভেদী অথবা মৃদবর্ত্তী,
৬। ভ্রূণমূল অল্পকাল মধ্যে মরিয়া যায় ও কাণ্ডের গোড়া হইতে গুচ্ছমূল বাহির হয়।	৬। ভ্রূণমূল প্রধান মূলে পরিণত হয়।

বীজরোপণ ঃ—ডিম্বকরন্ধ্রের মধ্য দিয়া ভ্রূণমূল নির্গত হয়। ডিম্বক নাভীর সন্নিকটে ডিম্বকরন্ধ্র থাকে। ডিম্বকনাভী সহজে চেনা যায়। ডিম্বকনাভী মাটির নীচের দিকে রাখিয়া বীজ রোপণ করিলে চারা নির্গমনের পক্ষে সহজ হয়।

বীজের আকারের সাধারণতঃ দ্বিগুণ পরিমাণ মাটির নীচে বীজ রোপণ করিলে চারা সহজে মাটির উপরে বাহির হইয়া আসে।

মাটির মধ্যে অধিক জল থাকিলে এবং বায়ুর অভাব হইলে অঙ্কুরোদ্গম হয় না। এইজন্য বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকিলে অথবা বৃষ্টির পরেই ভিজা মাটিতে বীজ বপন বা রোপণ করিতে নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

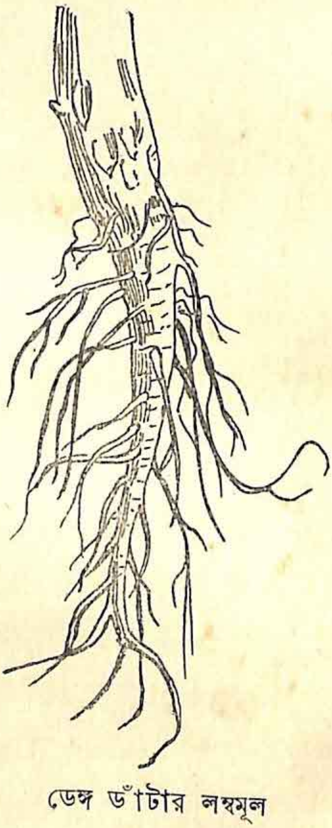
মূল ও তাহার কার্য্য

(Roots and their functions)

অঙ্কুরোদ্গমের পর ভ্রূণমূল আলোক পরিত্যাগ করিয়া নিম্নাভিমুখী হইয়া মাটির যে অঞ্চলে জল থাকে সেইদিকে বাড়িয়া যায় এবং প্রধান মূলে পরিণত হয় (Main axis), ইহাকে লম্বমূল (Tap root) বলে। ইহা প্রকৃত মূল (True root)। ক্রমে উহা হইতে শাখা-প্রশাখা (Secondary and tertiary or branch roots) নির্গত হয়। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের মূল এই প্রকার হয়, যেমন আম, জাম, কাঁটাল, ছোলা প্রভৃতির মূল।

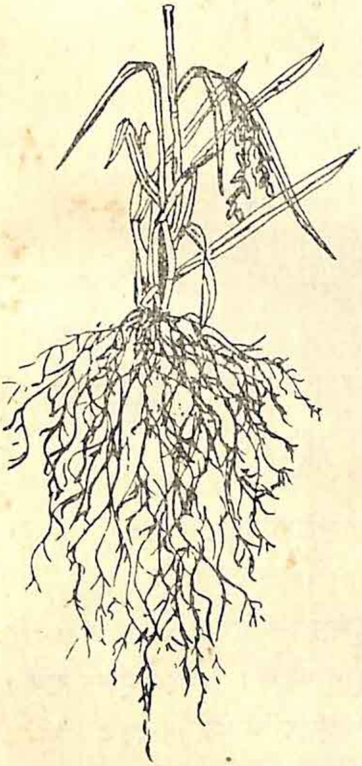
কাণ্ড যত উপরের দিকে ডালপালা ছড়াইয়া বৃদ্ধি পায়, প্রধান মূল হইতে ও তেমনি মাটির নীচে শাখা প্রশাখা মূল বাহির হইয়া বিস্তৃত হইতে থাকে এবং মাটির উপরের ডালপালার পাতার শেষপ্রান্ত এমনকি অধিক দূরে মাটির ভিতরে বিস্তৃত হইয়া যায়।

সাধারণতঃ একবীজপত্রী বীজ হইতে যে ভ্রূণমূল বাহির হয় তাহা কিছুকাল পরে মরিয়া যায় এবং কাণ্ডের গোড়া হইতে একগোছা সূক্ষ্মমূল নির্গত হয়। উহাদের গুচ্ছমূল বলে (fibrous roots)। লম্ব মূলের ন্যায় ইহারা মাটির গভীর দেশে যায় না, মাটির উপর স্তরের মধ্যে বিস্তৃত হয়, যেমন ধান, গম, ভুট্টা বাঁশ, ঘাস প্রভৃতি।



ডেঙ্গ ডাঁটার লম্বমূল

ভ্রূণমূল বৃদ্ধি পাইয়া যে প্রধান মূলে পরিণত হয় তাহা প্রকৃত মূল (Normal root) ইহা ব্যতীত উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ, যেমন কাণ্ড, ডাল ও পাতা হইতে যে সকল মূল জন্মে তাহারা অপ্রকৃত বা অস্থানিক মূল (adventitious roots)। সুতরাং একবীজপত্রী উদ্ভিদের গুচ্ছ মূল কাণ্ডের গোড়া হইতে বাহির হয় বলিয়া উহা ও অস্থানিক মূল। অস্থানিক মূল নানা প্রকার হইয়া থাকে যেমন ঃ—



ধান গাছের গুচ্ছমূল

(ক) **স্তম্ভমূল** (Prop roots) বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষের শাখা হইতে মূল বাহির হইয় মাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্তম্ভের মত ঐ শাখার ভার বহন করে।

(খ) **ঠেস মূল** (Stilt roots) ভুট্টা ও কেয়ার কাণ্ড হইতে হেলান-ভাবে মূল বাহির হইয়া মাটির মধ্যে গিয়া গাছটিকে সোজা রাখিতে সাহায্য করে।

(গ) **আরোহী মূল** (Climbing roots) ঃ—পান, গোলমরিচ, গজপিপুল প্রভৃতি লতার গাঁইট হইতে মূল বাহির হয় এবং ঐ মূল উচ্চ বৃক্ষের গায়ে আটকাইয়া উহারা উপরের দিকে আলোক পাইবার জন্য আরোহণ করে।

কাণ্ড ও মূলের পার্থক্য ঃ—কাণ্ডের বর্ণ সাধারণতঃ সবুজ, মূলের বর্ণ ঐরূপ হয় না। কাণ্ডে পর্ব্ব সন্ধি বা গাঁইট ও পর্ব্ব থাকে, মূলে ঐরূপ হয় না। কাণ্ডের শীর্ষে মুকুল থাকে, মূলে থাকে না। এই সকল

বিভেদ দেখিয়া মূল ও কাণ্ডের বিশেষতঃ ভূমধ্যস্থ কাণ্ডের পার্থক্য নিরূপণ করা হয়।

মূলের বিভিন্ন অঞ্চল (Regions of root) :— মূল ও উহার শাখা প্রশাখা গাছকে মাটির পর খাড়া করিয়া রাখে। যদিও উহারা মাটির রস সামান্য শোষণ করিতে সক্ষম কিন্তু মূল রোমই প্রধাণতঃ ঐ কার্য্য করিয়া থাকে।


ভুট্টাগাছের ঠেস মূল

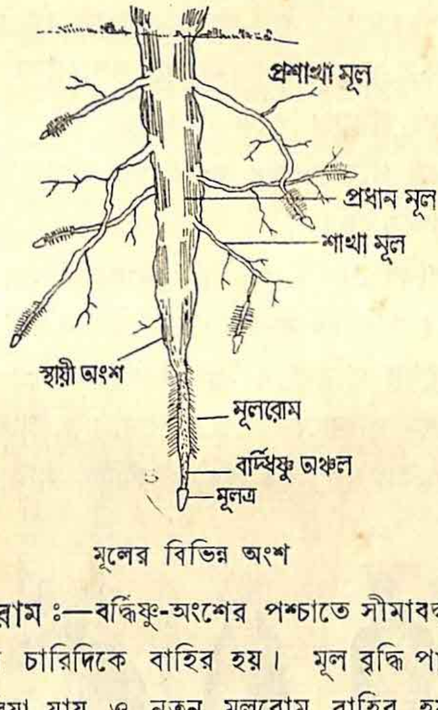
মূলের চারিটি অঞ্চল পরিলক্ষিত হয়—(ক) মূলত্র (Rootcap) (খ) বর্দ্ধিষ্ণু অঞ্চল (growing region) (গ) মূল রোম অঞ্চল (root hairs) (ঘ) স্থায়ী অঞ্চল।


পান গাছের আরোহী মূল

(ক) **মূলত্র :**—মূলের অগ্রভাগে একটি টুপি বা ঢাক্‌নি থাকে। ইহাকে মূলত্র বলে। মূল বৃদ্ধি পাইবার কালে পুরাতন মূলত্র শুকাইয়া যায় ও নূতন মূলত্র জন্মে। মূলের নরম অগ্রভাগকে মূলত্র রক্ষা করে। কঠিন মাটির ভিতরে বৃদ্ধি পাইবার কালে মূলত্রের বহিরাবাস (outer surface) আঠার মত পদার্থে পরিণত হয়, সুতরাং মৃত্তিকা কণিকার সহিত সংঘর্ষে মূলে কোন আঘাত লাগে না। মাটির মধ্যে যে দিকে জল থাকে মূলত্র সেই দিকে মূলকে পরিচালিত করে। জলজ-উদ্ভিদের মূলত্র থাকে না।

মূলত্রের প্রধান কাজ মূলকে রক্ষা করা এবং মাটির মধ্যে সহজে মূল বৃদ্ধির সহায়তা করা।

(খ) **বর্দ্ধিষ্ণু অঞ্চল** :—মূলত্রের ঠিক পশ্চাতে বর্দ্ধিষ্ণু অঞ্চল অবস্থিত। এই অংশে কোষ বিভাগ হইয়া মূল বৃদ্ধি পায়।



মূলের বিভিন্ন অংশ

(গ) **মূলরোম** :—বর্দ্ধিষ্ণু-অংশের পশ্চাতে সীমাবদ্ধ স্থান হইতে অসংখ্য মূলরোম চারিদিকে বাহির হয়। মূল বৃদ্ধি পাইলে পুরাতন মূলরোমগুলি ঝরিয়া যায় ও নূতন মূলরোম বাহির হয়। মূলরোম একটিমাত্র কোষ দ্বারা গঠিত। উহারা মূলের বাহিরের অংশ হইতে উৎপন্ন হয়। মাটি হইতে রস শোষণ করাই মূলরোমের প্রধান কাজ। মৃত্তিকা কণার সহিত সংলগ্ন থাকায় উহারা গাছকে মাটির সহিত আটকাইয়া রাখিতে সাহায্য করে।

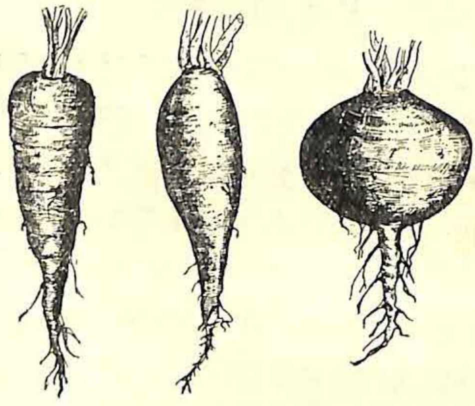
(ঘ) **স্থায়ী অঞ্চল** :—মূলরোমের উপর হইতে কাণ্ডের গোড়া পর্য্যন্ত মূলের স্থায়ী অঞ্চল। এই অংশে কোন মূলরোম থাকে না। এই স্থান হইতে শাখা মূল বাহির হয়। শাখামূলে বহু কোষ থাকে। মূলের ভিতরের অংশ হইতে উহারা উৎপন্ন হয়। শাখামূল উদ্ভিদকে

মৃত্তিকার সহিত দৃঢ়বদ্ধ রাখে, মূল রোম দ্বারা শোষিত মাটির রস প্রধান মূলে চালান করে, প্রধান মূল ঐরস কাণ্ডে চালনা করিয়া দেয়। এইরূপে শাখামূল ও প্রধানমূল রসবাহী নালীর কার্য করে।

উদ্ভিদ মূলরোম দিয়া মাটির রস শোষণ করে। মূলরোমগুলি মূলের প্রান্তভাগে থাকে। জল অথবা সার কাণ্ডের গোড়ায় প্রয়োগ না করিয়া কাণ্ডের গোড়া হইতে কিছু দূরে মূলরোমের অবস্থিতি স্থানে প্রয়োগ করিলে উদ্ভিদের পক্ষে সহজলভ্য হয়। মূলরোম অঞ্চল হইতে দূরে কম পরিমাণে জল অথবা সার প্রয়োগ করিলে মূলরোমে পৌঁছায় না, অপচয় হয়।

মূলের পরিবর্ত্তন (modification of roots) ঃ—বিভিন্ন প্রয়োজনে মূলের আকৃতির নানা প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটে।

প্রধান মূলের পরিবর্ত্তন (modification of tap root) ঃ—কোন কোন উদ্ভিদ ভবিষ্যতের জন্য প্রধান মূলে খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। এই প্রকার মূল স্ফীত হয়। স্ফীতির আকার তিন প্রকার হয়—



ক খ গ

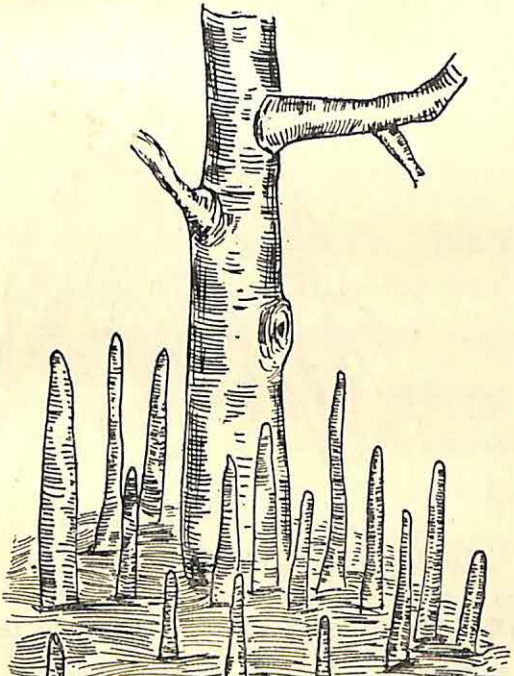
ক—গাজরাকৃতি, খ—মূলাকৃতি গ—শালগমাকার।

(ক) **মূলাকার** (Fusiform)—মূলার মত। অর্থাৎ মধ্যভাগ মোটা এবং উভয় দিক ক্রমশঃ সরু, যেমন মূলা।

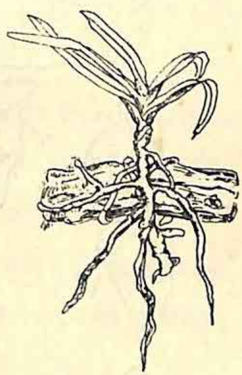
(খ) **গাজরাকৃতি** (Conical) :—মূলের উপরদিক মোটা এবং নীচের দিকে ক্রমশঃ সরু, যেমন গাজর।

(গ) **শালগমাকার** (Napiform) :—মূল বড় ও গোলাকার হয় এবং নীচের দিকে হঠাৎ সরু হইয়া একটি লম্বা শিকড় হইয়া যায়,—যেমন শালগম, বিট, ওলকপি।

অস্থানিক মূলের পরিবর্ত্তন (modification of adventitious roots) :—যান্ত্রিক ও জৈবনিক কার্য্যের জন্য অস্থানিক মূলের ও নানা পরিবর্ত্তন হয়।



সুন্দরী গাছের শ্বাসমূল

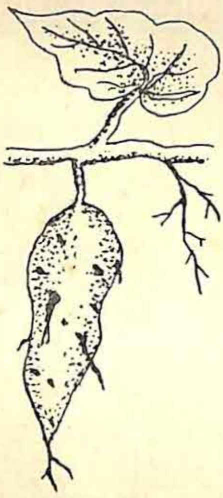


রাস্নার বায়বীয় মূল

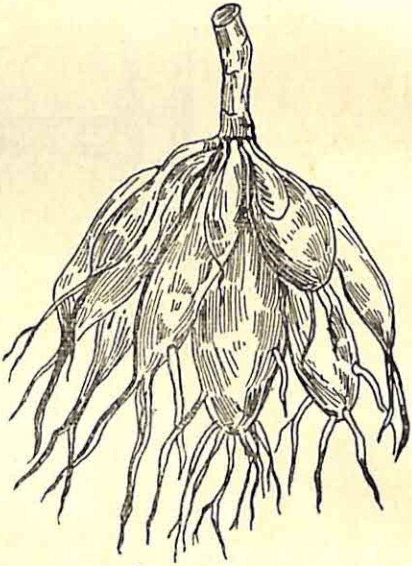
যান্ত্রিক কার্য্য (Mechanical function) :—যেমন স্তম্ভমূল, ঠেসমূল, আরোহীমূল যান্ত্রিক কার্য করিয়া থাকে।

জৈবনিক কার্য্য (Physiological functions) ঃ

(ক) **শ্বাসমূল** (Breathing roots) ঃ—জলা জায়গায় যেমন সুন্দরবন অঞ্চলে মাটির উপরে জল জমিয়া থাকার জন্য মাটির ভিতরে বায়ুর অভাব হয় এবং মূলের শ্বাসকার্য্যের অন্তরায় হয়। এই সব স্থানের উদ্ভিদের মূল হইতে অস্থানিক মূল নির্গত হইয়া মাটির উপরে সোজা উঠিয়া আসে। ঐ সব মূলের অগ্রভাগে কতকগুলি ছিদ্র থাকে। ঐ ছিদ্রগুলির সাহায্যে উহারা বায়ু গ্রহণ করে, যেমন সুন্দরী, গরান, গেঁও, কেওড়া প্রভৃতি।



রাঙ্গালুর কন্দাল মূল



শতমূলীর গুচ্ছিত মূল

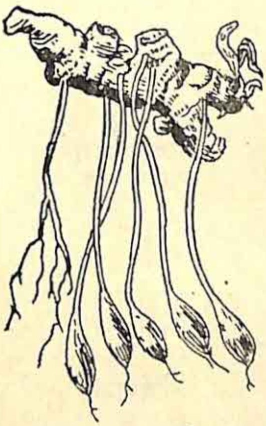
(খ) **বায়বীয় মূল** (aerial roots) ঃ—কোন কোন উদ্ভিদ অন্য বৃক্ষের উপর বাস করে, ইহাদের পরাশ্রয়ী বা **বৃক্ষরুহা** (Epiphyte) বলে। ইহাদের কতকগুলি মূল আশ্রয় বৃক্ষকে জড়াইয়া থাকে এবং কতকগুলি দীর্ঘ মূল ঝুলিয়া থাকে। ঐদীর্ঘ মূলগুলির গায়ে ধূসর বর্ণের আবরণ (Velamen) থাকে, উহার সাহায্যে বায়ু হইতে জলীয় বাষ্প, ধূলিকণা সংগ্রহ করিয়া উহারা খাদ্য প্রস্তুত করে।

ঐ মূলগুলিকে বলে বায়বীয় মূল। রাস্না ও নানা জাতীয় অর্কিডে এইরূপ মূল থাকে।

(গ) **চোষক মূল** (Houstoria) :—পূর্ণ পরজীবী উদ্ভিদের পাতা বা ডাঁটা সবুজ হয় না। উহারা একপ্রকার সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম আস্থানিক মূল আশ্রয় বৃক্ষের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া যাবতীয় প্রয়োজনীয় খাদ্য আশ্রয় বৃক্ষ হইতে শোষণ করিয়া লয়। ঐপ্রকার মূলকে বলে চোষক মূল যেমন অলোকলতা বা স্বর্ণলতায় থাকে।

(ঘ) **ভাণ্ডার মূল** (storage roots) :—অস্থানিক মূল ও স্ফীত হইয়া ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। ইহাদের আকৃতি বিভিন্ন প্রকার হয় :

(ক) **কন্দাল মূল** (Tuberous roots) কতকগুলি মূল কন্দের মত স্ফীত হয়, যেমন রাঙ্গালু, শাঁকালু প্রভৃতির ;



আমআদার অর্বুদ মূল

(খ) **গুচ্ছিত মূল** Fasciculated root) :—মূল স্ফীত হইয়া গুচ্ছের মত হয়, যেমন শতমূলী (asparagus), ডালিয়া।

(গ) **অর্ব্বুদযুক্ত মূল** (Nodulose roots) :—অস্থানিক মূলের কেবল অগ্রভাগ স্ফীত হয়, যেমন আমআদা।

মূলের কার্য্য (Functions of roots) :—মূলের সাধারণ কার্য্য (Normal functions) দুই প্রকার—জৈবনিক ও যান্ত্রিক।

জৈবনিক কার্য্য—মাটি হইতে মূল রোম দ্বারা শোষিত রস কাণ্ডে চালনা করা ;

যান্ত্রিক কার্য্য—উদ্ভিকে মাটির উপর দৃঢ়বদ্ধ রাখা। এই কার্য্যগুলি ব্যতীত কতকগুলি বিশেষ কার্য্য (Special functions) করে, যেমন—

(ক) ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করা—যেমন মূলা, শালগম, রাঙ্গালু প্রভৃতি ;

(খ) ভারবহন—বট-অশ্বত্থ ;

(গ) ঠেস দিয়া গাছকে সোজা রাখা—কেতকী ;

(ঘ) আরোহণ—পান, পিপুল ;

(ঙ) শ্বাসকার্য্য—সুন্দরী, গরান ;

(চ) বায়ু হইতে জলীয় বাষ্প শোষণ—অর্কিড, রাস্না,

(জ) অঙ্গজ জনন—(Vegetative reproduction) পটল, রাঙ্গালু।

বিভিন্ন প্রকার মূলের রেখা চিত্র

- মূল
  - প্রকৃত (True root)
    - প্রধান বা লম্ব মূল (Tap root)
    - পরিবর্তিত মূল (modifid root) খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য
      - মূলাকার
      - গাজরাকার
      - শালগমাকার
  - অস্থানিক
    - গুচ্ছমূল
    - বিশেষ কার্য্য-সাধক মূল
      - যান্ত্রিক কার্য্য
        - স্তম্ভমূল
        - ঠেস মূল
        - আরোহী মূল
      - জৈবনিক কার্য্য
        - ভাণ্ডার মূল
          - কন্দাল
          - গুচ্ছিত
          - অর্ব্বুদযুক্ত
        - শ্বাসমূল
        - পরাশ্রয়ী ও বায়ব মূল
        - চোষক মূল

মূলের প্রকৃতি অনুযায়ী ভূমিকর্ষণ :—গুচ্ছমূল মাটির অধিক নিম্নে যায় না, মাটির উপর স্তরে কয়েক ইঞ্চির মধ্যে বিস্তৃত থাকে। সুতরাং মাটি খুব গভীর করিয়া চাষ করিবার আবশ্যক হয় না। কিন্তু গুচ্ছমূল কোমল ও সূত্রবৎ হইবার জন্য উপর স্তরের মাটি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ধূলায় পরিণত করিয়া দিতে হয়।

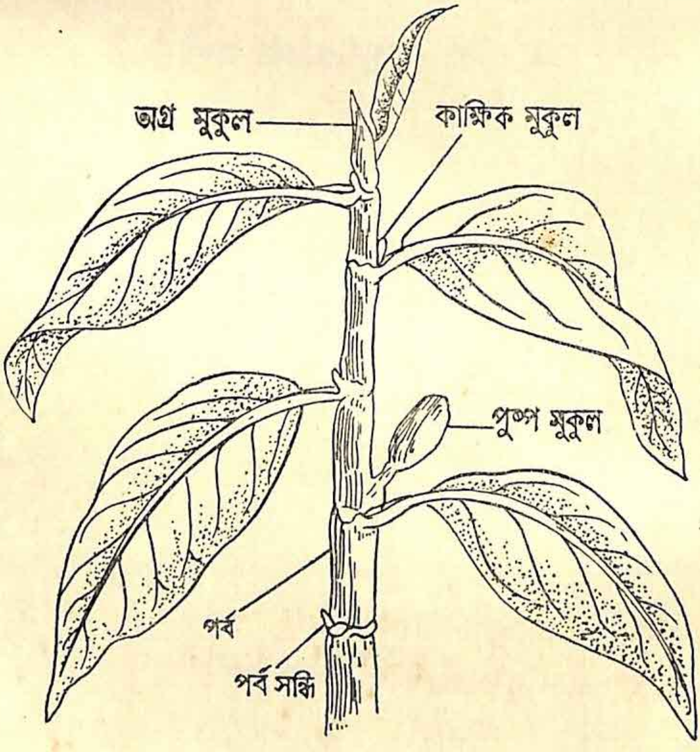
লম্বমূল মাটির নিম্নস্তরে গভীরদেশে প্রবেশ করে, সুতরাং মাটিতে গভীর চাষ দেওয়া প্রয়োজন।

মূলরোম যে অঞ্চলে বিস্তৃত থাকে সেই সব স্থানে সার ও জল প্রয়োগ করিতে হয়। নচেৎ অপচয় হইবার সম্ভবনা থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়

কাণ্ড (Stem)

ভ্রূণমুকুল বর্দ্ধিত হইয়া কাণ্ডে পরিণত হয় এবং মাটির উপরে আলোকের দিকে বাড়িয়া যায়। কোন কোন উদ্ভিদের কাণ্ডের গায়ে লোম থাকে, বিশেষ চারা অবস্থায়। শৈশব অবস্থায় কাণ্ড প্রায়ই সবুজ থাকে। কাণ্ড হইতে মুকুল (Bud), পাতা ও ফুল বাহির হয়। কাণ্ডের অগ্রভাগে সর্ব্বদাই একটি মুকুল থাকে। কাণ্ডে গাঁইট বা পর্ব্বসন্ধি (Nodes) থাকে। দুই পর্ব্ব সন্ধির মধ্যের অংশকে পর্ব্ব বা পাব



বলে (Intrnode)। পর্ব্বসন্ধি হইতে পাতা বাহির হয়। পাতা যে স্থানে কাণ্ডের সহিত কোণ সৃষ্টি করে সেই কোণটিকে বলে কক্ষ

(axil)। এইরূপ প্রত্যেক কক্ষে একটি করিয়া মুকুল থাকে। কক্ষ-মুকুল হইতে শাখা অথবা ফুল হয় অথবা মরিয়া ঝরিয়া পড়ে। যে সকল উদ্ভিদের কক্ষ মুকুল বিকশিত না হইয়া ঝরিয়া যায় তাহাদের শাখা প্রশাখা হয় না, যেমন তাল, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি। কাণ্ড কিম্বা শাখার অগ্রভাগে পত্রমুকুল থাকিলে উহারা উপর দিকে অথবা পার্শ্বে বৃদ্ধি পায়। পুষ্পমুকুল থাকিলে বৃদ্ধি রুদ্ধ হইয়া যায়।

কাণ্ডের কাজ (Functions of Stem) :—কাণ্ডের প্রধান কাজ—(ক) পাতা, শাখা প্রশাখা, ফুল ফল ধারণ করা—(খ) মাটি হইতে মূল দ্বারা শোষিত রস পাতায় ও বর্দ্ধিষ্ণু অঞ্চলে পরিচালন করা এবং পাতায় প্রস্তুত খাদ্য উদ্ভিদের বিভিন্নস্থানে চালনা করা।

বিশেষকার্য্য—(i) ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য সঞ্চিত রাখা, যেমন আলু, আদা, হলুদ প্রভৃতিতে ;

(ii) মরুভূমির উদ্ভিদ কাণ্ডের মধ্যে জল সঞ্চয় করিয়া রাখে, যেমন নানা জাতীয় ক্যাক্‌টাস্ ;

(iii) কোন কোন উদ্ভিদের কাণ্ড চ্যাপ্‌টা হইয়া সবুজবর্ণ ধারণ করে। ইহারা সবুজ পাতার মত খাদ্য প্রস্তুত করে। যেমন ফণিমনসা।

(iv) বহু উদ্ভিদের শাখা প্রশাখা হইতে বংশ বিস্তার হয়। বীজের পরিবর্ত্তে ভূমধ্যস্থ কাণ্ড দ্বারা এই প্রকার কার্য হয়, যেমন আলু, ওল, কচু প্রভৃতি।

(v) কোন কোন উদ্ভিদের কাণ্ডের অংশ কাঁটায় পরিণত হইয়া আত্মরক্ষার সহায় হয়, যেমন বেল, ডুরান্টা প্রভৃতি।

(vi) কোন কোন লতার কাণ্ড আকর্ষে পরিণত হইয়া উহাকে উপরে উঠিতে সাহায্য করে, যেমন আঙ্গুর, হাড়ভাঙ্গা।

কাণ্ডের আকৃতি (Forms of stems) :—কাণ্ড সাধারণতঃ গোলাকৃতি হইলেও বহু আকৃতি বিশিষ্ট হয়। মুথাঘাস, মাদুরকাটি

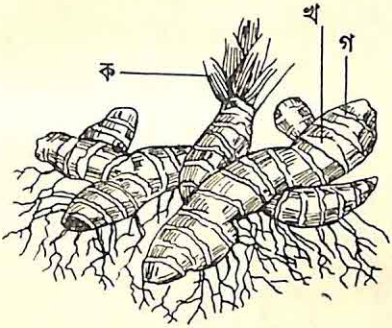
প্রভৃতির কাণ্ড ত্রিধার বা তিন কোণা (Tringular), হাড়ভাঙ্গা ও তুলসির কাণ্ড চতুর্ধার বা চার কোণা (square), ফণিমন্সার চ্যাপটা (flat), ঘাস ও বাঁশের ফাঁপা (Fistular), আখ ও ভুট্টার গ্রন্থিল (Jointed) ; কুমড়ার শিরাল (Ribbed)।

কাণ্ডের প্রকার (Kinds of stems) :—কাণ্ড দুই প্রকারের হয়—**সবল** (Strong) যাহারা খাড়া দাঁড়াইতে পারে, যেমন আম, জাম ইত্যাদি, আর **দুর্ব্বল** (Weak) যাহারা সোজা দাঁড়াইতে পারে না। যে সব দুর্ব্বলকাণ্ড উদ্ভিদ মাটির উপর পড়িয়া থাকে (prostrate) তাহাদের বলে **ব্রততী** (Creeper), যেমন দুর্ব্বা, রাঙ্গালু, আর যাহারা আশ্রয় অবলম্বন করিয়া উপরে উঠিয়া আলোকের দিকে যায় তাহাদের বলে **রোহিণী** (Climber)। রোহিণী কয়েক প্রকারের হয়—যাহারা নিজ কাণ্ড দ্বারা আশ্রয়কে জড়াইয়া উপরে উঠে তাহাদের বলে **বল্লী** (Stem climbers or Twiners) যেমন খামআলু, মাধবীলতা, অপরাজিতা প্রভৃতি ; অস্থানিক মূল দ্বারা আশ্রয় অবলম্বন করিয়া যাহারা উপরে উঠে তাহাদের বলে **মূলারোহী** (Root climbers), যেমন পান, গজপিপুল ; **আকর্ষ রোহিণী** (Tendril climbers) যাহাদের কাণ্ড, পাতা অথবা পত্রাংশ রূপান্তরিত হইয়া আকর্ষে (Tendril) পরিণত হয় এবং তাহার সাহায্যে উপরে উঠে যেমন—ঝুমকলতা, মটর, কুমড়া ; **বৃন্তরোহিণী**—(Petole climber) ইহারা পাতার বৃন্ত দ্বারা আশ্রয়কে জড়াইয়া উপরে উঠে, যেমন ছাগলবাটি, ঈশেরমূল ; **অঙ্কুশ রোহিণী** (Hook climbers), ইহাদের ফুলের বৃন্ত হইতে আঁক্ড়া গজায় তাহার দ্বারা উপরে উঠে, যেমন কাঁটালিচাঁপা ; **কণ্টক রোহিণী** (Thorn climbers)—ইহারা কাঁটার সাহায্যে উপরে উঠে, যেমন বেত, বাগানবিলাস, লতাগোলপ।

কাণ্ডের রূপান্তর (Modification of Stems) :—কখনও কখনও কাণ্ড উপর দিকে না উঠিয়া বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত

পরিবর্ত্তিত হইয়া নানা প্রকার আকৃতি ধারণ করে। পরিবর্ত্তন তিন প্রকার হইতে পারে—ভূনিম্নস্থ (underground), অৰ্দ্ধবায়ব (sub-aerial), বায়ব (aerial)।

ভূনিম্নস্থ বা মৃদ্গত কাণ্ড (underground stem) ঃ—বহু উদ্ভিদের কাণ্ড রূপান্তরিত হইয়া মাটির নীচে থাকে। উহাদের মূল বলিয়া ভ্রম হইলেও উহারা কাণ্ড, কারণ কাণ্ডের বৈশিষ্ট্যগুলি উহাতে বিদ্যমান থাকে, যেমন পৰ্ব্ব এবং পৰ্ব্বসন্ধিতে পাতা ও মুকুল থাকে। ভূনিম্নস্থ কাণ্ড লক্ষ্য করিলে পৰ্ব্ব ও পৰ্ব্বসন্ধি, এবং পৰ্ব্বসন্ধিতে আঁইশের মত রূপান্তরিত পাতা (scale leaf) শল্কপত্র এবং উহার কক্ষে মুকুল দেখা যায়। অনেকের গায়ে গোলাকৃতি দাগ (Rings) থাকে যেমন, আদা, হলুদে দেখা যায়, ঐগুলি মৃতশাখার চিহ্ন। মূল হইলে এই সব কিছুই থাকিত না। ভূনিম্নস্থ-কাণ্ডকে সচরাচর চারিভাগে বিভক্ত করা হয়—



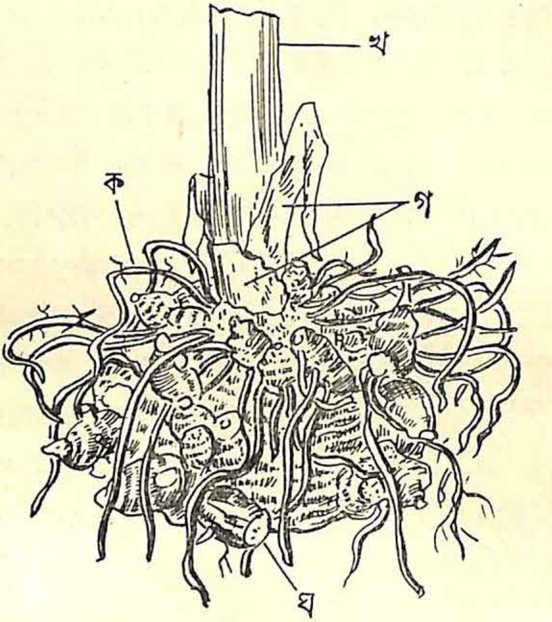
আদার মৃদগত কাণ্ড রাইজোম
ক—বিটপ, খ—শল্কপত্র
গ—পৰ্ব্বসন্ধি।

(১) **রাইজোম** (Rhizome) ঃ—ইহারা মাটির নীচে সমান্তরালে থাকে এবং উহাদের দুই পার্শ্ব হইতে অস্থানিক মূল নির্গত হয়, যেমন আদা, হলুদ। রাইজোম কখনও কখনও খাড়া হইয়া থাকে যেমন মানকচু। ইহাদের নিম্নভাগ হইতে অস্থানিক মূল বাহির হয়।

(২) **গুঁড়িকন্দ** (Corm) ঃ—যেমন ওল। ওলের গায়ে যে মুকি থাকে তাহাকে বলে (cormel। গুঁড়িকন্দ আকারে বেশ বড় হয় ও গাছের গুঁড়ির মত দেখায়।

(৩) **স্ফীতকন্দ** (Tuber) ঃ—যেমন আলু। ভূমধ্যস্থ শাখার অগ্রভাগে খাদ্য সঞ্চিত হইয়া উহা স্ফীত হইয়া গোল বা ডিম্বাকৃতি হয়।

উহার গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোখ থাকে তাহার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র শল্কপত্র ও শল্কপত্রের কোলে একটি করিয়া মুকুল থাকে। ঐ মুকুল হইতে নূতন গাছ জন্মে।



ওলের গুঁড়িকন্দ

ক—অস্থানিক মূল, খ—বিটপ, গ - শল্কপত্র।

(৪) **শল্ককন্দ** (Bulb):—ইহারা আকারে ক্ষুদ্র হয়। ইহাদের চারিদিকে শল্কপত্র গুচ্ছাকারে বেষ্টন করিয়া থাকে। শল্কপত্রগুলিতে ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য ও জল সঞ্চিত থাকে, যেমন পিঁয়াজ।

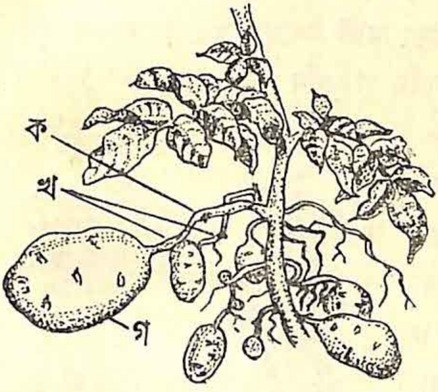
ভূনিম্নস্থ কাণ্ডের কার্য্য (functions) :—

(ক) ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য সঞ্চিত রাখা। পাতা মরিয়া যাইলে ঐ সঞ্চিত খাদ্য দ্বারা উদ্ভিদ জীবনধারণ করে।

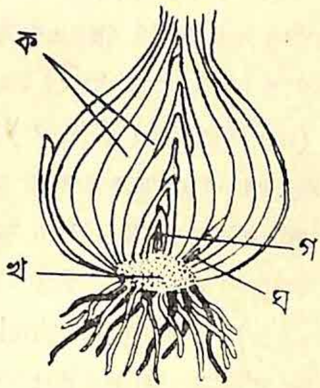
(খ) বংশ রক্ষা করা। কন্দজাতীয় উদ্ভিদের সচরাচর বীজ পরিপুষ্ট হয় না।

(গ) মাটির নিম্ন দেশে থাকায় শত্রু হইতে রক্ষা পায়।

অর্দ্ধবায়ব কাণ্ড ঃ—এই প্রকার কাণ্ডের কাজ প্রধানতঃ অঙ্গজ জনন দ্বারা বিস্তার লাভ করা (Vegetative propagation)। ইহারা চারি প্রকার ঃ

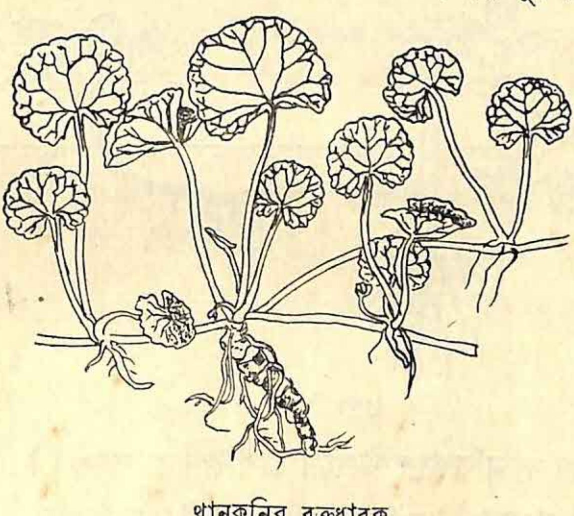


আলুর স্ফীতকন্দ
ক—ভূমধ্যস্থ শাখা (Under ground branch)
খ—শল্কপত্র (Scale leaf)
গ—স্ফীতকন্দ (Tuber)।



পিঁয়াজের শল্ককন্দ
ক—শল্কপত্র Scale leaf
খ—কাণ্ড Stem
গ—শীর্ষ মুকুল Apical bud
ঘ—পার্শ্ব মুকুল Lateral bud

(i) **ধাবক** (Runner) ইহাদের শাখা প্রশাখা খুব সরু ও দীর্ঘ

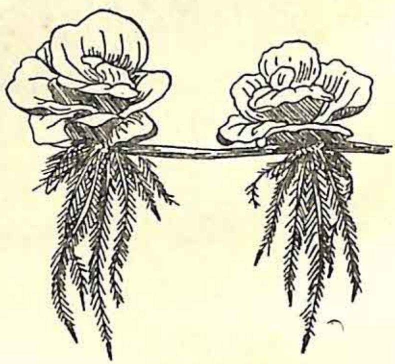


থানকুনির বক্রধাবক

হইয়া মাটির উপর বিস্তৃত হইয়া যায়। ইহাদের পর্ব্বগুলি লম্বা এবং পর্ব্বসন্ধি হইতে গুচ্ছমূল বাহির হয়, যেমন দূর্ব্বাঘাস, আমরুল, কলমি।

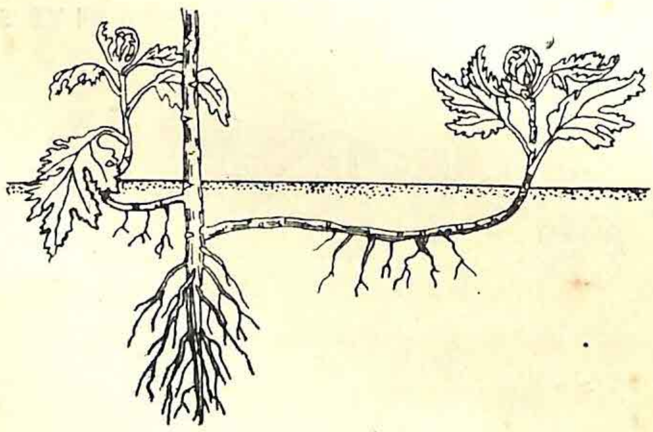
(ii) **বক্রধাবক** (Stolon) ঃ—লতার কক্ষমুকুল হইতে শাখা বাহির হইয়া দীর্ঘ হয় এবং বাঁকিয়া মাটি স্পর্শ করে, তখন ঐস্থান হইতে মূল ও পাতা বাহির হয়, যেমন থানকুনি।

(iii) **প্ররোহ** (Offset) ঃ—ইহাদের শাখা ক্ষুদ্র ও স্থূল, যেমন কচুরিপানায় থাকে। উহারা কচুরিপানাকে জলে ভাসাইয়া রাখে।



বড় পানার প্ররোহ

(iv) **উদ্ধ´ধাবক** (Sucker) ঃ—ভূনিম্নস্থ কাণ্ড হইতে শাখা বাহির হইয়া মাটির ভিতরে কিছুদূর বাড়িয়া উপরে উঠিয়া আসে এবং উহা হইতে মূল ও পাতা বাহির হয়, যেমন চন্দ্রমল্লিকা, পুদিনা।

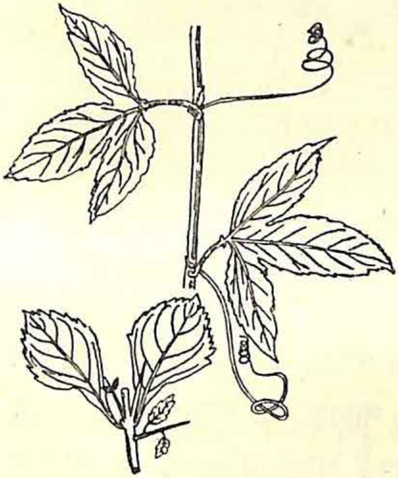


চন্দ্রমল্লিকার উর্দ্ধধাবক

বায়ব বা মৃত্তিকার উপরে রূপান্তরিত কাণ্ড (Metamorphosed stems) ঃ—কখন কখন কাণ্ড এমনিভাবে রূপান্তরিত

হইয়া যায় যে কাণ্ডের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করিয়া উহা কাণ্ড বলিয়া স্থির করিতে হয়। এইরূপ রূপান্তরিত কাণ্ড তিন প্রকার দেখা যায়ঃ

(১) **শাখা কণ্টক** (Thorn) ঃ—কোন কোন উদ্ভিদের শাখা অথবা মুকুল কাঁটায় পরিণত হইয়া যায়, যেমন বেল, ডুরাণ্টা, বাগান-বিলাস, বৈঁচ প্রভৃতি।



ঝুমকোলতার আকর্ষ

(২) **আকর্ষ** (Tendril) ঃ—কোন কোন লতার মুকুল আকর্ষে পরিণত হইয়া আশ্রয়কে বেষ্টন করিয়া উপরে উঠে, যেমন ঝুমকো-লতা, আঙ্গুর, হাড়জোড়া।

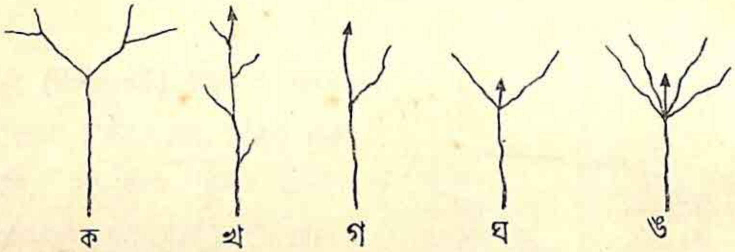
(৩) **পর্ণকাণ্ড** (Phylloclade) ঃ—মরুভূমি অঞ্চলে জলের অভাবের জন্য প্রস্বেদন কমাইবার উদ্দেশ্যে কোন কোন উদ্ভিদ পাতা ধারণ করে না, অথবা তাহাদের পাতা ক্ষুদ্রাকৃতি হয়, অথবা পাতাকে কাঁটায় (spine) রূপান্তরিত করে, এবং উহাদের কাণ্ড চ্যাপ্টা ও সবুজ বর্ণের হয়। ফণিমনসা, ক্যাক্টাস প্রভৃতি এইরূপ।

শাখাবিন্যাস (Branching)

কাণ্ড হইতে শাখার উৎপত্তি। কাণ্ডের উপর শাখাবিন্যাস প্রধানতঃ দুইপ্রকার দেখা যায়—পার্শ্বীয় (Lateral) ও দ্ব্যগ্র (Dichotomous)।

পার্শ্বীয় ঃ—প্রধান কাণ্ডের গায়ে কক্ষমুকুল হইতে যে শাখাগুলি পার্শ্বদিকে বহির্গত হয় তাহাদের পার্শ্বীয় শাখাবিন্যাস বলে। নগ্নবীজী উদ্ভিদের সাধারণতঃ এইরূপ শাখাবিন্যাস হইয়া থাকে। পার্শ্বীয় শাখা-বিন্যাস দুই প্রকার হয়—(ক) অনিয়ত (Indefinite or Racemose), (খ) নিয়ত—(Definite or Cymose)

অনিয়ত শাখাবিন্যাস :—শীর্ষমুকুলের সাহায্যে কাণ্ড ক্রমশঃ উপরের দিকে বাড়িয়া যায় এবং কক্ষমুকুল হইতে যে শাখাগুলি গজায় সেগুলি অগ্রোমুখ ভাগে (acropetal order) সজ্জিত থাকে। যেমন দেবদারু ও মেহেদী গাছের থাকে।



শাখা বিন্যাস

ক—দ্ব্যগ্র, খ—অনিয়ত, গ—একপার্শ্বীয়,
ঘ—দ্বিপার্শ্বীয়, ঙ—বহুপার্শ্বীয়।

নিয়ত শাখাবিন্যাস :—প্রধান কাণ্ডের শীর্ষমুকুলের বৃদ্ধি অল্পকাল মধ্যে স্থগিত হইয়া যায় এবং উহার সামান্য নীচে কক্ষমুকুল হইতে এক বা একাধিক শাখা নির্গত হয়॥ একটি শাখা বাহির হইলে তাহাকে বলে **একপার্শ্বীয়** (uniparous), যেমন অশোক, হাড়ভাঙ্গায় দেখা যায় ; দুইটি হইলে (Biparous) **দ্বিপার্শ্বীয়**, যেমন কৃষ্ণকলি, দুইএর অধিক হইলে (Multiparous) **বহুপার্শ্বীয়** শাখাবিন্যাস বলে, যেমন করবী, টগর, ক্রোটন্।

দ্ব্যগ্র (Dichotomous) :—অপুষ্পক উদ্ভিদের সাধারণতঃ এই প্রকার শাখা বিন্যাস হয়। কাণ্ডের অগ্রভাগ দুই বা ততোধিক শাখায় বিভক্ত হয়। শাখা দুইটি সমভাবের হইলে **প্রকৃত দ্ব্যগ্রশাখা বিন্যাস** (True dichotomy) বলে যেমন লাইকোপডিয়াম্, দুই প্রকারের হইলে যুক্তাক্ষ শাখাবিন্যাস বলে (Sympodial dichotomy)।

মুকুল (Bud)

মুকুল অপ্রাপ্ত (condensed) বিটপ (shoot)। উহা বিন্দুর

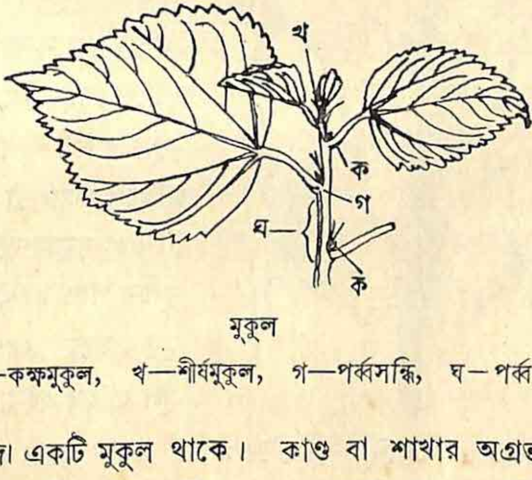
মত সূক্ষ্ম বর্দ্ধনশীল অঙ্গ। উহার মধ্যে কয়েকটি অতিক্ষুদ্র পর্ব্ব ও পত্র একত্র চাপা অবস্থায় থাকে। বাঁধাকপি একটি বৃহৎ পত্রমুকুল। উহা লম্বাভাবে কাটিলে উক্ত অংশগুলি বুঝিতে পারা যায়।



বাঁধাকপির লম্বচ্ছেদ

মুকুল প্রধানতঃ দুই-প্রকার—যেগুলি বিটপে (shoots) পরিণত হয় সেইগুলিকে **পত্রমুকুল** (Leaf bud) এবং যেগুলি ফুলে পরিণত হয় সেই-গুলিকে **পুষ্পমুকুল** (Flower bud) বলে।

মুকুলের স্বাভাবিক উৎপত্তিস্থান পাতার কক্ষ, কাণ্ড অথবা শাখার অগ্রভাগ। পাতার কক্ষে জন্মিলে **কক্ষমুকুল** (axillary or lateral bud), কাণ্ড বা শাখার অগ্রভাগে জন্মিলে **শীর্ষমুকুল** (Terminal or apical bud) বলে। বর্দ্ধনশীল কাণ্ডের

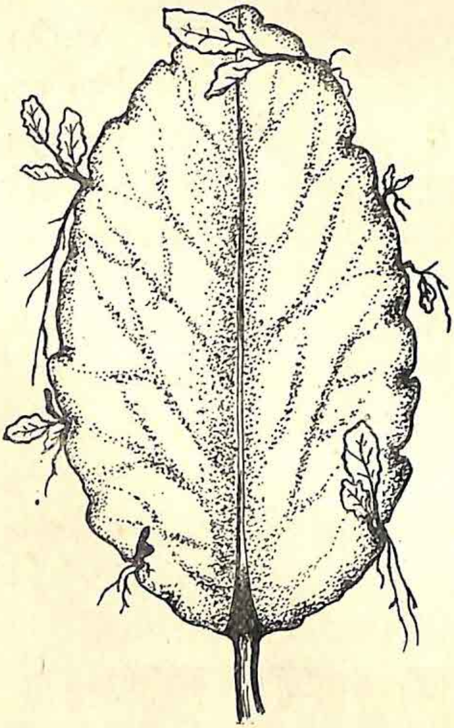


মুকুল

ক—কক্ষমুকুল, খ—শীর্ষমুকুল, গ—পর্ব্বসন্ধি, ঘ—পর্ব্ব।

মাথায় সর্ব্বদা একটি মুকুল থাকে। কাণ্ড বা শাখার অগ্রভাগে পত্র-মুকুল থাকিলে উহা উপর দিকে অথবা পার্শ্বের দিকে বাড়িয়া যায়।

পুষ্পমুকুল থাকিলে বৃদ্ধি রহিত হয়। কক্ষমুকুল হইতে শাখা অথবা ফুল হয়। সাধারণতঃ পাতার কক্ষে একটি করিয়া মুকুল থাকে। অনেক সময় একটি কক্ষে দুই অথবা অধিক সংখ্যক মুকুল জন্মে, সাধারণতঃ তিনটির অধিক জন্মে না। এইরূপ মুকুলকে বলে **অতিরিক্ত মুকুল** (accessory bud)। ইহারা পাশাপাশি থাকিতে পারে, যেমন কুমড়ায়, অথবা একটির উপর আর একটি থাকে, যেমন ঈশেরমূলে। সবগুলি কক্ষমুকুল হইতে ফুল বা শাখা হয় না, অধিকাংশ ঝরিয়া যায়। মুকুল সক্রিয় (active), প্রচ্ছন্ন (dormant) অথবা নিষ্ক্রিয় হয়। যে সব উদ্ভিদের কক্ষমুকুল বিকশিত হয় না, তাহাদের শাখা হয় না, যেমন তাল, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি। যে সব মুকুল ঝরিয়া যায় তাহাদের **পাতি মুকুল** (Deciduous buds) বলে।

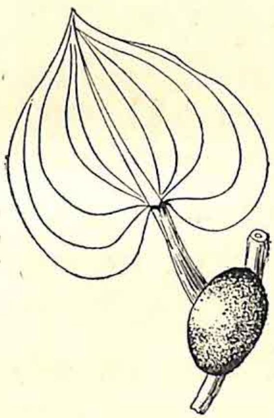


পাথরকুচি পাতার অস্থানিক মুকুল উদ্গম

মুকুলের উৎপত্তিস্থান অনুসারে উহাদের **স্থানিক** (normal) ও **অস্থানিক** (adventitious bud) মুকুল বলে। পূর্ব্বোক্তগুলি স্থানিক মুকুল। স্বাভাবিক উৎপত্তি স্থান ব্যতীত অন্যত্র জন্মিলে সেইগুলিকে অস্থানিক মুকুল বলে। পাতার উপর জন্মিলে পত্রাশয়ী (Epiphyllous) মুকুল বলে। পাথরকুচির পাতার খাঁজে এইরূপ মুকুল জন্মে এবং উহা হইতে মূল বাহির হইয়া গাছ হয়।

কোন কোন গাছ কাটিবার পর ডাল বা কাণ্ডের কাটা অংশে মুকুল জন্মিয়া থাকে। ইহাদের বলে

কাণ্ডজ মুকুল (cauline)। ডুরাণ্টার ডাল কাটিয়া পুঁতিলে এইরূপ মুকুল বাহির হয়। মূলের উপর মুকুল জন্মিলে তাহাকে বলে মূলজ মুকুল (Radical), পটলে এইরূপ মুকুল জন্মে। পিয়ারা, বেল প্রভৃতি গাছের শিকড় কাটিয়াযাইলে অথবা আঘাত প্রাপ্ত হইলে সেইস্থানে মুকুল উৎপন্ন হইয়া গাছ হয়। উদ্ভিদের মূলে সাধারণতঃ মুকুল জন্মে না।


খাম আলুর বুল্‌বিল্‌

মুকুলের রূপান্তর (modification of buds) বিশেষ কার্য্যের জন্য মুকুল নানাভাবে রূপান্তরিত হয়। আঙ্গুর, ঝুমকোলতা প্রভৃতির মুকুল আকর্ষে পরিণত হয় এবং উহাদের উপরে উঠিতে সাহায্য করে। বেল, ডুরাণ্টা, বাগানবিলাস প্রভৃতির মুকুল আত্মরক্ষার জন্য কাঁটায় পরিণত হয়। খামালু, চুবড়ি আলু প্রভৃতির মুকুলের মধ্যে খাদ্য সঞ্চিত থাকে। এইগুলি গোলাকার হইয়া যায়। ইহাদের **বুলবিল্‌** (Bulbil) বলে।

মুকুলের রক্ষণোপায় :—অত্যধিক তাপ বা শৈত্য হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত মুকুল নানা উপায় অবলম্বন করে—

(ক) শল্কপত্র দ্বারা আচ্ছাদিত হয়, যেমন চাঁপা, কাঁটাল, বট প্রভৃতিতে দেখা যায়, (খ) পত্রমূল (Leaf base) দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, (গ) ঘনরোম, মোম, তৈল বা রজন পদার্থ (resins) দ্বারা আবৃত থাকে, (ঘ) কিম্বা গাছের বল্কলের অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মরক্ষা করে।

কাণ্ডের প্রকৃতি (Habit) **অনুযায়ী উদ্ভিদের সংজ্ঞা** কাণ্ডের প্রকৃতি ও স্থিতিকাল অনুযায়ী উদ্ভিদের বিভিন্ন সংজ্ঞা দেওয়া হয় ঃ

(১) **বীরুৎ** (Herb) :—যাহাদের কাণ্ড কোমল। জীবনের স্থিতিকাল অনুযায়ী—বীরুৎ তিন প্রকার হয় :

(ক) **বর্ষজীবী** (Annuals) :—যাহারা কেবল একটি মাত্র ঋতুতে বাঁচিয়া থাকে, যেমন ধান, সরিষা, ইত্যাদি,

(খ) **দ্বিবর্ষজীবী** (Biennials) :—যাহারা দুই ঋতুকাল পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। প্রথম ঋতুতে মূলের মধ্যে খাদ্য সঞ্চয় করে এবং দ্বিতীয় ঋতুতে সঞ্চিত খাদ্য ব্যয় করিয়া ফুল, ফল ও বীজ উৎপাদন করে, যেমন মূলা, গাজর, শালগম ইত্যাদি।

(গ) **বহুবর্ষজীবী বা চিরজীবী** (Perennials) :—যাহারা দুই ঋতুর অধিক কাল বাঁচে, যেমন কলা, আদা, হলুদ প্রভৃতি।

(২) **গুল্ম** (Shrub) :—যে সকল উদ্ভিদ আকারে ছোট ও কাষ্ঠল কিন্তু গুঁড়ি (Trunk) থাকে না, তাহাদের গুল্ম বলে, যেমন আতা, গন্ধরাজ, জবা প্রভৃতি।

(৩) **বৃক্ষ** (Tree) :—যাহারা দীর্ঘ, দারুময় এবং গুঁড়ি থাকে।

পাতা ঝরিয়া যাওয়ার প্রণালী অনুযায়ী দুই প্রকার বৃক্ষ দেখা যায়—(i) **পর্ণমোচী** (Deciduous) যে সব গাছের সব পাতা একসঙ্গে ঝরিয়া যায়, যেমন শিমুল, আম্ড়া প্রভৃতি।

(ii) **চিরহরিৎ** (Evergreen) :—যাহাদের সব পাতা এককালে ঝরিয়া যায় না। আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি।

একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ড

ইহাদের কাণ্ড সাধারণতঃ ফাঁপা, চারা অবস্থায় প্রথমে কোলিওপ্-টাইল দ্বারা আবৃত থাকে। চারা বৃদ্ধি পাইলে পর্ব্বসন্ধি হইতে পাতা বাহির হয়। ইহাদের পাতা সচরাচর লম্বাকৃতি ও সংখ্যায় অল্প হইয়া থাকে। ইহাদের কক্ষমুকুল সাধারণতঃ বর্দ্ধিত হইয়া শাখায় পরিণত হয় না। শীর্ষভাগ কোমল পাতায় আবৃত থাকে। ঐ পাতাগুলির

কক্ষে যে শীর্ষমুকুল থাকে তাহা বৃদ্ধি পায় ও কাণ্ড দীর্ঘ হইতে থাকে। ইহাদের পর্ব্বসন্ধি সুস্পষ্ট এবং পর্ব্ব মসৃণ হইয়া থাকে।

দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ড

ইহাদের কাণ্ড সাধারণত নিরেট, কঠিন এবং মাটির উপর সোজা দাঁড়াইয়া থাকে। প্রতি বৎসর কাণ্ডের পরিধি বৃদ্ধি পায়। ইহাদের পাতা সচরাচর ক্ষুদ্রাকৃতি এবং সংখ্যায় অধিক হয়। কাণ্ডে শাখা প্রশাখা জন্মে। অনেক দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ড কোমল ও দুর্ব্বল হইয়া থাকে। উহারা মাটির উপর সোজা দাঁড়াইতে পারে না, লতাইয়া যায় অথবা আশ্রয়ের উপরে উঠিয়া থাকে।

কাণ্ড ও মূলের পার্থক্য

কাণ্ডের বর্ণ সাধারণতঃ সবুজ, মূলের বর্ণ ঐরূপ হয় না। কাণ্ডে পর্ব্বসন্ধি বা গাঁইট ও পর্ব্ব থাকে, মূলে ঐরূপ কখনও থাকে না। কাণ্ডের শীর্ষে মুকুল থাকে, মূলে তাহা থাকে না এই বিভেদগুলি দেখিয়া মূল ও কাণ্ডের, বিশেষ করিয়া ভূমধ্যস্থ কাণ্ড ও মূলের পার্থক্য নির্ণয় করা হয়।

কাণ্ডের প্রকৃতি অনুযায়ী বৃক্ষরোপণ :—কাণ্ডের প্রকৃতি এবং শাখা বিন্যাস রীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তদনুযায়ী ব্যবধানে বৃক্ষ ও ফসলাদি রোপণ করিতে হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

পাতা (Leaf)

পাতা কাণ্ডের রূপান্তরিত অংশ বিশেষ। সাধারণ উদ্ভিদের পাতা সবুজ। কাণ্ড বা শাখা প্রশাখার পর্ব্বসন্ধি হইতে উহারা বাহির হয়। পাতার কক্ষে মুকুল থাকে এবং মধ্যে নানা শিরা উপশিরা বিস্তৃত থাকে। শীতাঞ্চলের উদ্ভিদের পাতা শীতকালে ঝরিয়া যায়, গ্রীষ্মাঞ্চলের কোন কোন উদ্ভিদের পাতা গ্রীষ্মকালে ঝরিয়া পড়ে। পাতা উদ্ভিদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় দেহযন্ত্র। ইহার স্বাভাবিক কার্য্য (Normal functions) তিনটি—(ক) খাদ্য প্রস্তুত (খ) শ্বাসকার্য্য, (গ) প্রস্বেদন (Transpiration)। পাতা দিনের বেলায় ক্লোরোফিল ও সূর্য্যালোকের সাহায্যে মূলদ্বারা আনীত মাটির জল ও বায়ু হইতে গৃহীত কার্ব্বন-ডাই অক্সাইড দ্বারা খাদ্য প্রস্তুত করে। বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ এবং কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করিয়া শ্বাসকার্য্য পরিচালন করে। উদ্ভিদের অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত জল বাষ্পাকারে বাহির করিয়া দেয়। এই প্রক্রিয়াকে বলে প্রস্বেদন। এই প্রকার স্বাভাবিক কার্য্য ব্যতীত পাতা রূপান্তরিত হইয়া কতকগুলি বিশেষ কাজ করে, যেমন ঃ—

(ক) **আরোহণ**—কোন কোন উদ্ভিদের পাতা সম্পূর্ণ অথবা আংশিক আকর্ষে পরিণত হইয়া উদ্ভিদকে উপরে উঠিতে সাহায্য করে, যেমন বন্য মটর।

(খ) **আত্মরক্ষা** ঃ—দেহ রক্ষার নিমিত্ত কখন কখন পাতা সম্পূর্ণ অথবা আংশিক রূপান্তরিত হইয়া কাঁটায় পরিণত হয়, যেমন ফণিমনসা, খেজুর, আনারস।

(গ) **খাদ্য ও পানীয় সংরক্ষণ** ঃ—কোন কোন উদ্ভিদ পাতার মধ্যে খাদ্য ও জল ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখে, যেমন পুঁই, ঘৃতকুমারী, এলো বা অ্যাগাভে।

(ঘ) **বংশবিস্তার** :—কোন কোন উদ্ভিদের পাতার দ্বারা বংশ বিস্তার ঘটে, যেমন পাথরকুচি, বিউগোনিয়া।

(ঙ) **খাদ্য সংগ্রহ** :—ঝাঁঝি ও কলস উদ্ভিদের পাতা রূপান্তরিত হইয়া ফাঁদের আকার ধারণ করে। পোকামাকড় উহার ভিতর পড়িলে, বাহির হইতে পারে না। উহাদের দেহ হইতে উদ্ভিদ নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়া লয়।

(চ) **মুকুলকে রক্ষা করে** :—ভূনিম্নস্থ কাণ্ডের পত্র আঁইসের মত হইয়া যায়, উহাকে শল্কপত্র (Scale leaf) বলে। ঐপত্র মুকুলকে ঢাকিয়া রাখে এবং শীত তাপ হইতে রক্ষা করে।

পাতার অংশ (Parts of leaf)

পাতার তিনটি অংশ—(১) পত্রমূল (Leaf base), (২) বৃন্ত (Petiole), (৩) ফলক (Leaf blade or Lamina)।

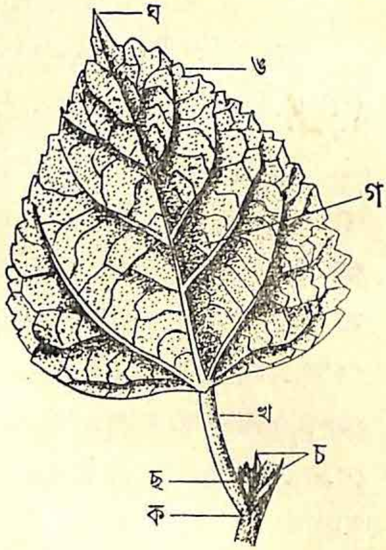
(১) **পত্রমূল** :—ইহা বৃন্তের নিম্নাংশ। কাণ্ড বা শাখার সহিত পাতাকে ইহা যুক্ত করিয়া রাখে। সাধারণ একবীজপত্রী উদ্ভিদে ইহা সুস্পষ্ট। কলা, সুপারি, ধান, ঘাস, ভুট্টা প্রভৃতি উদ্ভিদে ইহা কাণ্ডকে সম্পূর্ণ বেষ্ঠন করিয়া থাকে, নারিকেল, তাল প্রভৃতিতে অর্দ্ধবেষ্টন করে। কোন কোন দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পত্রমূল সামান্য স্ফীত হয়, যেমন আম, ছোলা, কৃষ্ণচূড়ায়, আবার অনেক উদ্ভিদের পত্রমূল সহজে চেনা যায় না। কোন কোন দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পত্রমূলের গোড়ায় দুইটি ছোট ছোট পাতার মত অংশ থাকে, উহাদের **উপপত্র** (Stipule) বলে। উপপত্র থাকিলে **সোপপত্রিক** (Stipulate), না থাকিলে **অনুপপত্রী** (Exstipulate) বলে। জবা, কার্পাস, ঢেঁড়স গোলাপ প্রভৃতি সোপপত্রিক।

উপপত্রগুলি সময় সময় রূপান্তরিত হয়। (ক) মটরের উপপত্র খুব বড় হইয়া পাতার কার্য্য করে। (খ) বট, কাঁটাল প্রভৃতির উপপত্র মুকুলকে আবৃত করিয়া রাখে, মুকুল বৃদ্ধি পাইলে উহারা খসিয়া

যায়। ইহাদের বলে **মুকুলাবরণ** (Bud scale)। (গ) কোন কোন উদ্ভিদে উপপত্র আকর্ষে পরিণত হয়, যেমন কুমারিকা। (ঘ) কাহারো উপপত্র কাঁটায় পরিণত হয়, যেমন বাব্‌লা, কুল প্রভৃতির।

(২) **বৃন্ত** (petiole):—বৃন্ত ফলককে আলোকের দিকে ধরিয়া রাখে। ইহার মধ্য দিয়া কাণ্ড হইতে মাটির রস ফলকে যায় এবং ফলকে প্রস্তুত খাদ্য কাণ্ডে ফিরিয়া আসে। ইহা ব্যতীত বৃন্ত আরো কতকগুলি কাজ করে।

(ক) কচুরিপানা ও পানিফলের বৃন্ত স্ফীত হইয়া গাছকে জলে ভাসাইয়া রাখে। (খ) ছাগলবাটি, ঈশের মূলের বৃন্ত আশ্রয়কে জড়াইয়া গাছকে উপরে উঠিতে সাহায্য করে। (গ) লেবু গাছের বৃন্ত পক্ষের মত বিস্তৃত হয়। (ঘ) আকাশমণির (Australian Accacia) পত্রফলক শৈশবে ঝরিয়া যায়, উহার বৃন্ত ফলকের আকার প্রাপ্ত হইয়া পাতার কাজ করে। কোন কোন উদ্ভিদের বৃন্ত থাকে না, তাহাদের **অবৃন্তক** (Sessile) বলে, যেমন শিয়াল-কাঁটা, আকন্দ। যাহাদের পাতার বৃন্ত থাকে তাহাদের বলে **সবৃন্তক** (Petiolate)।



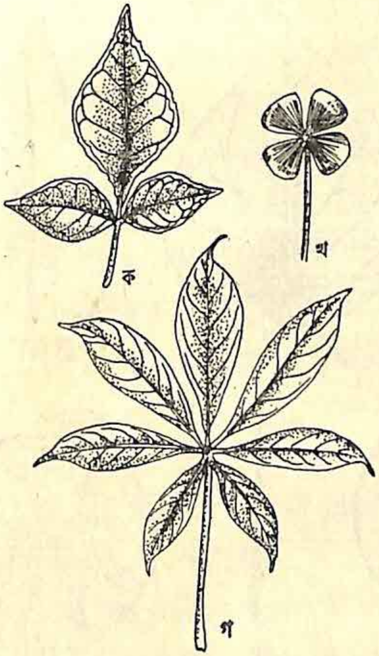
পাতার বিভিন্ন অংশ

ক—পত্রমূল, খ—বৃন্ত, গ—পত্রফলক, ঘ—পত্রশীর্ষ ঙ—কিনারা, চ—উপপত্র, ছ—কক্ষ মুকুল।

(৩) **ফলক** (Lamina) :— পাতার বিস্তৃত অংশকে ফলক বলে। সাধারণতঃ ইহা সবুজ বর্ণ হয়। ইহা পাতার সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ। ফলকের মধ্যভাগে একটা মোটা শিরা থাকে, উহাকে মধ্য শিরা (Midrib) বলে। উহা হইতে বহু উপশিরা

(Veins) ফলকের মধ্যে বিস্তৃত হয়। ফলকের কিনারাকে প্রান্ত (Margin), অগ্রভাগকে অগ্র (apex) এবং নীচের দিককে তল (Base) বলে।

ফলকের প্রকার (Forms of Lamina) :—ফলক দুই প্রকার হয়—এককপত্র (Simple leaf) এবং যৌগ পত্র (compound leaf)।



যৌগপত্র

ক—বেলপাতা, ত্রিফলক
খ—শুশনি, চতুর্ফলক
গ—শিমুল, সপ্তফলক

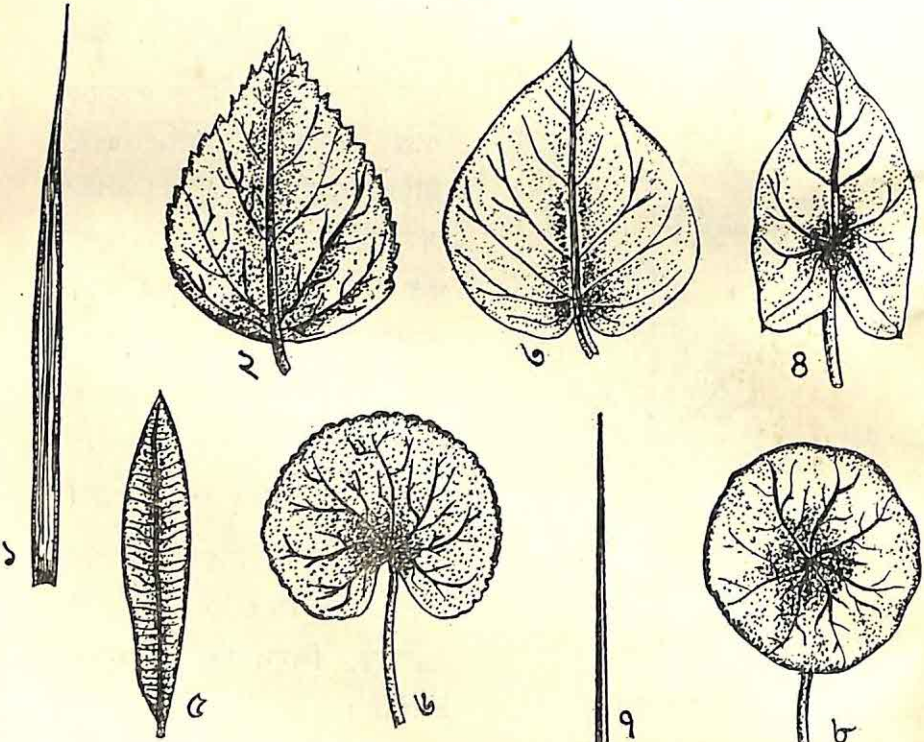
যে সব উদ্ভিদের পাতার বৃন্তে একটিমাত্র ফলক থাকে তাহাকে বলে এককপত্র। আম, জাম, কাঁটাল প্রভৃতি এককপত্র। যাহাদের পাতার বৃন্তে একাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলক থাকে তাহাদের বলে যৌগপত্র। যৌগপত্রের ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলককে বলে অণুফলক (Leaflet)। গোলাপ, বেল, শিমুল, তেঁতুল প্রভৃতির যৌগপত্র।

ফলকের সংখ্যানুযায়ী আবার শ্রেণী করা হয় যেমন বেলপাতা ত্রিফলক, শিমুলপাতা সপ্তফলক ইত্যাদি।

অধিকাংশ পাতার ফলকের উপরিভাগ মসৃণ। কোন কোন উদ্ভিদের ফলকের উপরিভাগে লোমের মত থাকায় খস্‌খসে হয়, যেমন কুমড়া, ডুমুর প্রভৃতির। কাহারো ফলকের উপরে কাঁটা থাকে, যেমন শিয়ালকাঁটা, বেগুন, কুল প্রভৃতির।

ফলকের আকৃতি (Shape of lamina) :—ফলকের

আকৃতি নানাপ্রকার হয়। যাহাদের ফলক সরু ও লম্বা তাহাদের বলে **রেখাকার** (linear), যেমন ঘাস, ধান, রজনীগন্ধা। **ডিম্বাকৃতি** (Ovate) অর্থাৎ নীচের অংশ চওড়া ও আগার দিক সরু, যেমন জবা, বট। পানের মত অর্থাৎ ডিম্বাকার কিন্তু নিম্নভাগে খাঁজ থাকে তাহাদের বলে **তাম্বুলাকার** (Cordate), যেমন পান। পাতার নিম্নভাগের খাঁজের তুইপার্শ্বের খণ্ড তুইটি সমান এবং ফলকের অগ্রভাগ



ফলকের বিভিন্ন আকৃতি

১। রেখাকৃতি—ঘাস, ৫। বল্লমাকৃতি—করবী,
২। ডিম্বাকৃতি—জবা, ৬। বৃক্কাকার—থানকুনি,
৩। তাম্বুলাকার—পান, ৭। সূচাকার—পাইন,
৪। মানকপত্রাকার—মানকচু ৮। চক্রাকার—পদ্ম।

সরু, তাহাকে বলে **মানক পত্রাকার** (Sagittate), যেমন মানকচু। বল্লমের মত হইতে হইলে **বল্লমাকৃতি** (Lanceolate) যেমন বাঁশ,

করবী, আতা। বৃক্কের মত (Kidney) আকৃতি হইলে **বৃক্কাকার** (Reniform), যেমন থানকুনি। হাঁসের পায়ের মত হইলে **হংসপদাকার** (Crisped), যেমন লাউ, কুমড়া। সূচের মত হইলে **সূচাকার** (Acicular), যেমন পাইন। গোল হইলে **চক্রাকার** (Rotund) যেমন পদ্ম। ফলক প্রশস্ত ও লম্বা এবং উভয় প্রান্ত গোলাকার হইলে **আয়ত** (Oblong), যেমন কলাপাতা।

ফলকের প্রান্ত বা কিনারা (Margin of lamina) :—ফলকের ধার বা কিনারা নানাপ্রকার হইয়া থাকে, কাহারো অখণ্ড বা সমান (Entire) যেমন আম, জাম, কাঁটাল, কাহারো করাতের মত **ক্রকচ** (Serrate), যেমন জবা, আনাসর, গোলাপ, কাহার ঢেউখেলান বা তরঙ্গিত, যেমন দেবদারু, কাহার পাতার কিনারা যৌগপত্রের মত প্রায় বিভক্ত, যেমন গাঁদা, পেঁপে, রেড়ি।

ফলকের অগ্রভাগ (apex of Lamina) :—ফলকের অগ্রভাগ ও বিভিন্ন আকৃতির হয়। **সূক্ষ্মাগ্র** (acute), যেমন জবা, আম, দীর্ঘশীর্ষ (acuminate), যেমন অশ্বত্থ, পান, কাহারো সূচ্যগ্র (Mucornate) যেমন আনারস, খেজুর, কাহারো ভোঁতা (Obtuse) যেমন বট, কাঁঠাল। কোন কোন উদ্ভিদের পত্রের অগ্রভাগ আকর্ষে পরিণত হয়, যেমন মটর।

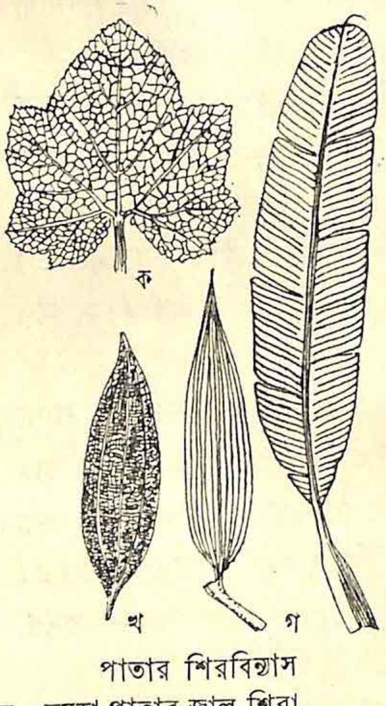
ফলকের শিরা বিন্যাস (Venation) :—মূল, কাণ্ড ও শাখা প্রশাখার মধ্য দিয়া মাটির রস শিরা উপশিরায় প্রবাহিত হইয়া পাতার মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। আবার উদ্ভিদের যে খাদ্য পাতায় প্রস্তুত হয় তাহাও শিরা উপশিরার ভিতর দিয়া উদ্ভিদ দেহের সর্ব্বত্র প্রেরিত হয়। শিরাগুলি পাতার কাঠামোর কাজ করে, পাতাকে শক্ত রাখে, সহজে পড়িয়া যাইতে দেয় না।

ফলকে প্রধানতঃ দুইপ্রকার শিরা বিন্যাস দেখা যায়—(ক) শিরাগুলি ইতস্ততঃ জালের মত বিস্তৃত হইয়া থাকে। এইপ্রকার বিন্যাসকে বলে **জালিকাশিরা বিন্যাস** (Reticulate), (খ) আর

একপ্রকার পরস্পর সমান্তরালে থাকে, তাহাকে বলে সমান্তরাল শিরাবিন্যাস (Parallel venation)।

দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পাতার শিরাবিন্যাস প্রায়ই জালিকা শিরা বিন্যাস হয়। একবীজপত্রী উদ্ভিদে সাধারণতঃ সমান্তরাল শিরা বিন্যাস থাকে।

জালিকা শিরাবিন্যাস ঃ—ফলকের ঠিক মধ্যভাগে বৃন্ত হইতে আগা পর্য্যন্ত একটি মোটা মধ্যশিরা (Midrib) থাকে। মধ্য শিরার উভয় পার্শ্বে পাতার কিনারা পর্য্যন্ত শাখা শিরা থাকে এবং ঐগুলি হইতে বহু সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম উপশিরা চারিদিকে জালের মত বিস্তৃত হয়। জালিকাশিরার মধ্যে যেগুলি পালকের মত দেখায় তাহাদের বলে **পক্ষশিরা** (Pinnate) যেমন অশ্বত্থ, আম, পেয়ারা। যাহাদের শিরাগুলি বৃন্তাগ্র হইতে পত্র-ফলকের মধ্যে মানুষের হাতের অঙ্গুলির মত বিস্তৃত দেখায় তাহাদের বলে **করশিরা** (Palmate), যেমন পেঁপে, শশা, রেড়ি। কুল, তেজপাতা, দারু-চিনি প্রভৃতির ফলকের মধ্যে তিনটি শিরা পাশাপাশি দেখা যায়, মধ্যেরটি সোজ, পার্শ্বের ছুইটি ধনুকের মত বাঁকা। এইরূপ শিরাবিন্যাসকে বলে ধনুঃশিরা (curved venation)।



পাতার শিরবিন্যাস
ক—কুমড়া পাতার জাল শিরা
খ—তেজপাতার ধনুঃশিরা
গ—বাঁশ ও কলাপাতার সমান্তরাল শিরা

সমান্তরাল শিরা বিন্যাস

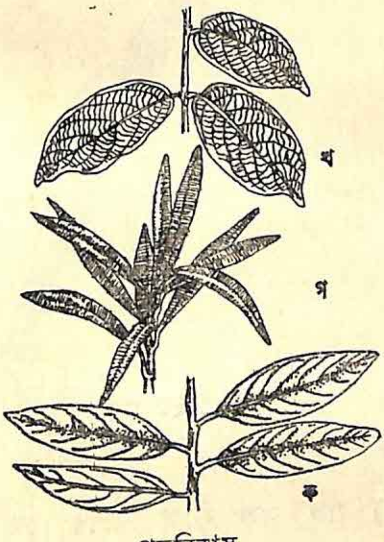
কতকগুলি মোটা শিরা পাশাপাশি সরলভাবে ফলকের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমান্তরালে থাকে তাহাকে সমান্তরাল

শিরাবিন্যাস বলে। সমান্তরাল শিরা বিন্যাস ও জলিকাশিরা বিন্যাসের মত পক্ষশির, যেমন কলাপাতায় অথবা করশির, যেমন ঘাস, বাঁশ, তালপাতা, প্রভৃতিতে থাকে।

পত্রবিন্যাস (arrangement of leaves or phyllotaxy)

কাণ্ড ও শাখা প্রশাখার উপর পাতা যেরূপ পদ্ধতিতে সজ্জিত থাকে তাহাকে পত্রবিন্যাস (Phyllotaxy) বলে। প্রধানতঃ তিন প্রকার পত্রবিন্যাস দেখা যায়—

(ক) **একান্তর** (alternate): পর্ব্বসন্ধি হইতে একটিমাত্র পাতা বাহির হয় এবং উপরের পাতাটি বিপরীতমুখী হইয়া থাকে, যেমন তামাক, সরিষা, জবা প্রভৃতিতে থাকে।



পত্রবিন্যাস
ক—একান্তর, খ—অভিমুখ
গ—আবর্ত্ত

(খ) **অভিমুখ** (Opposite) :—একই পর্ব্বসন্ধি হইতে বিপরীত মুখে দুইটি পত্র থাকে, যেমন তুলসী, আকন্দ, পিয়ারা প্রভৃতিতে থাকে।

(গ) **আবর্ত্ত** (Whorled) :— একটি পর্ব্বসন্ধি হইতে দুইটির অধিক পত্র বাহির হইয়া চক্রাকারে থাকে, যেমন ছাতিম, করবী প্রভৃতিতে দেখা যায়।

মঞ্জরীপত্র (Bracts)

পাতা ফুলের দিকে যত অগ্রসর হয় ততই ক্রমশঃ ক্ষুদ্র আকার ধারণ করে এবং অনেক সময় উহাদের নানাপ্রকার রূপান্তর হয়। এইরূপ পত্রকে মঞ্জরীপত্র (Bracts) বলে। মঞ্জরীপত্রের কক্ষে একটি পুষ্প অথবা একটি পুষ্পমঞ্জরী থাকে। সব ফুলের মঞ্জরীপত্র থাকে না।

মঞ্জরীপত্র নানাবর্ণ ও আকৃতি বিশিষ্ট হয় এবং উহাদের স্থায়ীত্বকালও বিভিন্ন হয়।

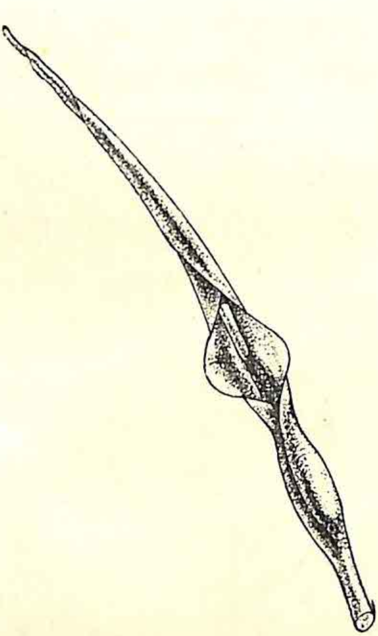
(১) **পত্রসদৃশ** (Leafy) :—সবুজ বর্ণ পত্রসদৃশ, যেমন মুক্তাঝুরি।

(২) **দলবৎ** (Petaloid) :—উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট, যেমন বাগানবিলাস।

(৩) **স্পেদ** (spathe) :—নৌকার মত বৃহৎ যেমন কচু, খেজুর, তাল, কলা।

(৪) **গ্লুম** (glume) :—শুষ্ক খোসার মত, ধান্য-গোত্রীয় উদ্ভিদে এইরূপ থাকে, ধান, যব, গম, ভূট্টা, ঘাস প্রভৃতি (ধানের তুঁষ গ্লুমচূর্ণ)।

(৫) **পালিয়া** (Palae) :—পাতলা আঁশের মত—(chaff-like) সূর্য্যমুখীর ভিতরের এক একটি ক্ষুদ্র পুষ্পিকায় (florets) থাকে, ধানের খোসায় দুইটি লম্বা শিরা বিশিষ্ট একটি পালিয়া থাকে।



কচু গাছের স্পেদ

(৬) **উপবৃতি** (Epicalyx) সরু, সরু সবুজ বর্ণের যে মঞ্জরীপত্র ফুলের বৃতিকে বেষ্টন করিয়া থাকে, যেমন জবাফুলে থাকে।

(৭) **মঞ্জরী পত্রাবরণ** (Involucre) : দুই বা অধিক সংখ্যক মঞ্জরীপত্র পুষ্পবিন্যাসকে বেষ্টন করিয়া থাকে, যেমন সূর্যমুখী ও গাঁদা ফুলে দেখা যায়।

পাতার আকৃতি অনুযায়ী বৃক্ষরোপণঃ—যেমন শাখা প্রশাখার বিস্তার অনুযায়ী ব্যবধানে বৃক্ষাদি রোপণ করা হয়, তেমনি পাতার আকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তদনুযায়ী ব্যবধানে বৃক্ষাদি রোপণ করিতে হয় যাহাতে এক গাছের পাতা পার্শ্ববর্ত্তী গাছের উপরে না পড়ে, যেহেতু পাতার শেষপ্রান্ত অবধি মূল মাটির নীচে বিস্তৃত থাকে।

পঞ্চম অধ্যায়

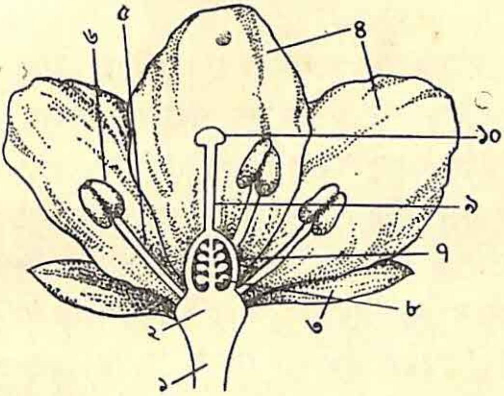
ফুল (Flower)

একটি সম্পূর্ণ ফুল পত্রমুকুলের রূপান্তর। ফুলের বিভিন্ন অংশও পাতার রূপান্তর ভিন্ন অন্য কিছু নহে। পদ্ম বা শালুক ফুলের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করিলে পাতা কিরূপে রূপান্তরিত হইতেছে স্পষ্ট বোঝা যায়। পাতার কক্ষ হইতে একটি ফুল অথবা মঞ্জরীদণ্ড বাহির হয়। মঞ্জরীদণ্ডে বহু ফুল ফোটে। মঞ্জরীর প্রধান দণ্ড এবং একক ফুলের বৃন্তকে **পুষ্পদণ্ড** (Peduncle) বলে। মঞ্জরীর প্রতিটি পুষ্পিকার বৃন্তকে **পুষ্পবৃন্তিকা** (Pedicel) বলে। কোন কোন ফুলের বৃন্ত হয় না, তাহাদের বলে অবৃন্তক (Sessile), যাহাদের বৃন্ত থাকে তাহাদের বলে সবৃন্তক (Pedicellate) ফুল। সম্পূর্ণ ফুলটি বৃন্তের যে স্থানে সংলগ্ন থাকে তাহাকে **পুষ্পাক্ষ** (Thalamus) বলে। শাখা রূপান্তরিত হইয়া পুষ্পাক্ষে পরিণত হয় (Modifid branch)। পুষ্পাক্ষ নানা আকারের হয়,—যেমন (ক) **উত্তল** (Convex), কার্পাস, বেগুন, জবা প্রভৃতির, (খ) **অবতল** (Concave) যেমন গোলাপ ফুলের, (গ) **দীর্ঘাকৃতি** (elongated) যেমন আতা, নোনায় থাকে, (ঘ) **চ্যাপটা** (flat) যেমন মটরে, (ঙ) **লাটিমের মত** (Top shaped) গাঁদা ফুলের, (চ) বলের মত (ball shaped) যেমন কদম্ব ফুলের।

ফুল ফুটিবার একটা নির্দ্দিষ্ট সময় থাকে। ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের ফুল ফোটে। যে সব ফুল দিনের বেলায় ফোটে তাহাদের সচরাচর বর্ণ উজ্জ্বল এবং গন্ধ স্নিগ্ধ হয়, রাত্রিকালে যাহারা ফোটে তাহাদের বর্ণ শুভ্র অথবা ফিকা এবং তীব্র গন্ধ যুক্ত হয়। প্রখর শীতাঞ্চলের ফুলের সচরাচর গন্ধ ও বর্ণ উজ্জ্বল হয় না।

ফুলের অংশ (Parts of flower):—ফুল চারিটি পুষ্পপত্র চক্রে (Four whorls of floral leaves) গঠিত। উহা পুষ্পাক্ষের

উপর সজ্জিত থাকে—(১) বৃতি (calyx), (২) দলমণ্ডল (corolla), (৩) পুংস্তবক বা পুংকেশর চক্র (Androecium,) (৪) স্ত্রীস্তবক বা গর্ভকেশর চক্র (Gynaecium)।



ফুলের বিভিন্ন অংশ দীর্ঘচ্ছেদে দেখান হইয়াছে

১। পুষ্পদণ্ড—Peduncle
২। পুষ্পাক্ষ—Thalamus
৩। বৃতি—Sepal
৪। পাপড়ি—Petal
৪। পুংকেশর দণ্ড—Filament } পুংস্তবক
৬। পরাগধানী—Anther }
৭। গর্ভাশয়—Ovary
৮। ডিম্বক—Ovule } স্ত্রীস্তবক
৯। গর্ভদণ্ড—Style
১০। গর্ভমুণ্ড—Stigma

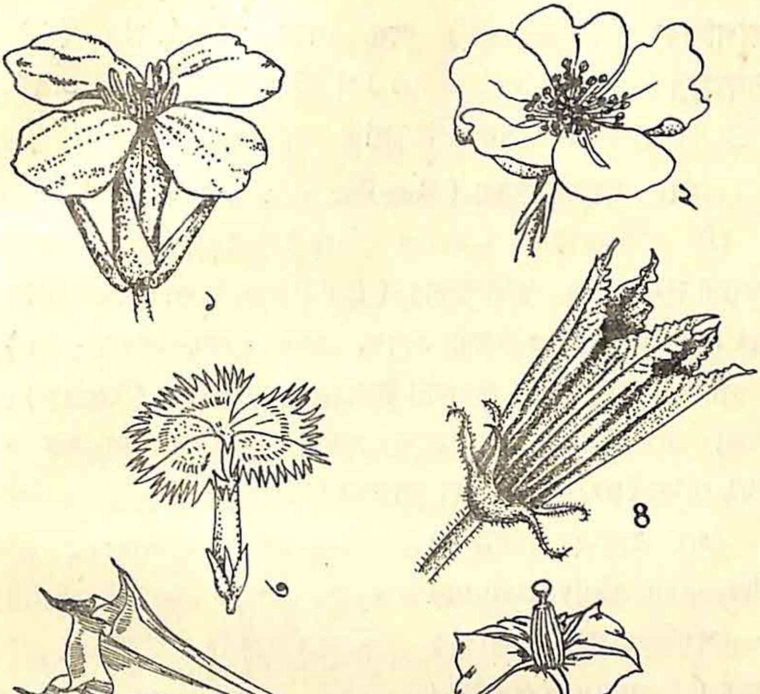
বৃতি :—ইহা ফুলের প্রথম চক্র, সর্ব্বনিম্নে অবস্থিত, সবুজপত্র সমষ্টি দ্বারা গঠিত। বৃতির অংশগুলি সম্পূর্ণ যুক্ত **যুক্তবৃতি** (Gamosepalous), খণ্ডিত অথবা বিভক্ত বিযুক্তবৃতি (Polysepalous) হইয়া থাকে। যুক্তবৃতি জবাগোত্রীয় (Malvaceae) উদ্ভিদের ফুলে হয়, যেমন বেগুন, ধুতুরা, লঙ্কা, জবা প্রভৃতি ফুলে থাকে। সর্ষপ গোত্রীয় (Cruciferae) উদ্ভিদে বিযুক্তবৃতি থাকে, যেমন সরিষা, মূলা প্রভৃতির ফুলে।

বৃতির প্রতেক ভাগকে বলে বৃত্যংশ (Sepal)। কোন ফুলের বৃতির নীচে একটি খণ্ডিত মঞ্জরীপত্র থাকে তাহাকে উপবৃতি (Epi-calyx) বলে, যেমন জবাফুলে থাকে। সাধারণ ফুলের উপবৃতি থাকে না।

বৃতির স্থিতিকাল :—সচরাচর ফুল ফুটিবার সঙ্গে বৃতি খসিয়া যায়। কোন কোন ফুলের বৃতি ফুল ফুটিবার পূর্ব্বেই ঝরিয়া যায়, অনেকের বৃতি আবার ফুলের সহিত লাগিয়া থাকে। শিয়ালকাঁটা, চাঁপা প্রভৃতির বৃতি ফুল ফুটিবার পূর্ব্বে ঝরিয়া যায়, ইহাদের বলে **আশুপাতী** (caducous)। দল ও বৃতি একত্রে ঝরিলে বলে **পাতী** (deci-duous) যেমন পদ্ম। বৃতি না ঝরিয়া ফলের সহিত বাড়িতে থাকিলে বলে **স্থায়ী** (Persistent), যেমন বেগুন, চালতায় থাকে। চাল্‌তার যে অংশ খাওয়া হয় উহা বৃতি, ফলকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে।

দলমণ্ডল :—বৃতির উপরে দ্বিতীয় পুষ্পপত্রস্তবক বা দলমণ্ডল অবস্থিত। দলের প্রত্যেকটি অংশকে বলে পাপড়ি (Petal)। কীট-পতঙ্গদিগকে আকৃষ্ট করিবার জন্য পাপড়ির নানাপ্রকার গঠন, বর্ণ ও গন্ধ হয়। পাপড়িগুলি যুক্ত অথবা বিযুক্ত থাকিতে পারে। বিযুক্ত হইলে উহাকে **বিযুক্তদল** (Polypetalous) এবং যুক্ত হইলে **যুক্তদল** (Gam-opetalous) বলে। কোন কোন ফুলের পাপড়ি সবুজ হয়, তাহাদের বলে **বৃতিসদৃশ দল** (Sepaloid), যেমন আতা, দেবদারু, কাঁটালি-চাঁপা। কোন কোন ফুলের বৃতি ও দল পৃথক থাকে না, তাহাদের বলে **পুষ্পপুট** (Perianth), যেমন রজনীগন্ধা।

দলমণ্ডল নানা আকারের হয়, যেমন—(ক) **সমাঙ্গ বিযুক্তদল** (Regular Polypetalous), ইহা তিন প্রকার—(i) চারিটি পাপড়ি ক্রুসের মত বিপরীতভাবে সজ্জিত থাকিলে তাহাকে **ক্রুসাকার** (Cruciform) বলে। সর্ষপগোত্রীয় উদ্ভিদের এইরূপ হয়, যেমন মূলা, সরিষা প্রভৃতি ; (ii) পাঁচটি অবৃন্তক পাপড়ি থাকিলে



ফুলের বিভিন্ন আকৃতি

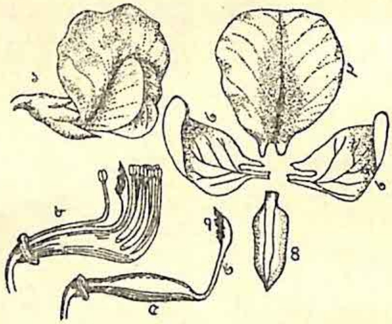
১। ক্রুসাকার—সরিষা ফুল,
২। গোলাপবৎ—গোলাপ ফুল,
৩। লবঙ্গবৎ - পিঙ্ক ফুল,
৪। ঘণ্টাকার—কুমড়া ফুল,
৫। কলকের আকার—ধুতুরাফুল,
৬। চক্রাকার—বেগুন ফুল,
৭। নলাকার—নয়নতারা ফুল,
৮। ওষ্ঠাধরাকৃতি—দ্রোণপুষ্প।

গোলাপবৎ (Rosaceus) বলে, যেমন গোলপ, চা ; (iii) লবঙ্গকার (Caryophyllaceous) পাঁচটি পাপড়ির বৃন্ত দলমণ্ডলের সহিত লম্বভাবে থাকে, যেমন পিঙ্কপুষ্প।

(খ) **সমাঙ্গযুক্তদল** (Regular gamopetalous)

(i) ঘণ্টাকার (Campanulate) ঘণ্টার মত, যেমন কুমড়ার ফুল ; (ii) কলিকাকার (Buliform), দল নীচের দিকে সরু নলের মত, উপর অংশ প্রশস্ত, যেমন ধুতরা, কল্‌মি ; (iii) গোলাকার এবং দলগুলি পলকাটা ইহাদের বলে চক্রাকার (Rotate) ; যেমন বেগুন, শেফালি, আকন্দ প্রভৃতি ; (iv) দল সরু ও লম্বা, যেমন টগর, রঙ্গন, ইহারা নলাকার (Tubular) ;

(গ) **অসমাঙ্গ বিযুক্তদল** (Irregular polypetalous) :—দলগুলির গঠন প্রজাপতি সদৃশ (Papilionaceous)। এইরূপ ফুলে পাঁচটি অসমান পাপড়ি থাকে। পশ্চাৎদিকের পাপড়িটি সর্ব্ববৃহৎ ধ্বজার মত (Standard), তাহার পরে দুইটি পক্ষেরমত (wings) পাপড়ি এবং ভিতরে দুইটি ক্ষুদ্র পাপড়ি ঈষৎ যুক্ত হইয়া নৌকার মত (keel) থাকে। শিম্বিগোত্র উদ্ভিদের উপগোত্র প্যাপিলিওনেসি উদ্ভিদের ফুলের গঠন এইরূপ হয়, যেমন মটর, ছোলা, অপরাজিতা, বক প্রভৃতি।



অসমাঙ্গ বিযুক্তদল—মটর ফুল

১। ফুল,
২। ধ্বজা—Standard
৩। পক্ষ—Wings
৪। নৌকা—Keel
৫। গর্ভাশয়,
৬। গর্ভদণ্ড
৭। গর্ভমুণ্ড
৮। পুংকেশর— ৯টি যুক্ত
১টি বিযুক্ত

(ঘ) **অসমাঙ্গ যুক্তদল** (Irregular gamopetalous)

(i) দলের নলটি ক্ষুদ্র হইয়া উপর দিকে জিহ্বার মত দেখায়। ইহাদের জিহ্বাকার (Ligulate) বলে, যেমন সূর্যমুখীর প্রান্তিক পুষ্পিকা। (ii) ওষ্ঠধরাকৃতি (Labiate) উপরে দুইটি যুক্তপাপড়ি এবং নীচে তিনটি পাপড়ি একত্রে থাকিয়া ফুলটিকে ওষ্ঠের মত দেখায়, যেমন দ্রোণ, বাসক প্রভৃতি।

বৃতি ও দলমণ্ডল পুষ্পের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ, জননাঙ্গকে (পুংকেশর ও গর্ভকেশর) শৈত্য, তাপ, বৃষ্টি হইতে রক্ষা করে এবং বর্ণ ও গন্ধদ্বারা কীট পতঙ্গকে আকৃষ্ট করিয়া পরাগ সংযোগ ঘটায়।

পুংস্তবক (Androecium, andros—male,oikos—house) ইহা পুষ্পের তৃতীয় স্তবক পুং অঙ্গ, ইহাকে পুংকেশর (Stamen) বলে। পুংকেশরের দুইটি অংশ—সরুদণ্ডের মত অংশকে **পুংদণ্ড** (Filament) এবং পুংদণ্ডের মস্তকে অবস্থিত টুপির মত অংশকে বলে **পরাগধানী** (anther)। পরাগধানীর মধ্যে দুইটি অথবা অধিক সংখ্যক কক্ষ থাকে, উহাদের বলে পরাগস্থলী (Pollen sac), উহার মধ্যে অসংখ্য পরাগ রেণু থাকে (Pollen grains)।

পুংদণ্ড ঃ ইহা সাধারণতঃ সরু সুতার মত হইয়া থাকে। পরাগ-ধানীকে ধারণ করা ইহার কাজ। কোন কোন ফুলের পুংদণ্ড থাকে না, তাহাদের অবৃন্তক পরাগধানী বলে। কোন কোন ফুলের পুংদণ্ডের উপর পরাগধানী থাকে না। এই প্রকার পুষ্পকে বলে বন্ধ্যা পুষ্প। ঐপ্রকার পুষ্পকেশরকে বলে বন্ধ্যা পুংকেশর (Staminode)। উচ্ছে, করলা, পেঁপে, বকুল প্রভৃতির কোন কোন ফুল ঐরূপ হয়। পুংদণ্ড-গুলি পৃথক অথবা যুক্ত থাকিতে পারে। আকন্দ ফুলের পুংদণ্ডগুলি যুক্ত হইয়া উপাঙ্গের মত হয়। সাধারণতঃ পুংদণ্ডের শাখা হয় না, কিন্তু রেড়িফুলের পুংদণ্ডের শাখা থাকে। জবা, ঢেঁড়স, কার্পাস প্রভৃতি (Malvacea) ফুলের পুংদণ্ডগুলি মিলিয়া নলের আকার ধারণ করিয়া গর্ভদণ্ডকে আবৃত করিয়া রাখে। মটর, সিম প্রভৃতি ডাল জাতীয় (Papilionaceae) উদ্ভিদের ফুলের একটি পুংদণ্ড পৃথক এবং নয়টি

একত্র সংযুক্ত হইয়া থাকে। সূর্য্যমুখী, গাঁদা প্রভৃতি (Compositae) ফুলের পরাগধানীগুলি সংযুক্ত এবং পুংদণ্ডগুলি পৃথক থাকে।

পরাগধানী : ইহা পুংদণ্ডের উপরে থাকে। পুংকেশরের ইহা অত্যাবশ্যকীয় অংশ। ইহা গোল অথবা চ্যাপটা আকারের হইতে পারে। সাধারণ ফুলে ইহার দুইটি খণ্ড থাকে। খণ্ড দুইটি একটি কলা (Tissue) দ্বারা সংযুক্ত থাকে। ইহাকে **যোজক** (Connective) বলে। প্রত্যেক খণ্ডে দুইটি কক্ষ থকে উহাদের বলে পরাগস্থলী (Pollen sacs) ইহাদের মধ্যে পরাগরেণু থাকে। পুংকেশর পরিপুষ্ট হইলে পরাগধানী ফাটিয়া যায় এবং রেণু বাহির হইয়া পড়ে।

স্ত্রীস্তবক (Gynaecium) বা গর্ভকেশর (Pistil)

Gyne = female

ইহা ফুলের ভিতরের অংশ, চতুর্থস্তবক। ইহা স্ত্রী অঙ্গ, ইহাকে গর্ভকেশর (Pistil) বলে। গর্ভকেশর গর্ভপত্র (Carpel) দ্বারা গঠিত। পাতা রূপান্তরিত হইয়া গর্ভপত্রে পরিণত হয়। ইহা ফুলের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অঙ্গ। গর্ভপত্রের তিনটি অংশ—(ক) ডিম্বাশয় (ovary), ইহা সর্ব্বনিম্নে অবস্থিত, আকারে মোটা ও ফাঁপা ;

(খ) গর্ভদণ্ড (style) ডিম্বাশয়ের অগ্রভাগ একটি দণ্ডের আকারে পরিণত হয়, ইহাকে গর্ভদণ্ড বলে ;

(গ) গর্ভমুণ্ড (stigma) গর্ভদণ্ডের মাথার অংশকে গর্ভমুণ্ড বলে।

গর্ভকেশরে একটি অথবা একাধিক গর্ভপত্র থাকিতে পারে। একটি গর্ভপত্র থাকিলে **একগর্ভপত্রী** (Monocarpellary) বলে যেমন, মটর, সিম প্রভৃতি শিম্বি গোত্রীয় ফুলে থাকে। একটির অধিক গর্ভপত্রদ্বারা গঠিত হইলে **বহুগর্ভপত্রী** (Pollycarpellary) বলে, যেমন কার্পাস, ঢেঁড়স, জবা প্রভৃতি (Malvacae) এবং আতা, নোনা প্রভৃতি (anonacae) ফুলে থাকে। গর্ভপত্রগুলি পৃথক অথবা পরস্পর যুক্ত থাকিতে পারে। পৃথক পৃথক থাকিলে **মুক্তগর্ভপত্রী** (Apocarpous) বলে, যেমন আতা, চাঁপা, গোলাপ, পদ্ম প্রভৃতি

ফুলে। পরস্পর সংযুক্ত থাকিলে **যুক্তগর্ভপত্রী** (Synocarpous) বলে, যেমন সরিষা, বেগুন, কুমড়া প্রভৃতি। ইহাদের গর্ভপত্রগুলি সংযুক্ত হইয়া একটিমাত্র গর্ভাশয় ও গর্ভদণ্ড গঠন করে। ইহাদের গর্ভাশয় এককোষ্ঠ (unilocular) যেমন পেঁপে, দ্বিকোষ্ঠ (bilocular) যেমন বেগুন, ত্রিকোষ্ঠ (trilocular) যেমন শতমূলী, অথবা বহুকোষ্ঠ (multilocular) যেমন ঢেঁড়সে হইয়া থাকে।

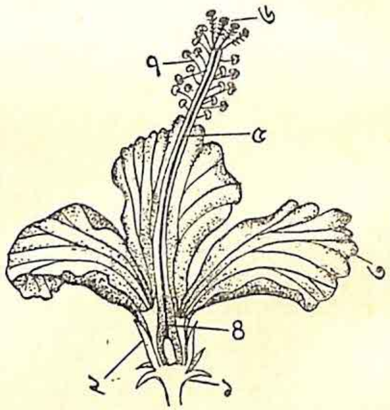
- গর্ভকেশর
  - একগর্ভপত্রী
  - বহুগর্ভপত্রী
    - মুক্তগর্ভপত্রী
    - যুক্তগর্ভপত্রী
      - এককোষ্ঠ
      - দ্বিকোষ্ঠ
      - ত্রিকোষ্ঠ
      - বহুকোষ্ঠ

ডিম্বাশয়ঃ গর্ভপত্রের সর্ব্বনিম্ন স্ফীত অংশকে ডিম্বাশয় বলে। ইহা পুষ্পপত্রের নীচে থাকিলে **অধোগর্ভ** (inferior বা epigynous) যেমন শশা, কুমড়া, সূর্য-মুখী, রজনীগন্ধার থাকে, এবং উপরে থাকিলে **অধিগর্ভ** (superior বা hypogynous) বলে, সরিষা, বেগুন, ধুতুরা ও জবায় থাকে। ডিম্বাশয়ের চারিপার্শ্বে পুষ্পপত্রগুলি থাকিলে বলে পার্শ্বগর্ভ (perigynous) যেমন মটর, বক এবং গোলাপ। ডিম্বা-শয়ের মধ্যে একটি বা একাধিক



কুমড়া ফুলের অধোগর্ভ Epigynous

ডিম্বক (ovule) থাকে। ডিম্বক বীজে এবং গর্ভাশয় ফলে পরিণত হয়। মুক্তগর্ভপত্রী গর্ভকেশরে যতগুলি গর্ভপত্র থাকে ততগুলি ফল হয় এবং যুক্তগর্ভপত্রী গর্ভকেশরে গর্ভপত্রগুলি মিলিত হইয়া একটি গর্ভাশয় গঠন করে বলিয়া একটি মাত্র ফল হয়। ডিম্বকত্বকে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে তাহাকে ডিম্বক-রন্ধ্র micropyle বলে। ঐ রন্ধ্রের মধ্য দিয়া পরাগরেণু ডিম্বকের মধ্যে প্রবেশ করে এবং উহাদের সংযোগ ঘটে। ডিম্বকরন্ধ্র বীজে থাকিয়া যায়। বীজের অঙ্কুরোদ্গম কালে ভ্রূণমূল উহার মধ্য দিয়া বাহির হয়। ডিম্বক গর্ভাশয়ের যে স্থানে যুক্ত থাকে তাহাকে বলে ডিম্বকনাভী (Hilum)। বীজের গায়ে উহার চিহ্ন দেখা যায়।



জবাফুলের অধিগর্ভ hypogynous

১। উপবৃতি ৪। গর্ভাশয়
২। বৃতি ৫। গর্ভদণ্ড
৩। দল ৬। গর্ভমুণ্ড
৭। সূত্র।

গর্ভদণ্ড :—গর্ভাশয়ের অগ্রভাগ একটি ফাঁপা নলের আকারে পরিণত হয়। গর্ভমুণ্ড ও গর্ভাশয় এই দণ্ডদ্বারা যুক্ত থাকে। এই দণ্ডটিকে বলে গর্ভদণ্ড। গর্ভদণ্ড দীর্ঘ অথবা হ্রস্ব হইতে পারে। উহার গাত্র মসৃণ অথবা লোমশ হইতে পারে। কলাফুলের গর্ভদণ্ড প্রশস্ত ও বর্ণময় হয়, এই প্রকার গর্ভদণ্ডকে Petaloid বলে। সচরাচর গর্ভাধানের পর গর্ভদণ্ড শুকাইয়া ঝরিয়া যায়।

গর্ভমুণ্ড :—গর্ভকেশরের অগ্রভাগে গর্ভমুণ্ড থাকে। কোন কোন ফুলের গর্ভদণ্ড থাকে না, গর্ভমুণ্ড ডিম্বাশয়ের উপরে অবস্থিত থাকে, যেমন পদ্ম, কাঁটালিচাঁপা। গর্ভমুণ্ড নানা প্রকার হয়—সরল, গ্রন্থিল, চ্যাপটা, লম্বা, তারকা সদৃশ প্রভৃতি। ধান্য গোত্রীয় উদ্ভিদের

গর্ভমুণ্ড লোমশ হয়। যুক্ত গর্ভপত্রী গর্ভকেশরের গর্ভমুণ্ড গর্ভপত্রের সংখ্যানুযায়ী খণ্ডিত হয়। (Solanaceae) বেগুন প্রভৃতি ফুলে দ্বিখণ্ডিত, কুষ্মাণ্ড (Cucurbitacae) ও লিলি (Liliaceae) গোত্র ফুলে ত্রিখণ্ডিত হয়। গর্ভমুণ্ড পরিপুষ্ট হইলে (Receptive) একপ্রকার আঠাল রস নিঃসৃত হয়। গর্ভমুণ্ডের উপর পরাগরেণু পড়িলে উহাতে আটকাইয়া যায়।

বিভিন্ন প্রকার ফুল:—বৃতি, দল, পুংকেশর ও গর্ভকেশর এই চারিটি অঙ্গ একই ফুলে থাকিলে তাহাকে পূর্ণাঙ্গ পুষ্প (Complete or Hermaphrodite flower) বলে, যেমন জবা, মটর প্রভৃতি।

অসম্পূর্ণ (Incomplete flower)

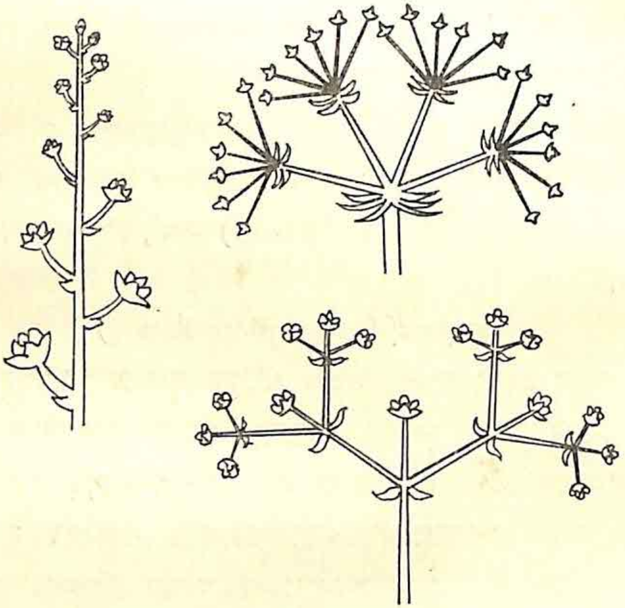
যে কোন একটি অঙ্গের অভাব ঘটিলে তাহাকে অসম্পূর্ণ পুষ্প বলে, যেমন লাউ, কুমড়া। অসম্পূর্ণ পুষ্পের যেগুলিতে কেবল পুংকেশর থাকে গর্ভকেশর থাকে না তাহাদের **পুং পুষ্প** (Staminate) বলে। যেগুলিতে কেবল মাত্র গর্ভকেশর থাকে সেগুলিকে **স্ত্রী পুষ্প** (Pistillate) বলে। যে পুষ্পে পুংকেশর অথবা গর্ভকেশর কোনটিই থাকে না তাহাকে বন্ধ্যা বা ক্লীব পুষ্প (Neuter or sterile flower) বলে।

লাউ, কুমড়া ভুট্টা প্রভৃতি একই গাছে পুং ও স্ত্রী পুষ্প পৃথক হয় ইহাদের **সহবাসী** (Monoecious) উদ্ভিদ বলে। তালগাছে পুং পুষ্প ও স্ত্রী পুষ্প ভিন্ন গাছে হয়, ইহাদের **ভিন্নবাসী** (Dioecious) উদ্ভিদ বলে। উচ্ছে, আম, পেঁপে প্রভৃতির একই গাছে পুং, স্ত্রী ও ক্লীব পুষ্প ধরিতে দেখা যায় ইহাদের বলে **মিশ্রবাসী** (Polygamous)।

মঞ্জরী (Inflorescence)

কোন কোন উদ্ভিদের অনেকগুলি ফুল একটি বিশেষ দণ্ডের উপর ফোটে। এই প্রকার পুষ্পিত দণ্ডটিকে মঞ্জরী (Inflorescence)

বলে। পাতার কক্ষ মুকুল অথবা গাছের শীর্ষ মুকুল হইতে মঞ্জরী জন্মে। মঞ্জরী দণ্ডটির উপর পুষ্প বিন্যাস প্রধানতঃ দুই প্রকার হয়—(১) **অনিয়ত** (Racemose or Indefinite), (২) **নিয়ত** (Cymose or Definite)।



বিভিন্ন প্রকার মঞ্জরী

১। অনিয়ত—Raceme, ২। নিয়ত—Cyme, ৩। শাখান্বিত নিয়ত

অনিয়ত পুষ্প বিন্যাসে মঞ্জরী দণ্ডের শীর্ষে প্রথমে ফুল থাকে না, দণ্ডের গায়ে নীচের দিক হইতে ক্রমশঃ উপরের দিকে ফুল ফুটিতে থাকে। সুতরাং মঞ্জরী দণ্ডটি বৃদ্ধি পাইয়া যায়। নিয়ত পুষ্প বিন্যাসে মঞ্জরী-দণ্ডটির শীর্ষে প্রথমে ফুল ফোটে এবং ঐ ফুলটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ আকারের হইয়া থাকে এবং দণ্ডের বৃদ্ধি রহিত হইয়া যায়। পার্শ্বদেশে পরে ফুল ফোটে। ফুলগুলি সবৃন্তক অথবা অবৃন্তক হইতে পারে। মঞ্জরী দণ্ড সরল অথবা শাখান্বিত হইতে পারে।

পরাগ সংযোগ (Pollination)

পরাগধানী পরিপুষ্ট হইলে ফাটিয়া যায় এবং পরাগরেণু ছড়াইয়া

পড়ে। গর্ভমুণ্ডের উপর পরাগ পড়িলে পরাগ সংযোগ (Pollination) ঘটে। ফুলের নিজের পরাগ গর্ভমুণ্ডে পড়িতে পারে কিম্বা ভিন্ন ফুলের পরাগ আসিয়া পরাগ সংযোগ ঘটাইতে পারে। গর্ভমুণ্ড পরিপুষ্ট (Receptive) হইলে উহা হইতে আঠার মত যে রস নির্গত হয় পরাগ তাহাতে লাগিয়া যায় এবং বীজের অঙ্কুরোদ্গমের মত পরাগের অঙ্কুরোদ্গম হয়। পরাগ সংযোগের পর পুংকেশর মরিয়া যায়, দল ও বৃতি সাধারণতঃ খসিয়া পড়ে। পরাগ সংযোগ (ক) বায়ু, (খ) কীটপতঙ্গ, (গ) পশুপক্ষী ও (ঙ) জল দ্বারা ঘটিয়া থাকে।

(ক) যাহাদের বায়ুদ্বারা পরাগ সংযোগ হয় তাহাদের **বায়ুপরাগী** (Anemophilous) বলে। ইহাদের ফুল ক্ষুদ্র হয়, ফুলে গন্ধ, বর্ণ বা মিষ্টরস থাকে না। পরাগধানী সর্ব্বমুখী হইয়া ফুলের বাহিরের দিকে থাকে। ইহাদের রেণু সূক্ষ্ম, হাল্‌কা, মসৃণ এবং প্রচুর পরিমাণে হয়। সামান্য বাতাস লাগিলে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাদের গর্ভদণ্ড লম্বা এবং গর্ভমুণ্ড শাখান্বিত হইয়া ফুলের বাহিরের দিকে থাকে। অর্থাৎ পরাগ ধরিবার পক্ষে অনুকূল হইয়া থাকে। ধান, ঘাস, ভুট্টা, তাল প্রভৃতি বায়ুপরাগী।

(খ) কীটপতঙ্গদ্বারা যাহাদের পরাগ সংযোগ হয় তাহাদের **পতঙ্গপরাগী** (Entomophilous) বলে। ইহাদের আকৃতি বড় এবং উজ্জ্বল বর্ণ ও গন্ধময় হয় এবং ইহাদের মধ্যে প্রায়ই মিষ্টরস (Nectar) থাকে। ইহাদের গর্ভদণ্ড ক্ষুদ্র এবং ফুলের অভ্যন্তরে থাকে। গর্ভমুণ্ড আঠাল অথবা কাঁটাযুক্ত হয়। ফুলের মিষ্টরস আহরণকালে কীটপতঙ্গের অঙ্গে পরাগ লাগিয়া যায়, অন্য ফুলে যাইলে উহাদের দেহলগ্ন পরাগ সেই ফুলের গর্ভমুণ্ডে লাগিয়া যায়। গোলাপ, জবা, ঢেঁড়স, কার্পাস, আলু, আফিং, মটর, সূর্য্যমুখী প্রভৃতি পতঙ্গ পরাগী।

(গ) পশুপক্ষীদ্বারা যাহাদের পরাগ সংযোগ ঘটে তাহাদের বলে **প্রাণিপরাগী** (Zoophilous)। খুব কমই ফুলের এই প্রকারে

পরাগ সংযোগ হয়। মাদার, কৃষ্ণচূড়া, শিমুল, কদম্ব প্রভৃতি বৃক্ষের ফুলের পরাগ সংযোগ কাক, শালিক প্রভৃতি পাখী, কাঠবিড়াল, বাদুড় প্রভৃতি জন্তুদ্বারা হইয়া থাকে, ওল, কচু প্রভৃতির শামুকদ্বারা হয়।

(ঘ) জলের সাহায্যে যাহাদের পরাগ সংযোগ হয় তাহাদের বলে **জলপরাগী** (Hydrophilous)। ইহাদেরও সংখ্যা কম। জলজ উদ্ভিদের মধ্যে যাহারা জলের মধ্যে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত থাকে তাহাদের পরাগ স্রোতের জলে ভাসিয়া আসিয়া দীর্ঘ দণ্ডযুক্ত গর্ভমুণ্ডে লাগিয়া যায়। পাতা শেওলা, ঝাঁঝি প্রভৃতির ফুলে এইরূপ পরাগ সংযোগ হয়।

উদ্ভিদের ইতর পরাগ সংযোগই (Cross pollination) কাম্য, স্বপরাগ সংযোগ (Self pollination) বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ তাহাতে বংশ দুর্ব্বল হয় এবং নানা অবনতি দেখা দেয়। ইতর পরাগ সংযোগে ফল ও বীজের উন্নতি হয়। গর্ভমুণ্ডে নিজের পরাগ এবং ভিন্ন ফুলের পরাগ অর্থাৎ উভয় প্রকার পরাগ পড়িলে নিজ ফুলের পরাগের অঙ্কুরোদ্গম হয় না, উহা মরিয়া যায়। ইতর পরাগ যোগ ঘটাইবার উদ্দেশ্যে উদ্ভিদ নানা কৌশল অবলম্বন করে, যেমন—

(ক) **একলিঙ্গতা** (Unisexuality or Dicliny) পুংকেশর ও গর্ভকেশর পৃথক ফুলে থাকে, যেমন লাউ, কুমড়া।

(খ) **বিষম পরিণতি** (Dichogamy) পরাগধানী ও গর্ভমুণ্ডের পরিপুষ্টি কালের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান থাকে। সূর্য্যমুখী, জবা, বেগুন, সরিষা, কার্পাস প্রভৃতি।

(গ) **স্বসঙ্গমরোধী** (Herkogamy) কোন কোন উভলিঙ্গ ফুল গঠন বৈচিত্র্যদ্বারা স্বপরাগ সংযোগের প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে, যেমন ঘেঁটু, আকান্দ, অর্কিড প্রভৃতি।

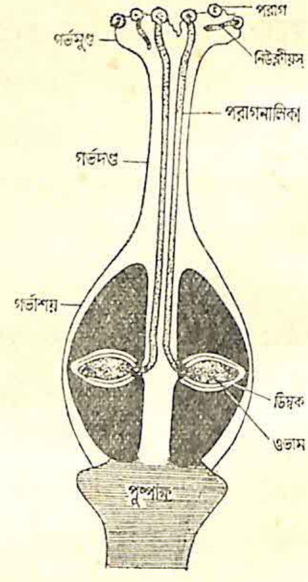
(ঘ) **স্ববন্ধ্যত্ব** (Self sterility) অর্কিড ফুলের পরাগ নিজ ফুলের গর্ভমুণ্ডে পড়িলে উহা হইতে বীজ উৎপন্ন হয় না। ইহাকে স্ববন্ধ্যত্ব বলে।

(ঙ) **অসম পুংদণ্ড** (Heterostyly) একই গাছের বিভিন্ন ফুলের ভিন্ন দৈর্ঘ্যের পুংদণ্ড হয়, যেমন আমরুল, কামরাঙ্গা।

গর্ভাধান Fertilization

পরিপুষ্ট গর্ভমুণ্ডের উপর পরাগরেণু পতিত হইলে গর্ভমুণ্ডের রসে আটকাইয়া যায়। পরাগরেণু গর্ভমুণ্ডের রস শোষণ করিয়া বৃদ্ধি পায় এবং উহা হইতে একটি সূক্ষ্ম নালিকা (Pollen tube) উৎপন্ন হয়। ইহাকে পরাগরেণুর অঙ্কুরোদগাম বলে। পরাগ নালিকা গর্ভমুণ্ড ও গর্ভদণ্ড ভেদ করিয়া ডিম্বাশয়ের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ঐ নলিকার মধ্যে তুইটি নিউক্লীয়াস থাকে। নলিকার নিম্নমুখে যে বড় নিউক্লীয়াসটি থাকে তাহাকে বলে নালী নিউক্লীয়াস (Tube nucleus) এবং উহার পশ্চাদে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আর একটি নিউক্লীয়াস থাকে তাহাকে বলে জনন নিউক্লীয়াস (Generative nucleus)। **জনন** নিউক্লীয়াসটি বিভক্ত হইয়া তুইটি পুংজনন কোষে (male gametes) পরিণত হয় এবং নালী নিউক্লীয়াস ক্রমে ভাঙ্গিয়া (disorganised) যায়। নলিকাটি ডিম্বাশয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডিম্বকের গাত্রে যে সূক্ষ্ম রন্ধ্র (micropyle) থাকে তাহার মধ্য দিয়া ডিম্বকের ভিতরে প্রবেশ করিয়া ভ্রূণাস্থলীর (embryo sac) মধ্যে উপনীত হয়। একটি পুংজননকোষ ডিম্বাণুর (egg cell) সহিত মিলিত হয়, অপরটি ভ্রূণস্থলীর প্রান্তভাগে ডেফিনিটিভ নামক নিউক্লীয়াসের (Difinitive nucleus) সহিত মিলিত হইয় সস্য নিউক্লীয়াসে (Endosperm nucleus) পরিণত হয়। ডিম্বাণুর সহিত পুংজননকোষের এইরূপ মিলনকে গর্ভাধান বা নিষেক (fertilization) বলে। গর্ভাধানের পর ডিম্বাণুর (egg cell) চারিদিকে কোষ প্রাচীর উৎপন্ন হয়, তখন উহাকে উস্পোর (Oospore) বলে। উস্পোর ভ্রূণে (embryo), ডিম্বক বীজে, ডেফিনিটিভ নিউক্লীয়াস সস্যে এবং সমুদয় গর্ভাশয় ফলে পরিণত হয়। প্রতিটি ডিম্বকের সহিত একটি পরাগের সংযোগ হওয়া চাই, সুতরাং গর্ভমুণ্ডে অনেকগুলি পরাগ পড়া প্রয়োজন।

কোন কারণে গর্ভাধান না ঘটিলে গর্ভাশয় শুকাইয়া ঝরিয়া যায়। গর্ভাধানের পর ফুলের বিভিন্ন অংশগুলি শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া যায়, এবং ডিম্বাশয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কোন কোন উদ্ভিদের বৃতি যেমন, চাল্‌তার অথবা পুষ্পাধার যেমন আপেলের বৃদ্ধি পাইয়া ফল গঠন করিয়া থাকে। কোন কোন উদ্ভিদের বীজের ডিম্বকনাভী অথবা অথবা ডিম্বকরন্ধ্র হইতে উপবৃদ্ধি (out growth) জন্মে। উপবৃদ্ধি বীজকে সম্পূর্ণ ঢাকিয়া রাখিলে তাহাকে এরিল (aril) বলে, যেমন লিচু ও আঁশফলের শাঁস, আংশিক ঢাকিয়া রাখিলে বলে ক্যারঙ্কল (Caruncle), যেমন রেড়ির বীজে থাকে।



গর্ভাধান

ফুলের কার্য্যঃ ফুলের কার্য্য বংশবিস্তার করা। এই উদ্দেশ্যে ইহার বহিরাঙ্গগুলি—মঞ্জরীপত্র, উপবৃতি, বৃতি, দল প্রভৃতি জননাঙ্গগুলিকে—পুংকেশর ও গর্ভকেশর—হিম, তাপ, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টি প্রভৃতি হইতে রক্ষা করে এবং বর্ণ, গন্ধ, মিষ্টরস প্রভৃতি ধারণ করিয়া কীট-পতঙ্গাদিকে আকৃষ্ট করিয়া এবং নানা গঠন-বৈচিত্র্য দ্বারা পরাগ সংযোগ ঘটায়। গর্ভাধান সম্পন্ন হইলে ফুলের ঐসকল অঙ্গের কার্য্য সমাপ্তি হয়, উহাদের আর আবশ্যকতা থাকে না সুতরাং উহারা মরিয়া যায়।

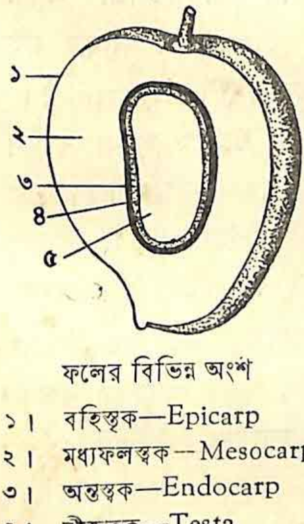
ষষ্ঠ অধ্যায়

ফল ও বীজ বিস্তার

(Fruits and dispersal of Seeds)

পরিপুষ্ট গর্ভাশয়কে বলে ফল। ফলের দুইটি অংশ—ফলত্বক ও বীজ। ফলের আবরণকে বলে ফলত্বক (Pericarp, peri-around, karpos—fruit)। ইহা গর্ভাশয়ের ত্বকের পরিণতি এবং ডিম্বকের সহিত পরাগের মিলনে বীজের উৎপত্তি। ফলের ভিতরে একটি অথবা একাধিক বীজ থাকে। শুষ্কফলে (Dry fruits) ফলত্বক খুব পাত্‌লা থাকে কিন্তু শাঁসাল ফলে তিনটি স্তর লক্ষ্য করা যায় ঃ

(ক) **বহিস্ত্বক** (Epicarp or Exocarp) ইহা ফলের খোসা (Skin) ; (খ) **মধ্যফলস্ত্বক** (Mesocarp), ইহা খোসার নীচে থাকে এবং সাধারণতঃ শাঁসাল ও রসাল ফলে থাকে, যেমন আম ; কোন কোন ফলে ইহা শুষ্ক যেমন নারিকেলের ছোবড়া ; (গ) **অন্তফলস্ত্বক** (Endocarp) ফলত্বকের সর্ব্ব ভিতরের অংশ। ইহা লেবুতে পাত্‌লা ঝিল্লিবৎ, আমের আঁটিতে অত্যন্ত কঠিন।



ফলের বিভিন্ন অংশ

১। বহিস্ত্বক—Epicarp
২। মধ্যফলস্ত্বক—Mesocarp
৩। অন্তস্ত্বক—Endocarp
৪। বীজত্বক—Testa
৫। বীজপত্র—Cotyledon

প্রকৃত ও অপ্রকৃত ফল (True and false fruits)

ফল দুই রকম হয়—**প্রকৃত** (True fruit) ও **অপ্রকৃত** (Spurious or false fruit) একটিমাত্র ফুলের অধিগর্ভ ডিম্বাশয় (Sup-

erior gynaecium) ফলে পরিণত হইলে তাহাকে প্রকৃত ফল বলে, যেমন আম।

অপ্রকৃত ফলের উৎপত্তি তিন প্রকারে হইয়া থাকে—(ক) একটি ফুলের অধোগর্ভ ডিম্বাশয় হইতে, যেমন কুমড়া, শসা প্রভৃতি; (খ) একটি সম্পূর্ণ মঞ্জরী হইতে একটি ফলের উৎপত্তি যেমন ডুমুর, আনারস, কাঁঠাল প্রভৃতি অথবা (গ) ফুলের অন্যান্য অংশের সহিত সংযুক্ত হইয়া ফলে পরিণতি, যেমন চালতায় বৃতি বৃদ্ধি পাইয়া ফলের রূপধারণ করে, আপেল, নাসপাতি প্রভৃতির পুষ্পাক্ষ বৃদ্ধি পাইয়া ফলে পরিণত হয়।

ফলের প্রকার (Different kinds of fruit)

ফল নানা প্রকার হয় :—

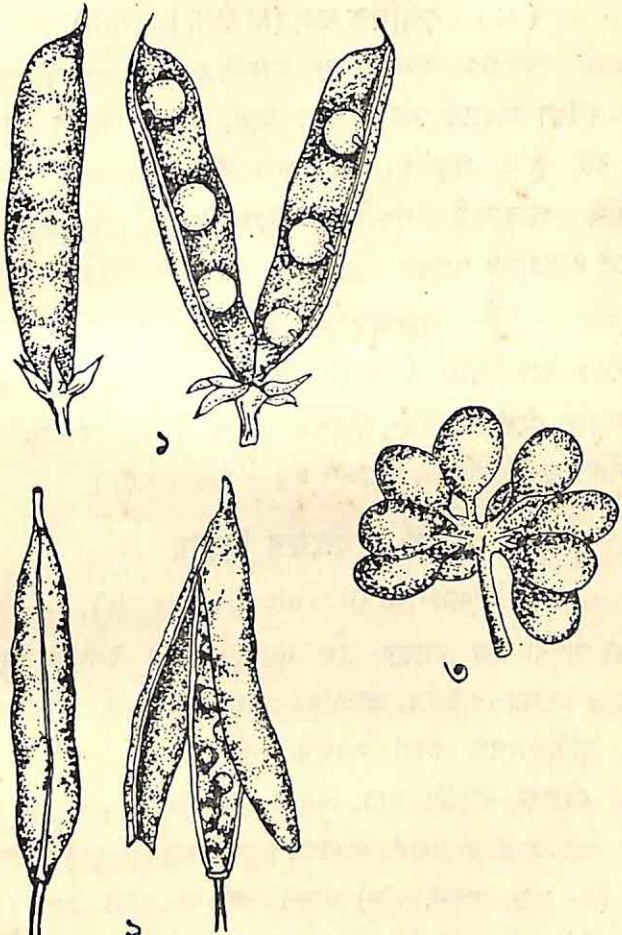
(ক) **একক ফল** (Simple fruit) এই প্রকার ফল একটিমাত্র ফুলের ডিম্বাশয় হইতে জন্মে। ডিম্বাশয় একগর্ভপত্রী অথবা একাধিক গর্ভপত্র একত্র যুক্ত হইতে পারে। একক ফল আবার দুই প্রকার—(i) নীরস (Dry fruits) (ii) রসাল (Fleshy fruits)।

(i) নীরস ফলের খোসা শুষ্ক, ঝিল্লিবৎ, চর্ম্মবৎ অথবা কাষ্ঠল হইতে পারে। মটর প্রভৃতি ডাল জাতীয় ফলের একসারি বীজ থাকে। খোসা শুকাইলে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া বীজ ছড়াইয়া পড়ে। ইহাদের বলে **নীরস স্ফোটক** (Dehiscent fruit)। সরিষা, মূলা প্রভৃতি ফল পাকিলে ফলত্বক নীচে হইতে উপরের দিকে ফাটিয়া যায়, ইহাদের বলে সিলিকুয়া (Siliqua)। ধান, যব, গম, ভুট্টা প্রভৃতির শস্য বা দানা উহাদের ফল। ইহারা **নীরস অস্ফোটক** (Indehiscent fruit)। ইহাদের বীজত্বক ও ফলত্বক সংযুক্ত থাকে, উহাদের পৃথক করা যায় না। ইহাদের বলে কেরিঅপ্‌সিস্ (Caryopsis)।

(ii) **রসাল ফল** : রসাল ফলের ত্বক বেশ মোটা হয়, ফাটে না। ত্বক পচিলে বীজ বাহির হয়। টোম্যাটো, বেগুন, আঙ্গুর, পেঁপে, কলা, পিয়ারা, টেঁপারি, খেজুর প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত, ইহাদের বলে **বেরি** (Berry)।

(খ) গুচ্ছিত ফল (Aggregate fruits)

একটি ফুলের পৃথক, পৃথক বহু গর্ভপত্র হইতে ফল উৎপন্ন হইলে তাহাকে গুচ্ছিত ফল বলা হয়। এই প্রকার ফলে



১। মটর—নীরস স্ফোটক—Dehiscent
২। সরিষা - সিলিকুয়া—Siliqua
৩। দেবদারুর গুচ্ছিত ফল।

প্রত্যেকটি গর্ভপত্রের ডিম্বাশয় হইতে একটি করিয়া ফল জন্মে এবং সবগুলি ফল পুষ্পাধারের উপরে গুচ্ছাকারে থাকে। আতার মধ্যে

বহু বীজ থাকে এবং প্রত্যেক বীজের বাহিরে শাঁস থাকে। ইহার গর্ভ-পত্রগুলির অগ্রভাগ মিলিত হইয়া একটি ফলত্বক গঠন করে। ইহা একপ্রকার গুচ্ছিত ফল।

(গ) **যৌগিক ফল** (Multiple fruit)

একটি মঞ্জরীর সবগুলি ফুল মিলিত হইয়া একটিমাত্র ফলে পরিণত হইলে তাহাকে যৌগিক ফল বলে, যেমন কাঁঠাল, আনারস, ডুমুর, বট, তুঁত প্রভৃতি। কাঁঠালের কাঁটাগুলি এবং আনারসের চোখগুলি প্রত্যেকটি পুষ্পপুট হইতে উৎপন্ন। মঞ্জরীদণ্ড ফলের মধ্যস্থলে দণ্ডের মত থাকে।

ফলের প্রধান কাজ

ফলের মধ্যে বীজ থাকে। বীজের অপরিণত অবস্থায় ফল বীজকে রক্ষা করে এবং বীজ পরিপক্ক হইলে উহার বিস্তারে সাহায্য করে, যাহাতে উদ্ভিদের বংশ রক্ষিত হয় ও বিস্তার ঘটে।

ফল ও বীজের বিস্তার

(Dispersal of fruits and seeds)

ফল অথবা বীজ গাছের ঠিক নীচে পড়িলে উপযুক্ত আলোক, বাতাস ও জলের অভাবে তাহাদের অঙ্কুরোদ্গম ও বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। অধিকাংশই চারা অবস্থায় নিস্তেজ হইয়া অকালে মরিয়া যায়। এইজন্য বীজের দূরে বিস্তার প্রয়োজন। ফল ও বীজের বিস্তার প্রকৃতিতে সর্ব্বদাই নানারূপে ঘটিতেছে। (ক) বায়ু, (খ) জল, (গ) পশু, পক্ষী, (ঘ) মানুষ প্রভৃতি দ্বারা এবং (ঙ) ফল স্বয়ং বিদীর্ণ হইয়া বীজের বিস্তার সাধন করিতেছে। (ক) **বায়ুর সাহায্যে** যেসব ফল ও বীজ বিস্তারিত হয় তাহারা সাধারণতঃ খুব ছোট ও হাল্কা হইয়া থাকে। বায়ুতে ভাসিয়া যাইবার নানা কৌশলও বীজে থাকে। অর্কিডের বীজ খুব সূক্ষ্ম সহজেই বাতাসে উড়িয়া যায়। শিয়াল কাঁটার ফল পাকিলে উহার উপরের দিক

আংশিক ফাটিয়া যায়, বাতাস বহিলে কিছু বীজ ফল হইতে বাহির হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। বহু ফলের বীজে আঁশ অথবা ডানা থাকে, উহাদের সাহায্যে বাতাসে উড়িয়া যায়। শিমুল, কার্পাস, আকন্দ, কাশ প্রভৃতির বীজে আঁশ থাকে। কুকসিমে পাক্‌না থাকে। সজিনা, কনকচাঁপা প্রভৃতির বীজত্বক চ্যাপ্‌টা হইয়া পাখ্‌নার মত হয়। মাধবীলতা ও দেশী বাদামের ফলত্বক চ্যাপটা হয়। শাল ফলে বৃতি স্থায়ী হইয়া পাখ্‌নার কাজ করে।

(খ) **জলদ্বারা** ঃ নদী ও সমুদ্রতীরবর্ত্তী উদ্ভিদ এবং জলজ উদ্ভিদের ফল ও বীজের বিস্তার সাধারণতঃ জলস্রোতের দ্বারা হয়। ঐসকল উদ্ভিদের ফলত্বক জলরোধক হয় উহারা জলে ভাসিয়া যায়। নারিকেল, গোলপাতা, শালুক, পদ্ম প্রভৃতির ফল জলস্রোতে দূরদূরান্তরে ছড়াইয়া পড়ে।

(গ) **জীবজন্তু দ্বারা** যে সকল বীজ ও ফলের বিস্তার হয় তাহাদের গায়ে আটকাইবার নানা প্রকার কৌশল থাকে, কিম্বা তাহারা রসাল, বর্ণময় ও সুমিষ্ট হয়। বহু শুষ্ক ফল ও বীজে কাঁটা, অঙ্কুশ, অথবা আঠালগ্রন্থী থাকে। মানুষের পরিচ্ছেদে, জীবজন্তুর লোমে আটকাইয়া যায় এবং দূরে স্থানান্তরিত হয়। চোরকাঁটা, অপাং প্রভৃতির ফলে কাঁটা থাকে। বনওকড়া, বাঘনখ প্রভৃতির ফলে আটাল গ্রন্থী থাকে।

রসাল ফলে উজ্জ্বল রং, মিষ্ট গন্ধ ও স্বাদ থাকে। জীবজন্তু, পাখী, মানুষ উহার শাঁস খাইয়া যত্রতত্র বীজ নিক্ষেপ করে। বহু পক্ষী বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, পেয়ারা ফল খায় কিন্তু উহাদের বীজ হজম করিতে পারে না। মলের সহিত বীজগুলি অবিকৃত অবস্থায় বাহির হয়। যেখানে উহারা মলত্যাগ করে সেই স্থানে ঐসব বীজ হইতে গাছ জন্মে।

(ঘ) **মানুষের দ্বারা** ঃ দেশ দেশান্তরে মানুষ নানাপ্রকার বীজ ও উদ্ভিদ লইয়া যায়। লিচু চীন হইতে, নারিকেল ককাস দ্বীপ হইতে,

শীতকালীন বহুপ্রকার শাকসব্জি ইউরোপ হইতে, নানাপ্রকার ফলমূল পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে মানুষ ভারতবর্ষে আনিয়াছে।

(ঙ) ফলের বিদারণে বীজের বিস্তার
(Explosive fruits)

বহু ফলের ত্বক ফাটিয়া বীজ সজোরে নিক্ষিপ্ত হয়। দোপাটি, আমরুল প্রভৃতির ফল স্পর্শ করিলেই ফাটিয়া যায় ও উহাদের মধ্যস্থ বীজ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। চট্‌পটে, কুলেখাড়া প্রভৃতির ফলে জল লাগিলেই ফাটিয়া যায়। অপরাজিতার ফল পাকিলে উহাদের দুইপ্রান্ত ফাটিয়া যায় এবং ফলত্বক ক্রমশঃ উপরের দিকে গুটাইয়া যায় ও বীজ ছড়াইয়া পড়ে। ধুন্দুলের ফল গাছ হইতে খসিয়া পড়িলে বীজগুলি মাথার গর্ত্তরের মধ্য দিয়া নিক্ষিপ্ত হয়।

সপ্তম অধ্যায়

ভুট্টার জন্মবৃত্তান্ত

(Life history of maize or Indian corn)

ভুট্টার দানা আকারে আয়তপ্রায়, চ্যাপটা অথবা গোলাকৃতি হয়। বর্ণ সোনালী, শ্বেত, অথবা লাল হয়। ভুট্টার দানা বীজ নহে ফল।

বীজের আবরণ—বাহিরের সোনালী বর্ণের শক্ত পাতলা খোসা ফলটিকে সম্পূর্ণ আবৃত করিয়া আছে। বীজত্বক ও ফলত্বক সংযুক্ত হইয়া ঐ আবরণ গঠিত হইয়াছে।

ভ্রূণ—দানাটির এক পার্শ্বে একটি অর্দ্ধস্বচ্ছ (opaque) শ্বেত অংশ রহিয়াছে, উহাকে বলে Deltoid area। উহার মধ্যে ভ্রূণ নিহিত রহিয়াছে। দানার অবশিষ্ট অংশ ভ্রূণের খাদ্য। ইহাকে সস্য (Endosperm) বলে। ভুট্টার বীজ সস্যল (endospermic)। Deltoid area ও সস্যের মধ্যে একটি ঢালের মত পর্দ্দা উহাদের পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। ঐ পর্দ্দাটি বীজপত্র। উহাকে স্কুটেলাম (Scutellum) বলে। উহার সাহায্যে ভ্রূণ সস্য হইতে খাদ্য শোষণ করে। একটি বীজপত্র ও ভ্রূণাক্ষ মিলিয়া ভ্রূণ গঠিত। সুতরাং ভুট্টা একবীজপত্রী উদ্ভিদ। Deltoid area মধ্যে স্কুটেলামের উপরের অংশ কলিওপ্‌টাইল ভ্রূণ মুকুলকে এবং নীচের অংশ কলিওরহিজা ভ্রূণমূলকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে।

অঙ্কুরোদ্গম ও মূল—অঙ্কুরোদ্গমকালে ভ্রূণমূল কলিওরিজা ও ত্বক ভেদ করিয়া মৃত্তিকার ভিতরে প্রবেশ করে, কিন্তু অল্পকালের মধ্যে উহা মরিয়া যায়—এবং কাণ্ডের গোড়া হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অস্থানিক গুচ্ছমূল (fibrous roots) বাহির হয়। ইতোমধ্যে বীজপত্রাধিকাণ্ড (Epicotyl) বৃদ্ধি পায় এবং ভ্রূণমুকুল কলিঅপ্‌টাইল

দ্বারা বেষ্টিত হইয়া ত্বক ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসে এবং কিছুকাল পরে কলিঅপ্টাইল বিদীর্ণ করিয়া বাড়িয়া যায় এবং উহা হইতে পাতা বাহির হয়। বীজপত্র মৃত্তিকার ভিতর থাকিয়া যায়। ইহার অঙ্কুরোদ্গম মৃদবর্ত্তী (Hypogeal)।

কাণ্ডের গোড়ার প্রথম দুই, তিনটি পর্ব্বসন্ধি হইতে অস্থানিক ঠেসমূল (Prop roots) বাহির হইয়া গাছটিকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখে। কাণ্ডের কিছু উপরের পর্ব্বসন্ধি হইতে ছোট, ছোট অস্থানিক মূল বাহির হয় কিন্তু ঐগুলি শীঘ্র মরিয়া শুকাইয়া যায়।

কাণ্ড—দীর্ঘ, গোলাকার, পিথ্পূর্ণ নিরেট ও কঠিন, পর্ব্ব দীর্ঘ, পর্ব্বসন্ধি সুস্পষ্ট।

পাতা—পত্র একক, পত্রবিন্যাস একান্তর, পত্রমূল প্রশস্ত হইয়া কাণ্ডকে বেষ্টন করিয়া থাকে, পত্রমূল ও পত্র ফলকের সংযোগ স্থলে লিগিউল (Ligule) আছে। পত্রফলক দীর্ঘ বল্লমাকার (Lanceolate), ফলকের বিপরীত দিক বিদীর্ণ, শিরাবিন্যাস সমান্তরাল।

মঞ্জরী ও ফুল– সহবাসী উদ্ভিদ (monoecious plant)। দুই প্রকার মঞ্জরী—(১) কাণ্ডের শীর্ষে একটি শাখান্বিত মঞ্জরী থাকে, উহাতে কেবলমাত্র পুং পুষ্প (Staminate) হয়। মঞ্জরীদণ্ড হইতে অনেকগুলি জোড়া অণুমঞ্জরী (Spikelets) বাহির হয়। অণু মঞ্জরীগুলির গোড়ায় দুইটি করিয়া অনুর্ব্বর গ্লুম থাকে। অণুমঞ্জরীর প্রত্যেক শাখায় দুইটি করিয়া ফুল ধরে একটি সবৃন্তক অপরটি অবৃন্তক। একটি গ্লুম ও একটি পালিয়া দ্বারা ফুল আবৃত থাকে। পুংকেশর তিনটি, পরাগধানী দীর্ঘ এবং ঝুলিয়া থাকে।

(২) কাণ্ডের মাঝামাঝি অংশের পাতার কক্ষ হইতে স্ত্রী পুষ্পের (Pistillate) মঞ্জরী বাহির হয়। কাণ্ডে এই প্রকার মঞ্জরী এক বা একাধিক জন্মে। মঞ্জরী দণ্ড স্থূল ও মাংসল (fleshy) ইহাকে Cob বলে। বহু মঞ্জরীপত্র (Bracts) দ্বারা মঞ্জরী আবৃত। এই

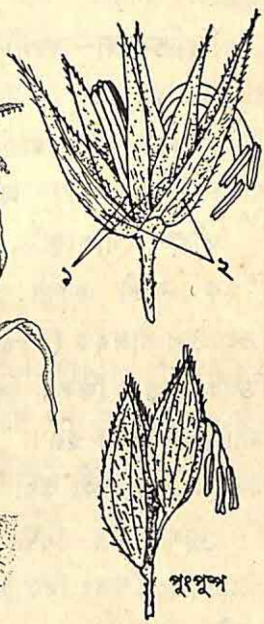
প্রকার মঞ্জরীপত্রকে স্পেদ (Spathe) বলে। স্থূল মঞ্জরী দণ্ডের উপর বহু অণুমঞ্জরী সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত থাকে। প্রতি অণুমঞ্জরীতে দুইটি করিয়া পুষ্প থাকে। অণুমঞ্জরীর গোড়ায় দুইটি অনুর্ব্বর গ্লুম থাকে। পুষ্প দুইটির একটি বন্ধ্যা (Sterile) অপরটি উর্ব্বর (fertile)। প্রত্যেক ফুল একটি গ্লুম ও একটি পালিয়া দ্বারা আবৃত



ভুট্টার স্ত্রীপুষ্প, মঞ্জরীদণ্ড ও ফল



ভুট্টা গাছ



উন্মুক্ত পুংপুষ্প
১-২—গ্লুম ও পালিয়া

এবং দুইটি লডিকিউল থাকে। কেবল উর্ব্বর ফুলে গর্ভাশয়, গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুণ্ড থাকে। গর্ভাশয় এক কোষ উহাতে একটি মাত্র ডিম্বক থাকে। প্রতি ফুলে একটি অতি দীর্ঘগর্ভদণ্ড থাকে, গর্ভমুণ্ড পালক-সদৃশ (feathery)। গর্ভদণ্ডগুলি লম্বা চুলের গুচ্ছের মত মঞ্জরী পত্র ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসে।

পরাগ সংযোগ—সাধারণতঃ ইতরপরাগী (Cross pollinated) সময়, সময় স্বপরাগ সংযোগ হয়। পরাগ সংযোগ বায়ুদ্বারা ঘটে, বায়ুপরাগী (wind pollinated)

ফল—পরিপুষ্ট গর্ভাশয়ের বহিস্ত্বক বীজত্বকের সহিত দৃঢ় সংযুক্ত, এইজন্য দানাগুলি ফল বলিয়া পরিগণিত হয়। মঞ্জরী দণ্ডের উপর এইরূপ বহু ফল হয়। ফল নীরস, অস্ফোটক, ক্যারিঅপ্ সিস্ (Caryopsis)

স্থিতিকাল—বর্ষজীবী, বর্ষা ঋতুতে জন্মিয়া ফলদান অন্তে বর্ষাশেষে মরিয়া যায়।

গোত্র—ধান্য গোত্রীয় উদ্ভিদ (Gramineae)।

মটরের জীবন বৃত্তান্ত

বীজ—গোলাকৃতি, বাহিরের শ্বেতবর্ণের খোসাটি বীজত্বক। ডিম্বক নাভী একটা সুস্পষ্ট দাগের মত দেখা যায়। বীজ জলে ভিজাইলে বীজত্বক (Testa) সহজে উঠিয়া আসে এবং মৃদু চাপ দিলে ডিম্বক রন্ধ্রের ভিতর দিয়া সামান্য জল বাহির হয়, ভ্রূণমূল উহার মধ্য দিয়া নির্গত হয়। বহিস্ত্বক অপসারণ করিলে খুব পাতলা ছালের মত অন্তস্ত্বক লক্ষ্য করা যায়।

ভ্রূণ—ইহা দ্বিবীজপত্রী বীজ (Dicoty-ledonous seed)। বীজপত্রের ভিতর দিক চ্যাপটা, বাহিরের দিকে গোল। স্থূলবীজপত্র দুইটির মধ্যে ভ্রূণের খাদ্য রহিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র দণ্ডের সহিত বীজপত্র যুক্ত রহিয়াছে। ঐ দণ্ডটি ভ্রূণাক্ষ (axis of the embryo)। ভ্রূণাক্ষ ও দল দুইটি মিলিয়া ভ্রূণ। ভ্রূণাক্ষের নিম্নাংশ বাঁকিয়া ডিম্বকরন্ধ্রের অভিমুখে রহিয়াছে। উহা ভ্রূণমূল (Radicle)। ভ্রূণাক্ষের উপরের অংশ ভ্রূণ মুকুল (Plumule)।

অঙ্কুরোদ্গম—প্রথমে বীজপত্রাধিকাণ্ডের বৃদ্ধি হয়। এই সময় উহা বাঁকা থাকে, পরে সোজা হয় এবং ভ্রূণ মুকুল মাটির উপরে উঠিয়া আসে। বীজপত্র মাটির ভিতরে থাকিয়া যায়, বাহিরে আসে

না। অঙ্কুরোদ্গম মৃদবর্ত্তী (Hypogeal)। ভ্রূণমূল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া প্রধান মূলে (Primary root) পরিণত হয়। মাটির মধ্যে উহা লম্বভাবে প্রবেশ করে। ইহাকে লম্বমূল (Tap root) বলে। ইহা হইতে ক্রমে শাখা মূল (Branch roots) বাহির হয়। কিছুকালের মধ্যে একপ্রকার ব্যাক্‌টিরিয়া দ্বারা মূল আক্রান্ত হয় এবং মূলের গায়ে ছোট ছোট অর্বুদ (nodules) উৎপন্ন হয়। ব্যাক্‌টিরিয়াগুলি অর্বুদের মধ্যে বাস করে এবং বায়ু হইতে মুক্ত নাইট্রোজেন শোষণ করিয়া মটর লতাকে নাইট্রেট সরবরাহ করে এবং মটর লতার দেহ হইতে শ্বেতসার আহরণ করে। এইরূপে পারস্পরিক খাদ্য আদান প্রদান চলিতে থাকে। উহাদের অন্যোন্যজীবী (Symbiotic living bacteria) বলে। শিম্বিগোত্রীয় সকল উদ্ভিদের মূলে এইরূপ অর্বুদ জন্মে।

কাণ্ড—গোল, ফাঁপা, নরম, লতান।

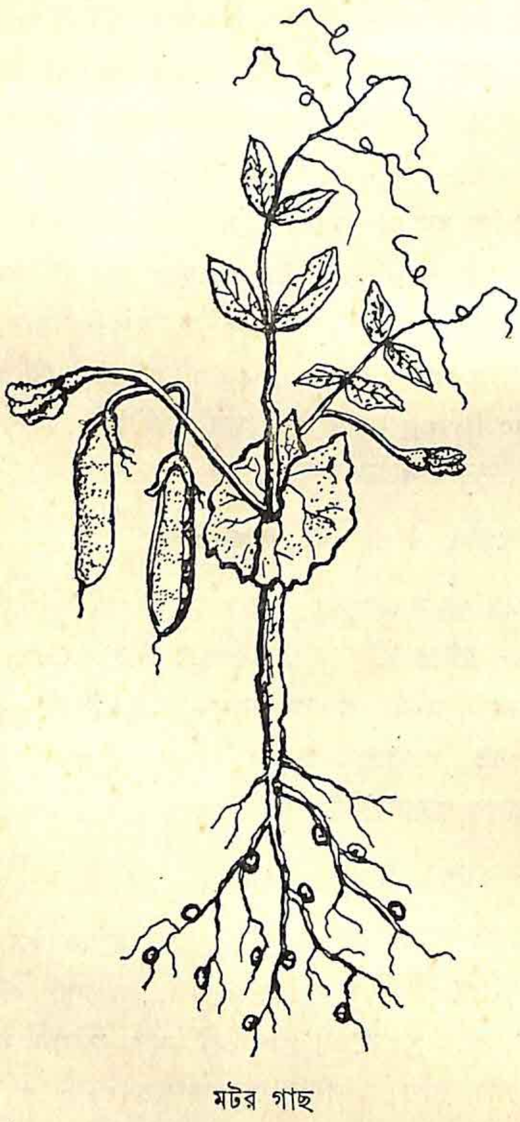
পত্র—পত্রবিন্যাস একান্তর, পত্র-পক্ষল যৌগ (Pinnately compound), এক হইতে তিন জোড়া অনুপত্র, শীর্ষ অনুপত্র এবং অগ্রভাগের একজোড়া অথবা অধিক সংখ্যক অনুপত্র রূপান্তরিত হইয়া আকর্ষে পরিণত, পত্রবৃন্তের মূলের উভয় পার্শ্বে দুইটি অভিমুখী সবুজবর্ণের প্রশস্ত পত্রাকার উপপত্র রহিয়াছে।

মঞ্জরী—কাক্ষিক অনিয়ত (Raceme)

ফুল—শ্বেত অথবা রঙ্গীন, বৃতি ফাঁপা নলের মত, উপরিভাগ পাঁচটি খণ্ডে খণ্ডিত, উভলিঙ্গ, পূর্ণাঙ্গ, সবৃন্তক, অসমাঙ্গ পাঁচটি বিযুক্তদল বিশিষ্ট পুষ্প। পশ্চাতের পাপড়িটি বৃহৎ ধ্বজার মত (Standard), পার্শ্বের পাপ্‌ড়ি দুইটি অপেক্ষাকৃত ছোট ও পক্ষের মত (Wings), চতুর্থ ও পঞ্চম পাপ্‌ড়ি সামান্য যুক্ত হইয়া নৌকার মত হইয়া ভিতরে অবস্থিত।

পুংদণ্ড গুচ্ছিত—নয়টি পুংদণ্ড সংযুক্ত হইয়া নলের মত গর্ভ-

কেশরকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে, দশমটি পৃথক, গর্ভকেশরের উপরে অবস্থিত। গর্ভপত্র একটি, ডিম্বাশয় এককোষী, বহু ডিম্বকযুক্ত।



মটর গাছ

পক্ষল যৌগপত্র, পত্রাকার প্রশস্ত উপপত্র, অনুপত্র আকর্ষে পরিণত, মূল অর্বুদযুক্ত, ফল—শুঁটি।

পরাগ সংযোগ—স্বপরাগী, সময় সময় ইতরপরাগ যোগও হয়।

ফল—শুঁটি (Pod), একক, নীরস, স্ফোটক (dehiscent), পাকিলে শুঁটির দুই সন্ধি ফাটিয়া বীজ ছড়াইয়া পড়ে।

স্থিতিকাল—বীরুৎ, বর্ষজীবী, শীতকালীন রবি ফসল।

গোত্র—শিম্বি গোত্রের (Leguminoseae) উপগোত্র প্যাপিলিওনিয়োসির (Papilionaceae) অন্তর্গত।

অষ্টম অধ্যায়

কলাস্থান—(Histology)

কোষ—(Cell)

উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহ এক বা একাধিক কোষ (Cell) দ্বারা গঠিত। প্রাণী অথবা উদ্ভিদ সকলেরই প্রথম জীবনে একটিমাত্র কোষ থাকে। চির জীবন ধরিয়া যদি উহার একটি কোষ থাকে তবে উহাকে এককোষী (Unicellular) বলে। যদি ক্রমশঃ নূতন নূতন কোষ সৃষ্টি হইয়া অনেকগুলি কোষ যুক্ত হয় তাহা হইলে উহাকে বহুকোষী (Multicellulor) বলে। নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদেরাই এককোষী হয়, যেমন ঈষ্ট, ব্যাক্‌টিরিয়া প্রভৃতি। উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদ বহুকোষী। নিম্নশ্রেণীর বহুকোষী উদ্ভিদের দেহে একই প্রকার কতকগুলি কোষ থাকে এবং উহারা প্রায় একই রকম কাজ করে। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদকে নানাবিধ কার্য্য করিতে হয় বলিয়া উহাদের কোষ বিভিন্ন প্রকারের হয়। উহারা নানাভাবে সংযুক্ত হইয়া বহু প্রকার কার্য্য করে। এক বা বিভিন্ন প্রকারের কোষ সংযুক্ত হইয়া একইরূপ কার্য্য করিলে এবং উহাদের উৎপত্তি স্থান এক হইলে উহাদের কলা (Tissue) বলা হয়। কলার কোষগুলি এরূপভাবে মিলিত থাকে যে উহাদের মধ্যে কোন ফাঁক থাকে না।

উদ্ভিদের যে কোন অংশের একটি পাতলা ছেদ (Section) লইয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করিলে বহু পরস্পর সংযুক্ত গোলাকার বা বহুভুজ ক্ষেত্র বিশিষ্ট মৌমাছির চাকের প্রকোষ্ঠের মত প্রকোষ্ঠ দেখা যায়। এই প্রকোষ্ঠগুলি এক একটি কোষ। পরীক্ষা করিলে দেখা যায় উহার চারিদিকে একটি বেষ্টনী প্রাচীরের মত রহিয়াছে। ইহাকে **কোষ প্রাচীর** (cell wall) বলে। ভিতরের স্থানটি অর্দ্ধস্বচ্ছ

আঠাল পদার্থে পরিপূর্ণ, উহাকে প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm) বলে। Proto অর্থাৎ প্রথম (first) Plasma অর্থাৎ আকৃতি, (form)। প্রটোপ্লাজমের মধ্যে একটি ঘন গোলাকার বা বৃত্তাকার পদার্থ নিহিত রহিয়াছে, ইহাকে **নিউক্লিয়াস্** (Nucleus) বলে। প্রটোপ্লাস্‌মই কোষের প্রাণ পদার্থ। প্রটোপ্লাস্‌ম ও নিউক্লিয়াস্‌কে একত্রে বলা হয় **প্রটোপ্লাস্ট্** (Protoplast) প্রাণময় পদার্থ। কোষকে আকৃতি ও দৃঢ়তা প্রদানের জন্য প্রটোপ্লাস্‌ম হইতেই কোষ প্রাচীর উৎপন্ন হয়। জনন কোষের প্রাচীর থাকে না। ঐপ্রকার কোষকে **নগ্নকোষ** (Naked cell) বলে। কোষ প্রাচীর নিষ্প্রাণ। ইহা কোষের অত্যাবশ্যকীয় অংশ নহে, প্রটোপ্লাস্ট্‌ই কোষের অত্যাবশ্যকীয় অংশ, উহাই কোষের প্রাণ (Physical basis of life)। উদ্ভিদের সকল কার্য্য ইহা দ্বারাই সম্পাদিত হয়। কোষ হইতে প্রটোপ্লাস্ট অদৃশ্য হইলে কোষটি মরিয়া যায়, তখন উহাকে **মৃতকোষ** (Dead cell) বলে।

প্রটোপ্লাজম্

ভৌতধর্ম্ম—ইহা অৰ্দ্ধস্বচ্ছ জেলীর ন্যায় চট্‌চটে পদার্থ (Jelly like semifluid substance)। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণার মত দেখায় এবং জলে সম্পৃক্ত থাকে। জলের পরিমাণ অনুযায়ী ইহার ঘনত্ব নির্ভর করে। অতি সজীব প্রটোপ্লাজমে জলের পরিমাণ ৭০—৯০% এমন কি বেশীও থাকে। জল অপসারিত হইলে ইহার জৈবনিক কার্য্য ক্ষমতা চলিয়া যায় এবং ক্রমশঃ কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

রাসায়নিক ধর্ম্ম—প্রটোপ্লাজম অতি জটিল পদার্থ। মৃত প্রটোপ্লাজমের উপাদান সজীব প্রটোপ্লাজমের উপাদান হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিশ্লেষণকালে উহা মরিয়া যায় বলিয়া সজীব প্রটোপ্লাজমের সঠিক উপাদান জানিবার উপায় নাই। শ্বেতসার, প্রোটিন, স্নেহপদার্থ এবং অজৈব লবণ দ্বারা ইহা গঠিত। ইহাতে C, H, O, N, S, P

প্রভৃতি মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়। প্রটোপ্লাজমে প্রোটিন—৪০—৬০%, স্নেহপদার্থ ১২—১৪%এবং শ্বেতসার ১২—১৪% পাওয়া যায়। C_a, M_g, K, F_e, N_a প্রভৃতির লবণ থাকে ৫—৭% এবং Z_n, M_n, Al, B, Cu, প্রভৃতির লবণের লেশ (Traces) পাওয়া যায়।

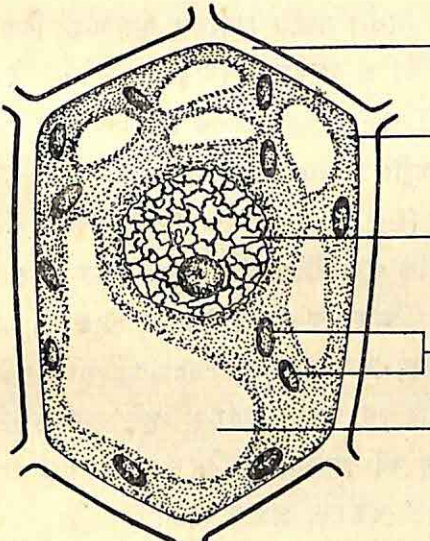
প্রটোপ্লাজন কখন স্থির থাকে না, সর্ব্বদাই চঞ্চল। প্রাণের যাবতীয় কার্য্য—বৃদ্ধি (growth), পোষণ (nutrition), খাদ্য প্রস্তুতি (Food manufacture), শ্বাসকার্য্য (respiration), প্রজনন (reproduction) প্রভৃতি সম্পাদন করে। পোষণ, বৃদ্ধি, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রস্তুতি, বিভিন্ন শক্তির বিনিময়, উত্তেজিত্ব প্রভৃতি সজীব পদার্থের বৈশিষ্ট্য সবই প্রটোপ্লাজমে পরিলক্ষিত হয়। কোষ মধ্যে যেসকল পদার্থ প্রবেশ করে তাহাদের সম্মিলিত করিয়া স্ববস্তু অর্থাৎ নূতন প্রাটোপ্লাজম্ গঠন করে এবং অপ্রয়োজনীয় পদার্থ বর্জ্জন করে। জনন সংক্রান্ত যাবতীয় কর্ম্ম উহা দ্বারা নিষ্পন্ন হয়।

পরীক্ষা—আয়ডিন দ্রবণ সংযোগে ইহা ঈষৎ 'পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করে। তাপ প্রয়োগে ঘনীভূত হয়।

প্রটোপ্লাজমের মধ্যে সর্ব্বাধিক ঘন অংশ নিউক্লিয়াস্ ব্যতীত যে সব স্বল্প ঘন অংশ থাকে তাহাদের **প্লাস্টিড্** (Plastids) বলে। প্লাস্টিড্ নানা প্রকার ও নানা বর্ণ বিশিষ্ট হয়। প্রটোপ্লাজমের এই দুইটি ঘন অংশ ব্যতীত যে স্বচ্ছ অংশ আছে তাহাকে **সাইটোপ্লাজম** (Cytoplasm) বলে। ইহা কোষের সম্পুর্ণ স্থান অধিকার করিয়া থাকে না। উহার মধ্যে বহু গর্ত্তের মত ফাঁকা স্থান (Cavity) থাকে ঐগুলিকে **ভ্যাকুওল** বলে। ভ্যাকুওলের মধ্যে **কোষরস** (Cell sap) নামক তরল পদার্থ থাকে। প্রোটোপ্লাজম উদ্ভিদের প্রাণ পদার্থ (essential living material), কোষের মধ্যে প্রটোপ্লাজমীয় বস্তু সমষ্টিকে প্রটোপ্লাস্ট বলে।

প্রটোপ্লাস্টে থাকে—(ক) নিউক্লিয়স্ (খ) প্লাষ্টিডস্, (গ) সাইটোপ্লাজম্।

(ক) **নিউক্লিয়স**—প্রটোপ্লাজমের ঘনতম বিশিষ্ট অংশ নিউ-ক্লিয়াস্। নীল-হরিৎ শৈবাল ও ব্যাক্‌টিরিয়া ব্যতীত সকল উদ্ভিদের কোষে নিউক্লিয়াস্ থাকে। সচরাচর প্রতিটি কোষে একটি নিউ-ক্লিয়াস থাকে। নিউক্লিয়াস সাধারণতঃ গোলাকার বা উপবৃত্তাকার, কখন কখন লম্বা অথবা অর্দ্ধ চন্দ্রাকার হয়। আয়তনও ভিন্ন ভিন্ন হয়। একবীজপত্রী উদ্ভিদের কোষে সর্ব্বাধিক বড় এবং ছত্রাকের কোষে অতি ক্ষুদ্র হয়। নিউক্লিয়াস সাধারণতঃ কোষের কেন্দ্র স্থানে থাকে।



কোষ

রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা যায় ইহার উপাদান প্রটোপ্লাজমেরই মত। ইহাতে C, H, O, N, S এবং যথেষ্ট পরিমাণ P প্রভৃতি মৌলিক পদার্থ থাকে। নিউক্লিন্ (Nuclein) নামক নিউক্লিয়ো-প্রোটিন সর্ব্বদাই থাকে এবং অন্যান্য প্রকার প্রোটিন ও থাকে।

নিউক্লিয়াসের কার্য্য (Functions)

প্রোটোপ্লাস্টের যাবতীয় কার্য্য নিউক্লিয়াস নিয়ন্ত্রণ করে। কোষের

বৃদ্ধি এবং কোষ বিভক্ত কালে নিউক্লিয়াস্ প্রত্যক্ষ শক্তি প্রয়োগ করে। ইহাই জীব ও উদ্ভিদের বংশগত ধর্ম্মের বাহক।

(খ) **প্লাসটিড**—ইহারা নিউক্লিয়াসের চারিদিকে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে নিহিত থাকে। ছত্রাক্, ব্যাক্‌টিরিয়া, নীলাভ হরিৎ শৈবাল ব্যতীত অন্যান্য সকল উদ্ভিদের কোষে প্লাস্‌টিডস্ থাকে। তরুণ কোষে ইহারা বর্ণহীন। কোষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিউক্লিয়াস হইতে ইহারা দূরে চলিয়া যায় এবং নানাবিধ বর্ণ ধারণ করে। উদ্ভিদ কোষে বহু কণিকাকার প্লাস্‌ডিস্ থাকে। প্লাস্‌টিড কখনও নূতন করিয়া সৃষ্টি হয় না। সকল সময়ে পূর্ব্বতন প্লাস্‌টিড বিভক্ত হইয়া নূতন প্লাস্‌টিড হয়। বর্ণ ও কার্য্য অনুযায়ী প্লাস্‌টিড্ তিন প্রকার হয়—অবর্ণ প্লাস্‌টিড (Leucoplast), সবুজ প্লাস্‌টিড (Chloroplast) এবং অন্যান্য বর্ণের প্লাস্‌টিড (Chromoplast)।

অবর্ণ প্লাস্‌টিড (Leucoplast)ঃ ইহারা বর্ণহীন। উদ্ভিদের যে সকল অংশ আলোক পায় না, যেমন মূল, মৃদ্গদ কাণ্ড প্রভৃতির কোষে ইহারা থাকে। আলোক সংস্পর্শে ইহার সবুজ বর্ণ ধারণ করিয়া ক্লোরোপ্লাষ্টে পরিণত হয়, যেমন আলুতে সচরাচর দেখা যায়। লিউকো-প্লাষ্টিড্‌গুলি দুই প্রকার হয়, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ। ক্ষুদ্র প্লাষ্টিডগুলি ক্রমশঃ বড় হইয়া যায় অথবা বর্ণ প্লাস্টিডে পরিণত হয়। বড় প্লাস্টিডগুলি অন্ধকারে শর্করা হইতে শ্বেতসার প্রস্তুত করে।

সবুজ প্লাস্টিড (Chloroplast—chloros—green)ঃ ইহারা কোষের সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্ত থাকে। গাছের যে সকল অংশ আলোক পায়, ইহারা কেবল সেই সকল স্থানের কোষে থাকে। ইহাদের কার্য দুইপ্রকার (১) ক্লোরোফিল ও সূর্য্যালোকের সাহায্যে বায়ুর কার্ব্বনডাইঅক্সাইড ও জলের সহযোগে অদ্রবনীয় শ্বেতসার প্রস্তুত করে এবং দ্রবনীয় শর্করাকে শ্বেতসারে পরিণত করে।

বর্ণ প্লাস্টিড (Chromoplast—chromo—colour)ঃ ইহারা সাধারণতঃ হরিৎ ও লাল পুষ্পপত্রের কোষে অথবা নারঙ্গ ও লাল

ফলত্বকের কোষে থাকে। কখন কখন মূলেও থাকে, যেমন গাজরে। ক্লোরোপ্লাষ্ট হইতে ক্রোমোপ্লাষ্ট উৎপন্ন হয়। ইহারা ফুল ও ফলে বর্ণ দান করে তাহার ফলে কীট পতঙ্গাদি আকৃষ্ট হইয়া ফুলে পরাগ সংযোগ ঘটায় এবং ফল ও বীজের বিস্তার সাধনে সহায়তা করে।

(গ) **সাইটোপ্লাজম ও ভ্যাকুওল** (Cytoplasm and Vacuole)

কোষমধ্যে নিউক্লীয়াস্ এবং প্লাষ্টিড ব্যতীত যে স্বচ্ছ বর্ণহীন পদার্থ থাকে তাহা সাইটোপ্লাজম। প্রটোপ্লাজমের অধিকাংশ ভাগ সাইটোপ্লাজম্। কোষ বৃদ্ধি পাইলে সাইটোপ্লাজম্ নূতন করিয়া সৃষ্ট হয় না, এই জন্য উহার মধ্যে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাঁক উৎপন্ন হয়। ঐ ফাঁকগুলিকে বলে ভ্যাকুওল। ভ্যাকুওলগুলি অবশেষে কোষের কেন্দ্রস্থলে মিলিত হইয়া বড় ভ্যাকুওলে পরিণত হয়। ইহার ভিতরের স্থান শূন্য থাকে না, কোষরস দ্বারা পূর্ণ থাকে।

- কোষ
  - কোষ প্রাচীর
  - প্রোটোপ্লাজম
    - নিউক্লিয়াস
    - প্ল্যাসটিড
      - অবর্ণ (Leucoplast)
      - সবুজ বর্ণ (Chloroplast)
      - অন্যান্য বর্ণ (Chormoplast)
    - সাইটোপ্লাজম

কোষমধ্যে অন্যান্য পদার্থ

প্রাণময় প্রোটপ্লাজম ব্যতীত কোষের মধ্যে কতকগুলি প্রাণহীন পদার্থ থাকে। ইহারা কোষরসে তরল অবস্থায় এবং সাইটোপ্লাজমের মধ্যে কঠিন অবস্থায় বিক্ষিপ্ত থাকে। ইহারা **সঞ্চিতখাদ্য** (Reserve food) অথবা **বর্জ্যপদার্থ** (Waste products)রূপে কোষের মধ্যে থাকে।

সঞ্চিত খাদ্য : পরিপোষণকালে প্রোটোপ্লাজম দ্বারা যে সব পদার্থ প্রস্তুত হয় সেইগুলির প্রয়োজন মিটিবার পর উদ্বৃত্ত অংশ ভবিষ্যতের জন্য কোষের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। এইগুলি কার্ব্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এবং স্নেহ ও তৈল (fats and oils)।

কার্ব্বোহাইড্রেট—দুইপ্রকার—শ্বেতসার (Starch) ও শর্করা (Sugar)। শ্বেতসার জল অথবা কোহলে অদ্রবণীয়, লঘু আয়োডিন সংযোগে নীলবর্ণ হয়। ইহারা উদ্ভিদ দেহের সর্ব্বত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার আকারে থাকে, বিশেষ করিয়া কন্দের মধ্যে প্রচুর থাকে, যেমন আলুতে। ধান, গম, যব, ভুট্টা প্রভৃতি শস্যে এবং সাবুগাছের মজ্জার (pith) মধ্যে প্রচুর পরিমাণে থাকে। সাবুগাছের মজ্জা হইতে উহা নিষ্কাশন করিয়া সাবুদানা (globules) প্রস্তুত করা হয়।

তরল অবস্থায় কার্ব্বোহাড্রেটকে শর্করা বলে। শর্করা কয়েকপ্রকার হয়, যেমন দ্রাক্ষাশর্করা (glucose or grape sugar $C_6 H_{12} O_6$), ইক্ষুশর্করা (Sucrose or Cane sugar $C_{12} H_{22} O_{11}$)। অনেক প্রকার ফলের রসে Dextrose এবং Levulose শর্করা থাকে, মধুতেও ইহারা থাকে। আখের মধ্যে sucrose ১৫—২০%, বিটে ১০—২০% থাকে। আঙ্গুরে glucose ১২—১৫% এবং অধিক ও থাকে। যবের অঙ্কুরোদ্গমের কালে Maltose or Malt sugar থাকে।

প্রোটিন—নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস্‌, সাল্‌ফার, কার্ব্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন প্রভৃতির সংযোগে প্রোটিন উৎপন্ন হয়। উহাদের কঠিন অবস্থাকে প্রোটিন এবং তরল অবস্থাকে অ্যামাইড (amide) বলে। যে সকল বীজের মধ্যে কার্ব্বোহাইড্রেট্‌ অল্প এবং তৈল অধিক থাকে তাহাদের মধ্যে অধিক পরিমাণে প্রোটিন থাকে। মটর, ছোলা প্রভৃতি ডালে প্রোটিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার মত থাকে। এইজন্য ডাল পুষ্টিকর খাদ্য। ধান, ভুট্টা. গম, যব প্রভৃতির দানার বীজত্বকের নীচের কোষগুলির মধ্যে যে প্রোটিন সঞ্চিত থাকে তাহাদের aleurone

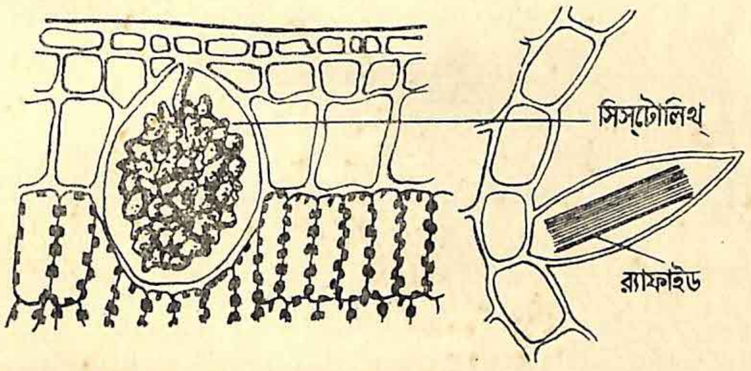
grains বলে। কলে ছাঁটা চাউল এবং ময়দায় উহারা চলিয়া যায়। ঢেঁকি ছাঁটা চাউল এবং আটায় aleurone grains থাকিয়া যায় বলিয়া ঢেঁকি ছাঁটা চাউল এবং লাল আটা পুষ্টিকর খাদ্য।

স্নেহ ও তৈল (Fats and oils)

ইহারাও একপ্রকার কার্ব্বোহাইড্রেট। ইহাদের উপাদান ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারিন্। বীজের মধ্যে ইহারা সাধারণতঃ থাকে। এই প্রকার বীজে কার্ব্বোহাইড্রেটর পরিমাণ খুব কম হয়। ইহারা সাইটো-প্লাজমের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুরূপে ভাসমান থাকে।

বর্জ্য পদার্থ (Waste products)

যে সকল পদার্থ উদ্ভিদের দেহগঠন বা খাদ্য হিসাবে প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় পদার্থ, সেইগুলি কোষের এক পার্শ্বে



অথবা মৃতকোষের মধ্যে জমা থাকে, কারণ প্রাণীর মত উদ্ভিদ উহাদের দেহ হইতে পরিত্যাগ করিতে পারে না। ইহারা সাধারণতঃ খনিজ কেলাস (inorganic crystals)। এই কেলাস দুই প্রকার হয়, ক্যালসিয়াম অক্জালেট (Calcium oxylate) কেলাস, ইহাদের বলে র‍্যাফাইড (Raphide) এবং ক্যালসিয়াম কার্ব্বনেট (Calcium carbonate) কেলাস, ইহাদের বলে (Cystolith) সিষ্টোলিথ্। ওল, কচু প্রভৃতির মধ্যে ক্যালসিয়াম অক্জালেট্ সূক্ষ্ম সূচের মত

কেলাস রূপে থাকে। ঐগুলি মুখে বা দেহ চর্ম্মে লাগিলে প্রদাহ হয়। রবার, বট প্রভৃতির পাতার কোষে ক্যাল্‌সিয়াম কার্ব্বোনেটের কেলাস ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র দানার আকারে দ্রাক্ষাগুচ্ছের মত বিলম্বিত থাকে।

কোষ প্রাচীর (Cell wall)—প্রটোপ্লাট উৎপন্ন হইবামাত্র প্রটোপ্লাজমের কর্ম্মতৎপরতায় কোষের চারিদিকে সেলুলোজ নিঃসৃত হইয়া কোষ প্রাচীর গঠিত হয়। প্রথমাবস্থায় ইহা পাতলা, স্থিতিস্থাপক, স্বচ্ছ, বর্ণহীন থাকে। ইহাতে জলীয় ভাগ ও থাকে। কোষ প্রাচীর জল ও গ্যাসীয় দ্রবণ দ্বারা ভেদ্য। ইহা কোষকে দৃঢ় রাখে, কোষের আকৃতি গঠন করে এবং বাহিরের আঘাত হইতে কোষকে রক্ষা করে। ছত্রাক ব্যতীত সকল উদ্ভিদের কোষ প্রাচীর সেলুলোজ $(C_6H_{10}O_5)n$ শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ দ্বারা গঠিত।

তৃতীয় ভাগ

প্রাণিবিদ্যা

Syllabus

Study of external characters, habits and life history of of Earthworm, Cockroach, Mosquito and Fish.

প্রাণিবিদ্যা

বিপুল বিশ্বে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে প্রাণী পরিপূর্ণ। সংখ্যায় তাহারা অগণিত। অধিকাংশই এত ক্ষুদ্র যে মানব চক্ষে দৃষ্ট হয় না। অদৃশ্য প্রাণী অপেক্ষা দৃশ্যমান প্রাণী সংখ্যায় অনেক কম। কতকগুলি বৈলক্ষণ্য অনুযায়ী বিজ্ঞানীরা উহাদের দশটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম নয়টি বিভাগ বা পর্ব্বের অন্তর্গত প্রাণীদের মেরুদণ্ড নাই। দশম বিভাগের মেরুদণ্ড বর্ত্তমান। তদনুযায়ী মুখ্য বিভাগ দুইটি—অমেরুদণ্ডী (Invertebrata) ও মেরুদণ্ডী (Vertebrata)।

কেঁচো (Earthworm)

বাসস্থান ও খাদ্য—কেঁচো প্রাণী বিভাগের ষষ্ঠ পর্ব্ব অ্যানেলিডার (annelida) অন্তর্গত। ইহারা সাধারণতঃ আর্দ্রস্থানে মাটির কয়েক ইঞ্চি নীচে বাস করে। অধিক শীত বা গরমে উপরের মাটি শুকাইয়া যাইলে ভিজা মাটির সন্ধানে ইহারা এমনকি ছয়, সাতফুট নীচে পর্য্যন্ত গর্ত্ত করিয়া চলিয়া যায়। ইহাদের গর্ত্ত আঁকা বাঁকা হয় না। সাধারণতঃ সোজা দেড় ফুট হইতে দুই ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হয়। বর্ষাকাল ব্যতীত দিবাভাগে ইহারা গর্ত্তের বাহিরে সচরাচর আসে না, তবে মাটি ভিজা থাকিলে অনেক সময় আসিয়া থাকে। বর্ষাকালে গর্ত্ত জলে ভরিয়া যাইলে দিবাভাগে উহাদের মাটির উপর বিচরণ করিতে দেখা যায়। রাত্রে আহারের সন্ধানে মাটি ভেদ করিয়া উপরে আসে এবং দিনের আলো প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মাটির ভিতরে চলিয়া যায়। আত্মরক্ষার জন্য উহারা গর্ত্তের মুখ ঘাস, পাতা, ইটের টুকরা প্রভৃতি দিয়া বন্ধ করিয়া রাখে। বর্ষাকালে ইহারা বাসা বদলায়। ইহারা কীটপতঙ্গের মৃতদেহ এবং কচি পাতা খাইতে ভালবাসে। মাটি খাইয়া তাহার জৈবভাগ দেহ মধ্যে রাখিয়া মাটির

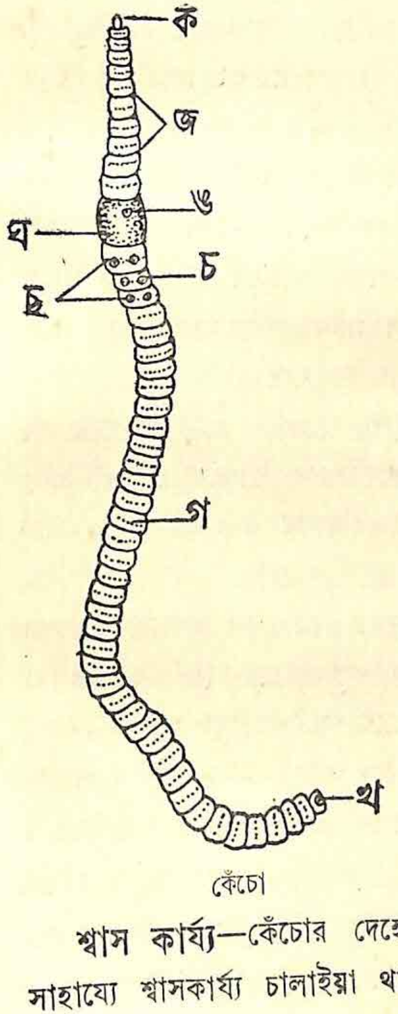
অজৈব ভাগ মলের সহিত একত্রে পরিত্যাগ করে। ঐ বিষ্ঠা কুণ্ডলীকে (Casting) কেঁচোর মাটি বলে।

কেঁচো কাহাকেও কামড়ায় না। উহাদের দেহে আঘাত বা স্পর্শ লাগিলে দেহ সঙ্কুচিত হইয়া যায় এবং দেহ হইতে এক প্রকার রস নির্গত হয়। পতঙ্গ, ভেক্, মৎস্য, পাখী, সরীসৃপ প্রভৃতির প্রিয় খাদ্য কেঁচো। পিঁপড়া ইহাদের পরম শত্রু।

দেহ গঠন—কেঁচোর দেহকে বলে ফেরেটিমা :(Pheretima)। দেহের গঠন সরু দড়ির মত। পূর্ণবয়স্ক কেঁচো সাধারণতঃ ৭—৮ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং ⅙ ইঞ্চি মোটা হয়। ১৮'' ইঞ্চির অধিক দীর্ঘ কেঁচো সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় একজাতীয় কেঁচো ৫ ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। ইহার দেহ গোলাকার, সম্মুখভাগ ছুঁচাল এবং পশ্চাদভাগ ভোঁতা। পিঠের রং কাল্‌চে বাদামী এবং পেটের রং হাল্‌কা বাদামী। কেঁচোর দেহ ১০০—১২০টি আংটির মত খণ্ডকের সমষ্টি (Segments)। সম্মুখের ১৩টি খণ্ডকের পর তিনটি খণ্ডক মাংসের ফিতার দ্বারা আবৃত। এই তিনটি খণ্ডক বাহির হইতে বুঝা যায় না। এই স্থানটিকে বলে ক্লাইটেলাম (Cliteelum)। ইহার অবস্থিতি হইতে দেহের অগ্র ও পশ্চাদভাগ বুঝা যায়। প্রথম খণ্ডকের প্রান্তভাগে একটি ক্ষুদ্র মাংস পিণ্ড থাকে, উহা ওষ্ঠ বা প্রষ্টোমিয়ম্ (Prostomium)। ওষ্ঠের ঠিক নীচে একটি ছিদ্র থাকে, সেইটি কেঁচোর মুখ। দেহের শেষভাগে আর একটি ছিদ্র থাকে তাহা পায়ু (anus)। এই দুই দ্বার ব্যতীত দ্বাদশ খণ্ডকের সন্নিকট হইতে দেহের শেষ পর্য্যন্ত খণ্ডকগুলির সংযোগ স্থলে পিঠের দিকে একটি করিয়া একসারি ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে। এইগুলিকে (Dorsal pores) পৃষ্ঠ ছিদ্র বলে। এই ছিদ্রগুলি হইতে এক প্রকার ক্ষার জাতীয় রস নির্গত হয়। কেঁচো ইচ্ছামত পেশী সঙ্কোচন করিয়া ঐ ছিদ্র দিয়া রস নিঃসারণ করিতে পারে।

প্রথম ও শেষ খণ্ডক এবং ক্লাইটেলাম ব্যতীত প্রতি খণ্ডকের

মধ্যভাগ বেষ্টন করিয়া কতকগুলি কূর্চ (Bristles) (কঠিন লোমের মত) থাকে। উহার নাম কিটা (Chaeta) বা সিটা (Seta)। খালি চোখে এইগুলি দেখা যায় না। পিছনের দিক হইতে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিলে খস্‌খসে্‌ বোধ হয়। এই প্রকার কিটা থাকায় কেঁচোকে কিটোপোডা (Chaetopoda) বা কিটাপদ প্রাণী বলা হয়। দেহের পেশী সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিয়া কিটাগুলির সাহায্যে কেঁচো চলাফেরা করে।



ক—ওষ্ঠ Prostomium
খ—পায়ু Anus
গ—কিটা Chaeta
ঘ—Clitellum
ঙ—স্ত্রী জনেন্দ্রীয় Female genital pore
চ—পুং জনেন্দ্রীয় Male genital pore
ছ—জনন গুল্ম Genital papilla
জ—শুক্রনিঃসারী ছিদ্র Opening of Spermatheca

কেঁচো

শ্বাস কার্য্য—কেঁচোর দেহে ফুস্‌ফুস্‌ নাই। ইহারা ত্বকের সাহায্যে শ্বাসকার্য্য চালাইয়া থাকে। ইহাদের ত্বকের মধ্যে বহু

সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তবহা নালী থাকায় বাতাস হইতে Oxygen গ্রহণ এবং CO_2 ত্যাগ নিষ্পন্ন হয়। এইরূপে সমস্ত শরীর দিয়া শ্বাসকার্য্য চলিয়া থাকে এবং দেহকোষগুলি সর্ব্বদা বাতাসের সংস্পর্শে সজীব থাকে। দূষিত বাষ্প ও ময়লা সমস্ত শরীর দিয়া বাহির হইয়া যায়। এইজন্য কেঁচোর দেহ সব সময় ভিজা থাকে।

রক্ত সঞ্চালন—কেঁচোর দেহে হৃদপিণ্ডও নাই। সপ্তম হইতে ত্রয়োদশ খণ্ডকের মধ্যে পৃষ্ঠদেশে কয়েকটি স্ফীত রক্তবাহী নালী আছে। এইগুলি হৃদপিণ্ডের কার্য্য করে। ইহাদের শিরা উপশিরা আছে। ঐগুলির উঠা নামার ফলে সমস্ত শরীরে রক্ত ছড়াইয়া পড়ে। ইহাদের রক্তকণিকা বর্ণহীন।

অন্যান্য ইন্দ্রিয়—ইহাদের শ্রবণ ইন্দ্রিয় নাই, কিন্তু স্পর্শেন্দ্রিয় খুব তীক্ষ্ণ। উহাদের দেহে শব্দ তরঙ্গ স্পর্শ করিলে উহারা সাড়া দেয়। ইহাদের দর্শেন্দ্রিয় নাই কিন্তু আলো পড়িলে কতকগুলি খণ্ডক সাড়া দেয়। রাত্রে আহার অন্বেষণে যখন বাহির হয় তখন অঙ্গে উজ্জ্বল আলোক লাগিলে তৎক্ষণাৎ পলাইয়া যায়।

জননাঙ্গ—কেঁচো উভলিঙ্গ (Bisexual) প্রাণী ইহাদের স্ত্রী পুরুষ ভেদ নাই। একই দেহে পুংজনেন্দ্রিয় ও স্ত্রীজনেন্দ্রিয় বর্ত্তমান। ক্লাইটেলামের অগ্রভাগে চতুর্দ্দশ খণ্ডকের মাঝখানে একটি ছিদ্র থাকে ইহা স্ত্রীজনেন্দ্রিয় (Female genital pore)। এই ছিদ্র দিয়া কেঁচো ডিম প্রসব করে। ক্লাইটেলামের শেষ ভাগে অষ্টাদশ খণ্ডকের দুই পার্শ্বে দুইটি ছিদ্র থাকে উহা পুংজনেন্দ্রিয় (Male genital pores)। সপ্তদশ ও উনবিংশ খণ্ডকে ২টি করিয়া ৪টি জননগুল্ম (Genital papilla) থাকে। পঞ্চম হইতে নবম খণ্ডক পর্য্যন্ত প্রতি খণ্ডকের সংযোগ স্থানের দুই পার্শ্বে ২টি করিয়া ৮টি শুক্রনিঃসারী ছিদ্র (Opening of spermatheca) থাকে। ক্লাইটেলাম হইতে একপ্রকার রস নিঃসৃত হইয়া একটি সাদা থলি (Cocoon) প্রস্তুত হয়। স্ত্রীজনন ছিদ্র হইতে বহু ডিম্ব নির্গত হইয়া উহার মধ্যে

সঞ্চিত হয়। পুংজনন ছিদ্র হইতে পুং বীর্য্য (Spermatozoa) নির্গত হইয়া উহাতে লাগিলে ডিমগুলি পরিপুষ্ট হয়। ডিমগুলি যতদিন অপরিপুষ্ট থাকে ততদিন থলিটি কেঁচোর দেহে আবদ্ধ থাকে। ডিমগুলি যেমন পরিপুষ্ট হইতে থাকে থলিটিও তেমনি ঢিলা হইয়া ক্রমে কেঁচোর দেহ হইতে খসিয়া পড়ে। কেঁচো উহা মাটির মধ্যে পুঁতিয়া রাখে। ২।৩ সপ্তাহ পরে ডিমগুলি ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয়।

কৃষির সহায়—জমিতে অধিক সংখ্যক কেঁচো থাকিলে জমিতে উহারা বহু গর্ত্ত করে। গর্ত্তগুলির ভিতর দিয়া বৃষ্টির জল মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া মাটি সরস রাখে। মাটিতে বহু গর্ত্ত হইবার ফলে মাটির ভিতরে প্রচুর বায়ু প্রবেশ করে। তাহাতে উদ্ভিদের মূল প্রচুর অক্সিজেন পায় এবং গাছ সতেজে বৃদ্ধি পায়। কেঁচোর দেহ নির্গত মৃত্তিকায় জৈব পদার্থ থাকে না বটে কিন্তু মৃত্তিকা কণাগুলি সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত হইয়া যাইবার ফলে মাটির খনিজ উপাদানগুলি উদ্ভিদের পক্ষে সহজলভ্য অবস্থায় আসিয়া যায়। এই প্রকার মাটিতে যথেষ্ট চূণ থাকে। এই মৃত্তিকার সহিত জৈব সার মিশাইয়া দিলে উদ্ভিদের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ হয়। এইজন্য কোন কোন স্থানে কেঁচো পালন করিয়া জমিতে ছড়াইয়া দেওয়া হয়।

কৃত্রিম উপায়ে কেঁচোর চাষ

বড়, বড় কাঠের বাক্সে মাটির সহিত কেঁচোর খাদ্য মিশাইয়া দেওয়া হয়। মাটির সহিত তৈল অথবা চর্ব্বিজাতীয় খাদ্য মিশাইয়া দিলে কেঁচোরা খুব তাড়াতাড়ি বাড়িয়া যায়। সাধারণতঃ গমের ভূষি, পচা মাখম, পচা ডিম বা ডিমের গুঁড়া মাটির সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয় এবং মাটি সর্ব্বক্ষণ ভিজা (moist) রাখা হয়। যে সকল কেঁচোর ডিম্ব থলিটি (Cocoon) পুষ্ট অথবা প্রায় পুষ্ট হইয়াছে ঐরূপ কেঁচো বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হয়। ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইলে বড় কেঁচোগুলি সাবধানে তুলিয়া বাহির

করিয়া লওয়া হয়। কেঁচো তীব্র আলোক সহ্য করিতে পারে না। কেঁচোগুলিকে সহজে উঠাইয়া ফেলিবার জন্য বাক্সের ভিতরে তীব্র বৈদ্যুতিক আলো ফেলা হয়। আলোক পাইয়া কেঁচোগুলি বাক্সের তলার দিকে জমা হয়। তখন ঐ স্থানের মাটি চাঁচিয়া উহাদের তুলিয়া লওয়া হয়।

বিজ্ঞানাগারে কেঁচো পরীক্ষা

পরীক্ষাকালে জীবন্ত অবস্থায় কেঁচোর দেহ পরীক্ষা করা যায় না, কারণ পরীক্ষাকালে উহার দেহ সঙ্কুচিত হইতে থাকে। সুতরাং পরীক্ষার জন্য উহাকে মারিয়া ফেলিতে হয়।

একটি কাঁচপাত্রে কিছু জল লও। জলের দশ শতাংশ পরিমাণ মেথিলেটেড স্পিরিট জলে মিশাও। ঐ দ্রবণে কিছুক্ষণ কেঁচো ডুবাইয়া রাখিলে প্রসারিত হইয়া উহা মরিয়া যাইবে। ফরসেপস্ দ্বারা তুলিয়া ডেসিকেটিং ট্রের উপর রাখিয়া বিভিন্ন অঙ্গ পরীক্ষা কর।

আরশোলা

(Cockroach)

আরশোলা Orthoptera শ্রেণীর অন্তর্গত একলিঙ্গ (unisexual) পতঙ্গ। উষ্ণ, অন্ধকার, আর্দ্রস্থানে বাস করে। ইহারা উজ্জ্বল আলো পছন্দ করে না, সেইজন্য সচরাচর গুদাম, ভাঁড়ার ঘর, পয়ো-প্রণালীর মধ্যে ইহাদের অধিক সংখ্যায় থাকিতে দেখা যায়। ইহারা সকল প্রকার খাদ্য খায়, শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য ইহাদের বিশেষ প্রিয়। আরশোলার যে একটা বিশ্রী গন্ধ পাওয়া যায় উহা তাহাদের লালার গন্ধ। Borax আরশোলার পক্ষে মারাত্মক বিষ। শ্বেতসার খাদ্যের সহিত Borax মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে উহারা মরিয়া যায়।

দেহ গঠন—ইহাদের দেহের উপরিভাগ গাঢ় বাদামী রং-এর কঠিন খোলা (Chitinous cuticle) দ্বারা আবৃত থাকে। আরশোলার

দেহ চারি অংশে বিভক্ত—(ক) মস্তক (Head) (খ) গ্রীবা (Neck), (গ) বক্ষ (Thorax), ও (ঘ) উদর (abdomen)

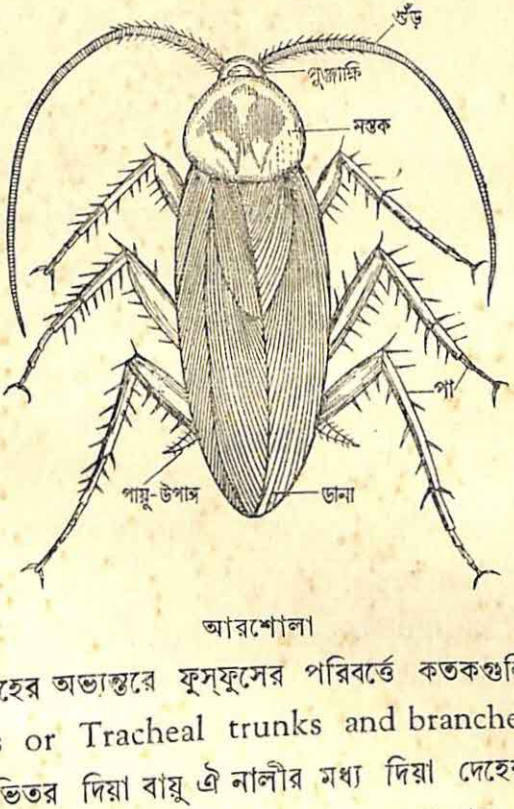
মস্তক—মস্তক ত্রিকোণাকৃতি, সম্মুখ দিকে ক্রমশঃ সরু। উপরিভাগ কঠিন আবরণ দ্বারা আবৃত। উহার ভিতরে মস্তিষ্ক (brain) অবস্থিত। মস্তকের উপরে একজোড়া দীর্ঘ বহু গাঁটযুক্ত শুঁড় (antennae) থাকে। ঐ দুইটি অনুভব যন্ত্র। উহাদের গোড়ায় একটি করিয়া সাদা চিহ্ন থাকে। মস্তকের উভয় পার্শ্বে একজোড়া পুঞ্জাক্ষি (Compound eye) থাকে। মস্তকের সম্মুখভাগে মুখমণ্ডল অবস্থিত (mouth parts)। মুখগহ্বরের সম্মুখ দিকে দুইটি কঠিন চোয়াল (mandibles) থাকে। উহার ভিতর দিকের ধারে করাতের মত কাটা খুব তীক্ষ্ণ দাঁত থাকে। ইহাদের মুখগঠন কামড়াইয়া খাইবার উপযোগী (Biting mouth)। সম্মুখস্থ চোয়ালের পশ্চাতে আর দুইটি চোয়াল থাকে, তাহাদের (Maxilla) ম্যাক্সিলা বলে। উহারা খাদ্য গ্রহণে সাহায্য করে। উপরোষ্ঠ Labrum মুখগহ্বরের উপর ঝুলিয়া থাকে। ম্যাক্সিলার পশ্চাতে একটি Labium থাকে, উহা নিম্নোষ্ঠের কাজ করে।

গ্রীবা—ইহা অতি ক্ষুদ্র ও সরু। মস্তক ও বক্ষকে যুক্ত রাখে। এইজন্য আরশোলা মস্তক ঘুরাইতে পারে।

বক্ষ—তিন খণ্ডে বিভক্ত (Segments)। প্রতি খণ্ডে একজোড়া করিয়া মোট ৬টি পা থাকে। পাগুলি দীর্ঘ ও গাঁটযুক্ত, পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত। এইজন্য আরশোলা দ্রুত চলিতে পারে। পায়ের প্রান্তভাগ থাবার মত (Claw) । পায়ের গায়ে কাঁটা থাকে। বক্ষের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে একজোড়া করিয়া বড় ডানা (wings) থাকে। প্রথম ডানা জোড়া কঠিন, বসিবার সময় পাতলা, নরম, ঝিল্লিবৎ দ্বিতীয় জোড়া ডানাকে ঢাকিয়া রাখে। দ্বিতীয় জোড়া ডানা এই অবস্থায় ভাঁজ হইয়া থাকে (folded)

উদর—প্রশস্ত, পশ্চাৎদিকে ক্রমশঃ সরু। উহার শেষ প্রান্তে

পায়ু (anus) অবস্থিত। উদর ১০ খণ্ডে বিভক্ত। পায়ুর উভয় পার্শ্বে একটি করিয়া ক্ষুদ্র চ্যাপ্টা **পায়ুউপাঙ্গ** (annal cerci) থাকে ঐ উপাঙ্গ দুইটির সম্মুখে পুংপতঙ্গের কাঁটার ন্যায় দুইটি সরু ক্ষুদ্র Style থাকে। উদরের শেষ দুইটি খণ্ডক ব্যতীত অন্যান্য খণ্ডকগুলির উভয় পার্শ্বে একটি করিয়া ছিদ্র থাকে। ঐগুলি শ্বাসরন্ধ্র (Stigmata or Spiracles)। বক্ষের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডকেও ঐরূপ শ্বাসরন্ধ্র



আরশোলা

থাকে। দেহের অভ্যন্তরে ফুস্‌ফুসের পরিবর্তে কতকগুলি বায়ুনালী (air tubes or Tracheal trunks and branches) থাকে। শ্বাসরন্ধ্রের ভিতর দিয়া বায়ু ঐ নালীর মধ্য দিয়া দেহের অভ্যন্তরে পরিব্যাপ্ত হয়। পতঙ্গ বসিয়া থাকিলে লক্ষ্য করা যায় যে উহাদের উদর উপরে নীচে নড়িতেছে, শ্বাসকার্য্যের জন্য ঐরূপ হয়।

বংশ বিস্তার—স্ত্রী আরশোলা একসঙ্গে অনেকগুলি ডিম পাড়ে। ডিমগুলি চ্যাপটা লম্বাকৃতি (hard oblong capsules)। ডিমের খোলা কঠিন। ডিম হইতে আরশোলার অনুরূপ বাচ্চা (Nymph)

বাহির হয়। এই সময় উহার ডানা থাকে না। Nymph অবস্থায় উহারা অবিরাম খাইতে থাকে। দেহের বহিরাবরণ কয়েকবার ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ঐ সময় উহার দেহের রং সাদা থাকে, পরে বাদামী রং দেখা দেয়। ক্রমশঃ ডানা গজাইয়া পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গে (Imago or adult) পরিণত হয়। ইহাদের জীবনেতিহাস সরল অর্থাৎ তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়া অতিবাহিত হয়—ডিম (egg), শৈশব (nymph) এবং পূর্ণাবয়ব অর্থাৎ দেহ গঠন সম্পূর্ণ হইয়া ডানা বাহির হয় এবং প্রজননক্ষম হয়।

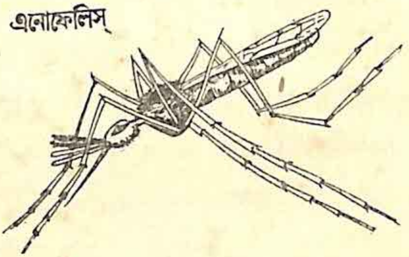
পরীক্ষাগারে আরশোলা পরীক্ষা

ফর্ম্যালিনের মধ্যে আরশোলা ডুবাইয়া রাখিলে অল্পকাল মধ্যে মরিয়া যায়। ফর্সেপস্ সাহায্যে আরসোলাটি তুলিয়া—ডিসেক্টিং ট্রের উপর রাখিয়া উহার দেহের উপরিভাগ পরীক্ষা কর। তাহার পর আরশোলাটি উল্টাইয়া দুইটি সূক্ষ্ম পিন্ দ্বারা ট্রের মধ্যে আটকাইয়া নিম্নাংশ পরীক্ষা কর।

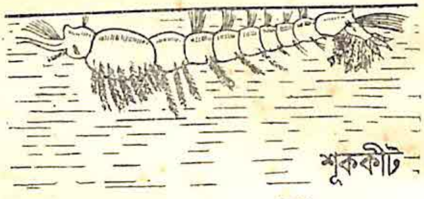
মশা
(Mosquito)

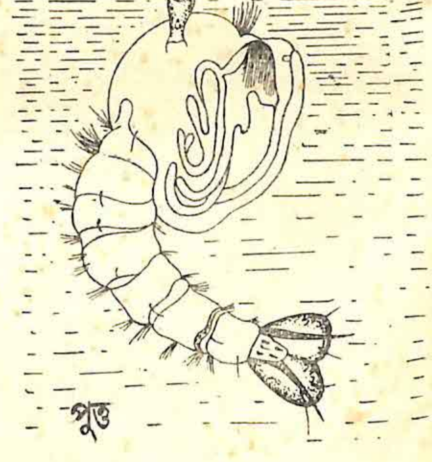
মশা Diptera বা দ্বিপক্ষ পতঙ্গ শ্রেণীর অন্তর্গত। মশা সবরকম স্থানেই থাকে। তুষার দেশ আইস্‌লাণ্ড, ল্যাপলাণ্ড প্রভৃতি স্থানে এমন কি তুন্দ্রা অঞ্চলে ইহাদের দেখা যায়। ইহারা নিশাচর, অন্ধকারে থাকিতে ভালবাসে। রৌদ্রময় স্থানে এবং যেখানে অবাধে বায়ু সঞ্চালন করে সেইখানে থাকে না। দিনের বেলায় অন্ধকার স্থানে থাকে এবং সন্ধ্যা হইলে বাহির হয়। বহু জাতীয় মশা আছে। তন্মধ্যে তিনটি জাতির মশার সহিত আমরা সচরাচর পরিচিত—(ক) অ্যানোফেলিস্ (Anopheles) (খ) কিউলেক্স (Culex), (গ) স্টেগোমিয়া (Stegomya)। এনোফেলিস ম্যালেরিয়া, কিউলেক্স ফাইলেরিয়া বা গোদ এবং ষ্টেগোমিয়া ডেঙ্গু জ্বরের বীজাণু বিস্তার করে। কেবল স্ত্রী মশক রক্ত পান করিয়া রোগের বীজাণু সংক্রমিত করে।

অ্যানোফেলিস জাতীয় মশাকে সহজে চেনা যায়। ইহারা বসিবার স্থানের সহিত একটি সূক্ষ্ম কোণ (acute angle) করিয়া বসে এবং উহাদের মাথার নল ও উদর এক সমান্তরালে থাকে। দেহের পশ্চাদ-ভাগ যেন উচুঁ হইয়া আছে এইরূপ দেখায়। ইহাদের ডানায় সাদা সাদা বিন্দু থাকে।







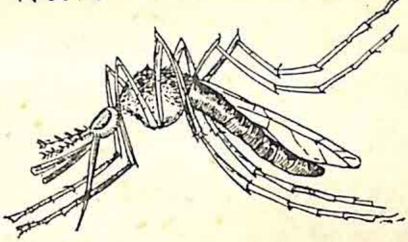


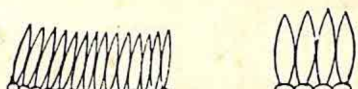
অ্যানোফেলিসজাতীয় স্ত্রী মশক কোন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীকে দংশন করিলে রোগীর রক্তের সহিত ম্যালেরিয়া বীজাণু মশার পেটের মধ্যে যায় এবং সেই স্থানে বৃদ্ধি পায়। তাহার পর বীজাণুগুলি মশার লালা নিঃসারী গ্রন্থির (Salivary glands) মধ্যে আসিয়া অবস্থান করে। ইহাতে ঐ মশার ম্যালেরিয়া হয় না। কিন্তু ঐ মশা মানুষের রক্ত শোষণকালে লালা ত্যাগ করিয়া রক্ত পাতলা করিয়া লয় যাহাতে সূক্ষ্ম নলের মধ্যে রক্ত সহজে প্রবেশ করে। ঐ লালার সহিত ম্যালেরিয়া বীজাণু মনুষ্য দেহে সংক্রমিত হয়।

দেহ গঠন—সাধারণ পতঙ্গের মত মশার দেহ তিন অংশে বিভক্ত—(ক) মস্তক (খ) বক্ষ (Thorax) (গ) উদর।

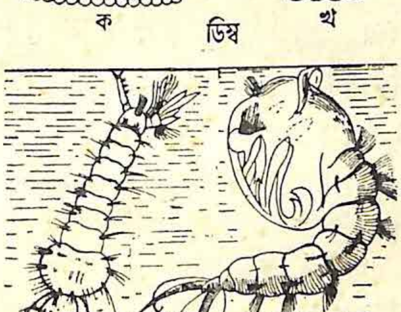
মস্তক—ইহাদের মাথা গোলাকার। মাথার উপরে দুইটি পুঞ্জাক্ষি, দুইটি লোমশ প্যাল্প (Palp) এবং দুইটি লোমশ শুঙ্গ (antennae) থাকে। স্ত্রীমশা অপেক্ষা পুরুষ মশার শুঙ্গ বড় ও ঘন লোমযুক্ত। মাথার সম্মুখভাগে একটি নলাকৃতি মুখ থাকে। স্ত্রীমশার ঐ নলের অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ সূচের মত। উহা মনুষ্য শরীরে ফুটাইয়া রক্ত শোষণ করে। পুংমশার নল মোটা ও ভোঁতা। উহারা রক্ত পান করে না। পাতা, ফুল, ফল প্রভৃতির রস শোষণ করিয়া থাকে। এই প্রকার মুখকে বলে শোষক মুখ (Sucking mouth)

কিউলেক্স





ক ডিম্ব খ



(খ) (Thorax) **বক্ষ**—বক্ষ তিনটি খণ্ডকের সমষ্টি। প্রত্যেক খণ্ডকের উভয় পার্শ্বে একটি করিয়া মোট ৬টি পা থাকে। পাগুলি কয়েক খণ্ডে বিভক্ত। দ্বিতীয় খণ্ডকে এক-জোড়া পাতলা ডানা থাকে। উড়িবার সময় ডানার স্পন্দনের জন্য একরকম শব্দ হয়। তৃতীয় খণ্ডকের ডানা দুইটি রূপান্তরিত হইয়া সরু কাঠির মত অঙ্গে পরিণত হইয়াছে। উহা দ্বারা দেহভারের সমতা রক্ষিত হয়।

(গ) **উদর** (abdomen)—মশার পেট লম্বা ও শেষ ভাগ সরু। আরশোলার মত মশার উদর ও বক্ষের উভয় পার্শ্বে শ্বাসরন্ধ্র থাকে।

মশার রূপান্তর—বিভিন্ন জাতীয় মশার জীবনেতিহাস প্রায়ই অনুরূপ। উহা জটীল (Complex life history)—চারিটি অবস্থার মধ্য দিয়া অতিবাহিত হয়—ডিম (egg), শূককীট (Larva), পুত্ত (Pupa) এবং পূর্ণাঙ্গ (adult)। ইহাদের প্রথম তিনটি অবস্থা জলের মধ্যে অতিবাহিত হয়।

এনোফেলিস মশকী নদী, বড় পুকুর বা পরিস্কার স্থির জলাশয়ে লতাগুল্ম প্রভৃতির উপরে একবারে প্রায় ৩০০টি ডিম পাড়ে। ডিমগুলি দেখিতে নৌকার মত। প্রত্যেকটি ডিম পৃথক থাকে। জলে ভাসিবার জন্য উহার গায়ে দুইটি ভেলা (raft) থাকে। দুই দিন পরে ডিম ফুটিয়া শূককীট বাহির হয়। শূককীটের দেহ স্বচ্ছ ও লম্বা। জলের মধ্যে উহারা ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায় এবং জলজ উদ্ভিদ ও ক্ষুদ্র পোকা মাকড় খায়। কিউলেক্স অপরিস্কার, বদ্ধ জল এবং সবরকম জলে ডিম পাড়ে। ইহাদের ডিম লম্বা, নীচের অংশ মোটা। ডিমগুলি আঠার মত একপ্রকার পদার্থ দ্বারা সংযুক্ত থাকে এবং খাড়াভাবে জলের উপরে ভাসিয়া থাকে। দুই সপ্তাহকাল শূক অবস্থায় ইহারা ৪ বার খোলস ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধি পাইয়া তৃতীয় অবস্থা পুত্তে রূপান্তরিত হয়। এই অবস্থায় উহারা কিছু খায় না। এই সময় উহার অবয়বের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। দুই তিন দিনের মধ্যে পুত্তের ত্বক ফাটিয়া যায় এবং পূর্ণাঙ্গ মশা বাহির হইয়া আসে। নবজাত মশা পরিত্যক্ত খোলসের উপর কিছু সময় বসিয়া থাকে, ডানা শুষ্ক হইলে উড়িয়া যায়।

মাছ

প্রাণী বিভাগের দশম বিভাগ মেরুদণ্ডী প্রাণীদের (Vertebrata) মধ্যে মাছ সর্ব্ব নিম্নস্তরের প্রাণী। ইহাদের দেহ জলে অবাধে বিচরণ করিবার মত গঠিত। মাংসপেশী ও পিঠের শিরদাঁড়ায় অনেকগুলি অস্থি থাকায় ইহারা সহজে জলের মধ্যে চলাফেরা করিতে

পারে। জলে বাস করিলেও মাছ জল পান করে না। সর্ব্ব শরীর দিয়া জল শোষণ করিয়া তৃষ্ণা মিটায়। মুখ দিয়া মাছকে যে জল পান করিতে দেখা যায় তাহা উদরে প্রবেশ করে না। শ্বাস লইবার জন্য মাছ সর্ব্বদা মুখ দিয়া জল লয় এবং জলে দ্রবীত oxygen ফুলকার লাল রক্তবহা নালী দিয়া টানিয়া লয় এবং কানকুয়া খুলিয়া জল বাহির করিয়া দেয়। মাছ মাত্রেরই জোড়া পাখ্না (paired fins) থাকে এবং পাখনার মধ্যে হাড় বা কাঁটা থাকে। মাছের ইহা বৈশিষ্ট্য যেমন পাখীর বৈশিষ্ট্য পালক।

জাতি—মৎস্য প্রধাণতঃ দুই প্রকার—(১) উপাস্থি বিশিষ্ট, (Cartilaginous fish) অর্থাৎ যাহাদের অস্থির বদলে একপ্রকার নরম পদার্থ থাকে, যেমন হাঙ্গর, শঙ্কর প্রভৃতি মাছের থাকে। ইহারা সাধারণতঃ সামুদ্রিক (marine) হইয়া থাকে ;

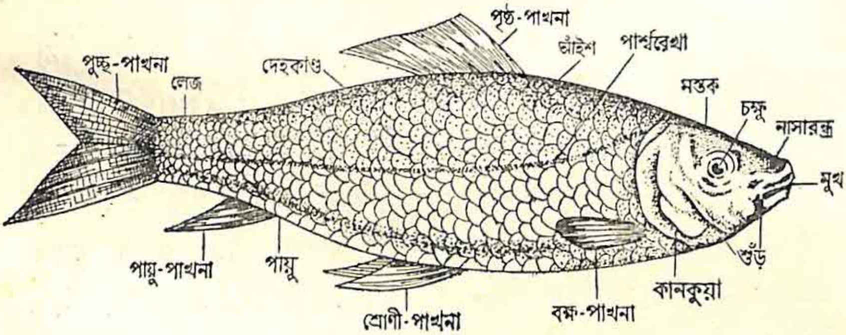
(২) হাড়যুক্ত (Bony fish)। পুকুর, নদী প্রভৃতি মিঠা জলে ইহাদের বাস (fresh water fish)। শৈশব অবস্থায় ইহাদের উপাস্থি থাকে বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত উহা অস্থিতে পরিণত হয়। সমুদ্রে দুই প্রকারই মাছ থাকে। সমুদ্রের লোনা জলের মাছ সাধারণতঃ মিঠা জলে বাঁচে না, সেইরূপ মিঠা জলের মাছ লোনা জলে বাঁচে না। ইলিশ মাছ সমুদ্র ও নদী উভয় স্থানে থাকে, কিন্তু পুকুরে থাকে না।

আকৃতি—মাছের আকৃতি নানা প্রকার হইয়া থাকে, যেমন বাইন মাছের গঠন সাপের মত, চাঁদা মাছ গোলাকার, শিঙ্গি, মাগুর, গুলে লম্বা ইত্যাদি। মাছের বর্ণও নানা প্রকার হয়, কাল, লাল, রূপার মত শুভ্র, সোনালী প্রভৃতি। অধিকাংশ মাছের দেহের বর্হিভাগে চামড়ার উপর আঁশ থাকে। আঁশের গঠন নানা প্রকার হয়। অনেক মাছের আঁশ থাকে না, তাহাদের দেহ কেবল চামড়া দ্বারা আবৃত থাকে যেমন মাগুর, শিঙ্গি, বোয়াল, ট্যাংরা প্রভৃতি।

আঁশের উপরে এবং আঁশহীন মাছের চামড়ার উপরে এক প্রকার পিচ্ছিল পদার্থ লাগিয়া থাকে।

দেহ—রুইমাছের গঠনকে সাধারণভাবে মাছের গঠন বলিয়া আলোচনা করা যায়। মাছের দেহের তিনটি অংশ—(ক) মস্তক (Head), (খ) দেহকাণ্ড (Trunk), (গ) লেজ (Tail)। গলা বলিয়া ইহাদের কিছু নাই।

(ক) **মস্তক**—মস্তক অংশে মুখ থাকে। আঁশহীন মৎস্যের মুখের উভয় পার্শ্বে কয়েকটি সরু সরু লম্বা শুঁড়ের মত থাকে ঐগুলিকে বার্‌বেল (Barbel) বলে। ঐগুলি তীক্ষ্ণ অনুভূতি সম্পন্ন যন্ত্র। উহাদের স্পর্শদ্বারা মাছ বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারে। আঁশহীন বার্‌বেল যুক্ত মাছকে বলে Cat fish। মুখগহ্বরের মধ্যে উপরে ও নীচে একটি করিয়া চোয়াল থাকে। মুখগহ্বরের সামান্য পশ্চাতে



মাছের বহিরাঙ্গ

উপর দিকে দুইটি ছোট নাসারন্ধ্র (Nostrils) থাকে। এই ছিদ্র দিয়া মাছেরা কেবল ঘ্রাণ লইয়া থাকে, শ্বাস কার্য্য হয় না। মাথার দুই পার্শ্বে দুইটি গোলাকার চক্ষু থাকে কিন্তু তাহাতে পর্দ্দা (eyelid) থাকে না। মাছেরা ভাসমান অবস্থায় অথবা জলের তলায় সোজা কিম্বা পার্শ্বভাবে থাকিয়া চোখ খুলিয়া ঘুমায়।

মাথার দুই পার্শ্বে দুইটি করিয়া কান্‌কুয়া (Operculum) থাকে। চারিটি কঠিন অস্থিদ্বারা কান্‌কুয়া গঠিত। কান্‌কুয়ার নীচে চারিটি

করিয়া ফুলকা (Gill) থাকে। ফুলকায় বহু রক্তবাহী নালী থাকে। ফুলকা ফুস্‌ফুসের কার্য্য করে। ফুলকার সাহায্যে জলে দ্রবীত অক্সিজেন শোষণ করিয়া শ্বাসকার্য্য পরিচালন করিয়া জীবিত থাকে। মাছ বাহিরের মুক্ত বায়ু গ্রহণ করিতে পারে না এইজন্য জলের বাহিরে থাকিলে উহারা মরিয়া যায়। কিন্তু কৈ, মাগুর, সিঙ্গি প্রভৃতি মাছের ফুল্কা ব্যতীত অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র থাকে (accessary respiratory organs)। ফুলকা ও ঐ অতিরিক্ত শ্বাস যন্ত্র উভয়ের সাহায্যে উহাদের শ্বাসকার্য্য নিষ্পন্ন হয়। এই প্রকার মাছ মধ্যে, মধ্যে জলের উপরে মাথা তুলিয়া বাহিরের বাতাস হইতে অতিরিক্ত শ্বাস যন্ত্র দিয়া অক্সিজেন লয় এবং দূষিত প্রশ্বাস ত্যাগ করে। এইজন্য এই প্রকার মাছকে জলের বাহিরে রাখিলে অনেকক্ষণ জীবিত থাকে, আবার জলের মধ্যে উহারা সম্পূর্ণ আবদ্ধ থাকিলে, অর্থাৎ বাহিরের বায়ুর সহিত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইলে মরিয়া যায়।

মাছের দেহের বর্হিভাগে কান থাকে না। মাথার ভিতরে এক প্রকার শ্রবণ যন্ত্র থাকে। তাহার সাহায্যে উহারা শুনিতে পায়।

(খ) **দেহকাণ্ড** (Trunk)—দেহকাণ্ড মস্তকের পশ্চাৎ হইতে পায়ু পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মাথার পশ্চাতে দেহের অভ্যন্তরে বায়ুপূর্ণ পট্‌কা থাকে। উহার সাহায্যে মাছ জলে ভাসা, উঠা, নামা প্রভৃতি স্বচ্ছন্দে করিতে পারে। দেহকাণ্ডে পাঁচটি পাখনা (fins) থাকে। সম্মুখভাগে কানকুয়া দুইটির নীচের দিকে একজোড়া পাখনা থাকে তাহাকে বলে বক্ষ পাখনা (Pectoral fins), পিছনের দিকে অঙ্কদেশে (Ventral region) একজোড়া শ্রোণী পাখনা (Pelvic fins), এবং পৃষ্ঠের উপরে একটি বড় শক্ত হাড়যুক্ত পৃষ্ঠ পাখ্‌না (Dorsal fin) থাকে।

যেসব মাছের দেহে আঁশ থাকে তাহাদের কান্‌কো হইতে লেজ পর্য্যন্ত দেহের দুই পার্শ্বে দুই বা ততোধিক লম্বা রেখা থাকে। উহাদের বলে পার্শ্বরেখা (Lateral lines)। এই রেখা-

গুলির নীচে একপ্রকার বিশিষ্ট গঠনাদির সমাবেশ আছে। উহাদের সাহায্যে জলের স্পন্দন, কম্পন প্রভৃতি অবস্থা অনুভূত হয়।

(গ) **লেজ** (Tail)—পায়ু হইতে দেহের শেষ পর্য্যন্ত অংশকে পুচ্ছ বা লেজ বলে। লেজের সম্মুখে অঙ্কদেশে একটি ছোট পায়ু পাখনা থাকে (Anal fin)। লেজের শেষ অংশে দুই ভাগে বিভক্ত একটি বড় পুচ্ছ পাখনা (Tail fin) থাকে।

লেজের বড় পাখনা সাঁতার দিবার সময় হালের কাজ করে এবং অন্যান্য পাখনাগুলি দাঁড়ের কাজ করে, অর্থাৎ উহাদের সাহায্যে জলে সাঁতার কাটিয়া যায়। পাখনাগুলি জলের মধ্যে মাছের দেহ-ভারের সমতাও রক্ষা করে।

মাছের খাদ্য—মাছের মধ্যে একেবারে তৃণভোজী বা একেবারে আমিষ ভোজী নাই। যাহারা বেশী শৈবাল বা জলজ উদ্ভিদ খায় তাহাদের তৃণভোজী বলা যায়, যেমন বড় পোনা মাছ প্রভৃতি। ইহারা অধিক অর্দ্ধ পচা জলজ উদ্ভিদ খায়। যাহারা অধিক প্রাণী খায় তাহাদের আমিষভোজী বলা যায়, যেমন কই, মাগুর, সিঙ্গি, প্রভৃতি। কোন কোন মাছ নানা প্রকার পচা দ্রব্য, বিষ্ঠা প্রভৃতি অধিক খায়, যেমন ট্যাংরা, ইলিশ প্রভৃতি। শাল, সোল, ল্যাটা, চিতল বোয়াল, ভেট্‌কি প্রভৃতি ছোট ছোট মাছ ধরিয়া খায়।

মাছের প্রজনন—মাছের স্ত্রী, পুরুষ ভেদ আছে। পোনামাছ দুই বৎসর বয়সে প্রজননক্ষম হয়। জেওল মাছ—কৈ, মাগুর, সিঙ্গি এবং সোল, বোয়াল, চিতল প্রভৃতির স্ত্রী মৎস্য বদ্ধ জলাশয়ে ডিম পাড়ে। কোন কোন জাতীয় মাছ জলের মধ্যে জলজ উদ্ভিদের টুক্‌রা দিয়া সুন্দর বাসা নির্ম্মাণ করিয়া উহার মধ্যে ডিম রাখে। বাসায় একটি মাত্র মুখ থাকে। শিঙ্গি ও মাগুর মাছের এইরূপ বাসা দেখা যায়। পোনা মাছ বদ্ধ জলাশয়ে ডিম পাড়ে না। উহারা নদীর অগভীর জলে বর্ষার প্রথমে এক সঙ্গে বহু ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিয়া ছোট ছোট লম্বা বাচ্চা বাহির হয়। উহাদের ডিম

পোনা বলে। জেলেরা জাল দিয়া ডিমপোনা ধরিয়া আনে এবং ঐগুলি পুকুরে ছাড়া হয়। মাছ একসঙ্গে বহু ডিম প্রসব করে। একটি রুইমাছের প্রায় দশলক্ষ ডিম হয়। রুইমাছ নিজেরাই বহু ডিম খাইয়া ফেলে।

মাছের ব্যবহার—মাছ একটি নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য। মাছে যথেষ্ট প্রোটিন ও চর্ব্বি থাকে। পোনামাছে দুই শতাংশ প্রোটিন থাকে। মাগুর সিঙ্গিতে প্রোটিন কম থাকে বলিয়া উহা সহজপাচ্য, রোগীর আহার। ইলিশ মাছে প্রচুর তৈল থাকে। কড্ মাছ ও হাঙ্গরের তৈলে প্রচুর ভাইটামিন থাকে, এই কারণে উহাদের তৈল ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। মাদ্রাজে হাঙ্গরের তৈলের (Shark oil) একটি বৃহৎ কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

মাছ হইতে শিরিষ, তৈল, চাম্ড়া, চাবুক, জমির সার প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। মাছের আঁশ হইতে কৃত্রিম মুক্তা, নানাবিধ খেল্না তৈয়ার হয়। অস্থি বিশিষ্ট মাছ, বিশেষতঃ শৈশব অবস্থায় মশার শূক কীট খাইতে খুব ভালবাসে। মাছ এইরূপে ম্যালেরিয়া দমনে সাহায্য করে।

দ্বিতীয় পরীক্ষাপত্র

চতুর্থ ভাগ

সাধারণ কৃষি, মাটির পরিচর্য্যা ও ফসল উৎপাদন

Syllabus

General Agriculture including Soil management and Crop culture.

(a) Relation of Agricultural Science to other basic science.

(b) Distribution of leading crops in India with special reference to West Bengal.

(c) Climatic factors in crop production—rainfall, monsoon, temperature, humidity, crop seasons.

(d) Soils, properties of clay, silt, sand and Loam.

(e) Soil fertility. Major plant nutrients and their effects on soil and crop. Importance of soil organic matter.

(f) Common farm implements and their operation.

(g) Tillage operation for preperation of seed bed, sowing, planting, transplanting, intercultural operations.

প্রথম অধ্যায়

মৌলিক বিজ্ঞানের সহিত কৃষি-বিজ্ঞানের সম্বন্ধ

(Relation of agricultural science to other basic science)

তত্ত্বের স্বরূপ জানা অর্থাৎ কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ নির্ণয় দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয় তাহা বিজ্ঞান বা বিশিষ্টজ্ঞান। ঐ লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা মনুষ্য জাতির সুখ স্বাচ্ছন্দ বিধান করাকে প্রয়োগ বা ফলিতবিজ্ঞান (applied science) বলা হয়।

পৃথিবী জীব ও জড়ের সমন্বয়ে গঠিত। জীব ও জড়কে জানিবার জন্য বিজ্ঞান দুই অংশে বিভক্ত—জীববিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞান। পদার্থ-বিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, ভূবিদ্যা প্রভৃতি জড়বিজ্ঞানের অন্তর্গত। জড়ের বিভিন্ন অবস্থা, প্রকৃতি ও ধর্ম্ম এবং জড়ের উপর শক্তির ক্রিয়া, শক্তির নানা রূপান্তর ও তাহাদের প্রকৃতি এই সব পদার্থবিদ্যার অন্তর্গত। ইহার পরেই মানুষের পদার্থের উপাদান, গঠন ও ব্যবহার সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জাগে, ইহার উত্তর দেয় রসায়নবিদ্যা।

জড়কে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, প্রকৃতির অন্তরে প্রবেশ করিয়া নূতন নূতন সৃষ্টির ইচ্ছা মানুষের চিরন্তন। এই চিরন্তনী আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে নব নব আবিষ্কারের পথে লইয়া যায়। প্রকৃতিদত্ত ঐশ্বর্য্যে মানুষ সন্তুষ্ট নয়। তাহার সহিত নিজের সৃষ্টিক্ষমতা যোগ করিয়া মানুষের পরিতৃপ্তি। প্রকৃতির আনুকূল্যে যে চিরাচরিত প্রথায় মানুষ এতদিন জীবিকা আহরণ করিতেছিল তাহাতে সে আর তুষ্ট নয়। আধুনিক-কালের বিজ্ঞানের মঙ্গলসূচক আবিষ্কার তাহার ঐ আকাঙ্ক্ষাপূর্ত্তির সহায়তা করিতেছে।

যদিও সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে মানুষ নানা কৌশলে ফসল উৎপাদন ও পশুপালন করিয়া আসিতেছে কিন্তু সাম্প্রতিককালে

বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্য অবলম্বনে কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষি ও গৃহপালিত পশুপক্ষীর অভূতপূর্ব্ব উন্নতিবিধানে সমর্থ্য হইয়াছে। আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানের সহিত যাঁহারা পরিচিত নহেন তাঁহাদের ধারণা গ্রাম্য কৃষকের সীমিত জ্ঞান কৃষিবিদ্যার শেষ কথা। অতীতের অভিজ্ঞতা মূল্যবান হইলেও কেবলমাত্র তাহাতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী সর্ব্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া কৃষি ব্যবস্থাকে আধুনিক পদ্ধতিতে রূপায়ণ করা অনস্বীকার্য্য। কৃষি-পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নব নব বৈজ্ঞানিক কৌশল বহুদিন যাবৎ আবিষ্কৃত হইতেছে। কৃষিবিজ্ঞান অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে অপরাপর মৌলিক বিজ্ঞান ও শিল্পের সহিত ইহা জটিল ও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বিজ্ঞানের তত্ত্বের দিক (Theoretical aspect) অজানা থাকিলে প্রয়োগ বিদ্যা অপূর্ণ থাকিয়া যায়। বিদ্যাকে মনের চিন্তা ও হাতের সৃষ্টির মধ্য দিয়া মূর্ত্ত করাই প্রকৃত জ্ঞানলাভের উপায়।

ফসল বৃদ্ধি, উদ্ভিদের উন্নতি, বিভিন্নস্থানে নানাপ্রকার উদ্ভিদ উৎপাদন করিতে উদ্ভিদবিদ্যার জ্ঞান অপরিহার্য্য। উদ্ভিদের খাদ্য ও পরিপোষণ বিষয়ে জানিতে হইলে, কীট ও রোগ দমনের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইলে রসায়ন শাস্ত্রে বুৎপত্তি থাকা আবশ্যক, এবং কীট পতঙ্গের স্বরূপ ও পরিচয় লাভের জন্য প্রাণিবিদ্যার অন্তর্গত কীট-তত্ত্ব (Entomology) অবগত হইতে হয়। আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি, মাটির গঠন ও ধর্ম্ম প্রভৃতির তথ্য জানিবার জন্য পদার্থবিদ্যার জ্ঞান আবশ্যক। সাধারণ উদ্ভিদ মাটির উপর জন্মে এবং মাটি ও বায়ু হইতে খাদ্যের উপাদান সংগ্রহ করে। আর জল না পাইলে প্রাণীজগতের অস্তিত্বই থাকে না। সুতরাং মাটি, বায়ু, জল এবং উহার খাদ্য প্রভৃতির পরিচয় লাভের জন্য পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও ভূবিদ্যার অনুশীলন প্রয়োজন। প্রাকৃতিক প্রভাবদ্বারা জীবজগৎ নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং জল, বৃষ্টি, আবহাওয়া বিষয়ের তথ্য জানিবার জন্য জলবায়ু বিজ্ঞানের (Climatology) শরণ লইতে হয়। এইরূপে মূল বিজ্ঞান সমূহের

বিভিন্ন তথ্য অবলম্বনে কৃষি ও গৃহপালিত পশুর প্রভূত উন্নতি এবং কীটাদি দমন দ্বারা বহু মূল্যবান ফসল রক্ষা করা সম্ভব হইয়াছে। কৃষিবিজ্ঞানের মুল ভিত্তি জড় ও জীববিজ্ঞান এবং উহাদের বিভিন্ন তথ্যের প্রয়োগ কৃষিবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। অর্থাৎ ইহা একটি প্রয়োগ বিজ্ঞান (Applied science)। সুতরাং মূল বিজ্ঞানের সহিত পরিচয় না থাকিলে কৃষিবিজ্ঞান সম্যগ অধিগত করা যায় না।

ভারতবর্ষে বিভিন্ন অঞ্চলে মুখ্য ফসলগুলির পরিব্যাপ্তি

(Distribution of leading crops in India with special reference to West Bengal)

ভারতবর্ষে বহু প্রকার ফসল উৎপাদিত হয়। ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত সরকারী বিবরণী অনুযায়ী মোট যে পরিমাণ জমিতে আবাদ হইয়াছিল তাহার শতকরা ৭৫ ভাগ জমিতে খাদ্যশস্যের চাষ হইয়াছিল। ঐ হিসাব অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার ফসলের আবাদ ও উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে উক্ত বিষয়ে ধারণা জন্মিবে।

খাদ্যশস্য (Food grains)

ধান (Paddy)—পৃথিবীর অর্দ্ধেকের উপর অধিবাসীর প্রধান খাদ্য চাউল। অন্যান্য খাদ্য ফসলের তুলনায় ভারতবর্ষে ধানের চাষ সর্ব্বাধিক হইয়া থাকে। যে সকল স্থানে উষ্ণতা গড়ে ৭৫° ডিগ্রির উপর এবং বৃষ্টিপাত ৪০″ অধিক, অথবা পর্য্যাপ্ত জল সেচ দেওয়া যায় সেই সকল স্থানে ধানের উৎপাদন অধিক হয়। সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ৫ হাজার ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ স্থানে ধান চাষ হয়। পলিমাটিযুক্ত সমভূমি ধান চাষের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ধান অর্দ্ধ জলজ উদ্ভিদ (semi aquatic plant), এইজন্য ইহার গোড়ায় সর্ব্বদা জল থাকা আবশ্যক হয়।

ভারতবর্ষের মৌসুমী অঞ্চল এবং বদ্বীপগুলি ধান উৎপাদনের

পক্ষে বিশেষ উপযোগী। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, অন্ধ্র, পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূল এবং নদীর বদ্বীপগুলিতে প্রচুর ধান্য উৎপাদিত হয়। এইসব অঞ্চল ব্যতীত কাশ্মীর ও পার্ব্বত্য অঞ্চলে ৫ হাজার ফুট উচ্চ স্থান পর্য্যন্ত ধান চাষ হয়। ভারতবর্ষে ৭৮,১৭৪ হাজার একার জমিতে ধান চাষ হয় এবং উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ২৯,১৪২ হাজার টন।

গম (Wheat)—ইহা প্রধানতঃ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের প্রধান খাদ্যশস্য। সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ১০ হাজার ফুট উচ্চ স্থানে গম জন্মে। যে সকল স্থানে বৃষ্টিপাত প্রায় ৩০″ এবং তাপমাত্রা ৬০° কাছাকাছি সেইরূপ স্থান গম চাষের পক্ষে উৎকৃষ্ট। এইজন্য ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই শীতকালে গম চাষ হয়। ভারতবর্ষে উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, যেখানে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম সেইসব স্থানে অধিক গম চাষ হয়। পূর্ব্ব পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই, বিহার ও মধ্য ভারতে গম উৎপন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় সামান্য গম চাষ হয়। দক্ষিণ ভারতে গম চাষ বিশেষ হয় না। ভারতবর্ষে ৩২,৮৯১ হাজার একার জমিতে, ৯,০৬৮ হাজার টন গম উৎপন্ন হয়। গম উৎপাদনে ভারতবর্ষের স্থান পৃথিবীতে পঞ্চম।

জোয়ার (Jowar)—পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষে জোয়ার চাষ সর্ব্বাধিক হয়। প্রায় সকল প্রদেশে পশুখাদ্য অথবা শস্যের জন্য জোয়ার চাষ করা হয়। যেসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অল্প, সেইসব স্থানে অধিক পরিমাণে জোয়ার চাষ করা হয়। বোম্বাই, মাদ্রাজ, অন্ধ্র, মহিশূর, মধ্য ও উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার, উড়িষ্যা এবং রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্যের শুষ্ক অঞ্চলে জোয়ার চাষ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে প্রধানতঃ পশু খাদ্যের জন্য বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুরে কিছু কিছু চাষ করা হয়। ৪১,৩১৪ হাজার একর জমিতে ৭,৪২৭ হাজার টন শস্য উৎপন্ন হয়।

রাগি বা মাড়ুয়া (Ragi)—দক্ষিণ ভারতের লাল মাটিতে প্রধানতঃ রাগি চাষ করা হয়। বিহারের ছোটনাগপুর, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও উড়িষ্যার পার্ব্বত্য অঞ্চলে ইহার চাষ হয়। ৫,৬৭৪ হাজার একার জমিতে ১,৯১৪ হাজার টন মাড়ুয়া শস্য উৎপন্ন হয়।

যব (Barley)—গম অপেক্ষা যবের চাষে জলের প্রয়োজন কম হয়। সেইজন্য শুষ্ক ও শীতল অঞ্চলে ইহার আবাদ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে ইন্দোগাঙ্গেয় পলি মাটিতে প্রধানতঃ যবের চাষ হয়। পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও বিহারে সর্ব্বাধিক চাষ হয়। মোট উৎপাদনের শতকরা ৬৬ ভাগ উত্তর প্রদেশে জন্মে। পশ্চিম বাংলায় যবের চাষ নাই। ৮,৫৯৪ হাজার একার জমিতে ২,৭৪৪ হাজার টন যব উৎপন্ন হয়।

বজরা (Bajra)—বঙ্গদেশ ও আসাম ব্যতীত প্রায় সর্ব্বত্রই বজরার চাষ হয়। যেখানে বৃষ্টিপাত কম এবং মাটি উর্ব্বর নয় সেইসব স্থানে ইহার চাষ হয়। বোম্বাই, উত্তর প্রদেশ, মাদ্রাজ, অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার ও রাজস্থানে যথেষ্ট চাষ হয়। ২৭,৫৪২ হাজার একার জমিতে ২৯২৬ হাজার টন শস্য উৎপন্ন হয়।

ভুট্টা (Maize)—ইহা বর্ষাকালের খরিফ ফসল। সমভূমি এবং পার্ব্বত্য অঞ্চলে যেখানে গড়ে ৩০"-৪০" বৃষ্টিপাত হয় সেইসব স্থান ভুট্টা চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। পলিমাটিতে ভুট্টার ফলন সর্ব্বাধিক হয়। পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বিহার, অন্ধ্র, মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্যে ব্যাপকভাবে এবং পশ্চিমবঙ্গের পার্ব্বত্য অঞ্চল, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় কিছু আবাদ হয়। ৯,২৪৪ হাজার একার জমিতে ৩,০২০ হাজার টন উৎপন্ন হয়।

ক্ষুদ্র শস্য (Small millets)

চিনা, কাউন, খেরি, কোদো, শ্যামা প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর খাদ্যশস্য ১২,২০৯ হাজার একার জমিতে চাষ হয় এবং ২,০১০ হাজার টন উৎপন্ন হয়। এইগুলি সাধারণতঃ দরিদ্রের আহার। বোম্বাই, মধ্য ও

দক্ষিণ ভারত, রাজস্থান, বিহার ও উত্তর প্রদেশে বর্ষাকালে ইহাদের আবাদ হয়। পশ্চিমবঙ্গে ইহাদের চাষ হয় না।

ডাল ফসল (Pulses)

ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রই ডাল উৎপন্ন হয়। মোট ২৭,৬০৯ হাজার একার জমিতে ৩,৪৫৮ হাজার টন নানা প্রকার ডাল উৎপাদিত হয়।

ছোলা (Gram)—ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই ছোলা উৎপাদিত হয়। প্রধানতঃ পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, পূর্ব্ব বোম্বাই ও অন্ধ্র রাজ্যে অধিক উৎপন্ন হইয়া থাকে। ২৩,৯৯০ হাজার একার জমিতে ৫,৯৩০ হাজার টন ছোলা জন্মে।

মুসুর (Lentils)—ভারতে সর্ব্বত্রই ইহার চাষ হয়, বিশেষ মধ্য ও উত্তর প্রদেশ, অন্ধ্র. মাদ্রাজ, বোম্বাই, দাক্ষিণাত্য, বঙ্গ ও বিহার।

খেসারি (Khesari)—বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উত্তর প্রদেশের পূর্ব্বাঞ্চল ও পশ্চিমবঙ্গ।

মুগ ও কলাই—সর্ব্বত্র চাষ হয়।

মটর (Pea)—প্রধানতঃ উত্তর প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, পাঞ্জাব ও উড়িষ্যায়। প্রায় ৩০০ হাজার একার জমিতে ৩৪৫৮ হাজার টন মটর জন্মে।

অড়হর (Arhar)—প্রধানতঃ বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ. বোম্বাই, মহিশূর, অন্ধ্র, মাদ্রাজ, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন হয়। তূলা, বাজ্‌রা, ভুট্টা প্রভৃতির সহিত সাধারণতঃ মিশ্র চাষ করা হয়।

তৈলবীজ (Oil seeds)

সরিষা, তিল, তিসি, রেড়ি, চীনাবাদাম. কার্পাসবীজ, কুসুম, সোরগুজা, মহুয়া, নারিকেল প্রভৃতি হইতে এদেশে তৈল নিষ্কাশিত করা হয়। নারিকেল সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী অঞ্চলে বিশেষ মালাবার উপকূলে প্রচুর জন্মে। অপরাপর তৈলবীজ প্রায় সর্ব্বত্রই কিছু না কিছু জন্মিয়া থাকে। ইহাদের জন্য মাঝারি রকম বৃষ্টিপাত প্রয়োজন হয়। চীনাবাদাম প্রধানতঃ মাদ্রাজ, মধ্যভারত ও বোম্বাই অঞ্চলে,

সরিষা উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও আসামে, তিল মাদ্রাজ, বোম্বাই ও মধ্যভারতে, রেড়ি উত্তরপ্রদেশ ও মাদ্রাজ অঞ্চলে অধিক আবাদ হয়। তৈলবীজ উৎপাদনে ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে। সরিষা ও তিল পশ্চিম বাংলায় কিছু চাষ করা হয়।

তিল (Sesamum)—পৃথিবীর মধ্যে অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় ভারতবর্ষে সর্ব্বাধিক জমিতে তিলের চাষ হয়। তৈল উৎপাদক ফসল হিসাবে ইহার বিশেষ গুরুত্ব। ব্যাপকভাবে চাষ হয়—বোম্বাই, অন্ধ্র, মধ্যভারত, মাদ্রাজ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও উড়িষ্যায়। পশ্চিমবঙ্গে সর্ব্বত্রই কিছু চাষ হয়, তন্মধ্যে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় অধিক হয়। ৫,৪৩৮ হাজার একার জমিতে ৪৫১ হাজার টন উৎপন্ন হয়।

সরিষা (Rape) :—সর্ব্বত্রই চাষ হয়। দক্ষিণ ভারত অপেক্ষা উত্তরভারতে সমধিক চাষ হয়। ৬,২১১ হাজার একার জমিতে ১,০১৭ হাজার টন উৎপন্ন হয়।

রেড়ি (Castor) :—ভারতবর্ষে সমতল ও উচ্চ ভূমিতে রেড়ির চাষ হয়। ব্যাপকভাবে হয় অন্ধ্ররাজ্য, মাদ্রাজ, বোম্বাই, মহিশূর, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও উত্তরপ্রদেশে। পশ্চিম বঙ্গে সামান্য হয়। ১,৪০৩ হাজার একার জমিতে ১২৯ হাজার টন জন্মে।

তিসি (Linseed) :—কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পৃথিবীর মোট তিসির চাহিদার অধিকাংশ ভারতবর্ষ সরবরাহ করিত। ইহা প্রধানতঃ মধ্যভারত, বোম্বাই রাজ্যের পূর্ব্বভাগ, বিহার, উত্তরপ্রদেশে, অন্ধ্র এবং পশ্চিম বঙ্গে উৎপন্ন হয়। ৩,৭৫৮ হাজার একার জমিতে ৩৪৯ হাজার টন উৎপন্ন হয়।

চীনাবাদাম (Groundnut)—সর্ব্বাধিক উৎপন্ন হয় অন্ধ্র, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশে, উত্তরপ্রদেশে ও মহিশূর রাজ্যে। পৃথিবীর মোট উৎপাদন ৫ মিলিয়ান টন, তাহার মধ্যে ভারতবর্ষে ৩ মিলিয়ান টন উৎপন্ন হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রায় ৪০ ভাগ ভারতবর্ষ সরবরাহ করে। ১৯৫৮ সালের হিসাবে দেখা যায়—১৩,১০১

হাজার একার জমিতে ৪,০৮৬ হাজার টন চীনাবাদাম উৎপন্ন হইয়াছিল।

তন্তু (Fibres)

কার্পাস (Cotton) ঃ—যেখানে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৪০″ কম অথচ মাটি বহুদিন আর্দ্র থাকে সেই সব স্থান কার্পাস চাষের উপযোগী। ভারতবর্ষে প্রায় সর্ব্বত্র কিছু না কিছু তূলার চাষ হয়। দক্ষিণাত্যের কৃষ্ণ মৃত্তিকা (Black cotton soil) এবং ইন্দোগাঙ্গেয় অঞ্চলের উপরিভাগের পলি মাটিতে প্রধানতঃ কার্পাস উৎপন্ন হয়। বোম্বাই, মধ্য ও উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মহিশূর, অন্ধ্র ও রাজস্থান তূলা উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় সামান্য তূলা উৎপন্ন হয়। ১৯,৮৪৩ হাজার একার জমিতে ৪,৭২৩ হাজার গাঁইট বীজমুক্ত তূলা উৎপন্ন হয়।

পাট ও মেস্তা (Jute) ঃ—বৃষ্টিবহুল অঞ্চল, নদী তীরের আর্দ্র পলিমাটিতে পাট ভাল জন্মে! পশ্চিমবঙ্গে ধানের পরেই পাটের স্থান। ইহা ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল। আসামের দক্ষিণ পশ্চিমাংশ এবং কুচবিহারে প্রচুর পাট জন্মে। পশ্চিমবঙ্গে সর্ব্বত্রই পাট হয়। বিহারের পূর্ণিয়া জেলা, ত্রিপুরা রাজ্য ও উড়িষ্যায় যথেষ্ট পাট উৎপন্ন হয়। উত্তরপ্রদেশের তরাই অঞ্চলে পাট চাষের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। পৃথিবীর মোট উৎপন্ন পাটের পাঁচ ভাগের চারি ভাগ পাট পূর্ব্ব পাকিস্থানে উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষে পাট চাষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন পাট হইতে এখানকার পাটকলগুলির চাহিদা মিটিতেছে। এ বৎসর পশ্চিমবঙ্গ হইতে কিছু কাঁচা পাট রপ্তানী হইয়াছে। ১,৮৮৩ হাজার একার জমিতে ৪,২২১ হাজার গাঁইট পাট জন্মে।

পাটের জমি অপেক্ষা উঁচু জমিতে মেস্তা চাষ হয়। ৭৩৮ হাজার একার জমিতে ১,৪৭৪ হাজার গাঁইট মেস্তা উৎপন্ন হয়।

শন (Sunnhemp)—শনের চাষ ভারতবর্ষের সমভূমের সর্ব্বত্রই

কিছু না কিছু হইয়া থাকে। উত্তর প্রদেশে সর্ব্বাধিক হয়। বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে চাষ হয়। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং বর্দ্ধমান জেলার উত্তর পশ্চিমাংশে শনের চাষ হয়। উত্তর প্রদেশের বেনারসী নামক শন সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

বিবিধ ফসল

ইক্ষু (Sugarcane)—উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে আখের চাষ ভাল হয়। পলিমাটিযুক্ত সমভূমি যেখানে জল দাঁড়ায় না, আখ চাষের পক্ষে উৎকৃষ্ট। ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রই আখ চাষ হয়। আখ চাষের জমির পরিমাণ পর্য্যায়ক্রমে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, বঙ্গদেশ, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, বোম্বাই, অন্ধ্র, মহিশূর, হায়দ্রাবাদ, উড়িষ্যা ও আসাম। ভারতবর্ষে মোট আখ চাষের প্রায় অর্দ্ধেক উত্তর প্রদেশে হয় এবং মোট চিনির কলেরও অর্দ্ধেক ঐ অঞ্চলে অবস্থিত। উত্তর বিহার হইতে যুক্তপ্রদেশ ব্যাপিয়া পাঞ্জাব পর্য্যন্ত আখ চাষের ক্ষেত্র বিস্তৃত। ৫,০১৯ হাজার একার জমিতে ৬৬,৮৯০ হাজার টন আখ উৎপন্ন হয় পৃথিবীর মোট উৎপন্ন চিনির ১৮·৯৫ শতাংশ ভারতবর্ষে উৎপাদিত হয়।

তামাক (Tobacco)—উষ্ণ অঞ্চলে যে স্থানের মাটি শীতকালে সরস থাকে এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে তামাক ভাল জন্মে। ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রই কিছু না কিছু তামাক চাষ হয়। ভারতবর্ষে তামাক উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্রগুলি—(১) অন্ধ্ররাজ্যের গণ্টুর অঞ্চল এখানে প্রধানতঃ সিগারেটের তামাক, (২) উত্তর বিহারের ত্রিহুত বিভাগ, (৩) বোম্বাই রাজ্যের নিপানি অঞ্চল—বেল্গাঁও, সাতারা, কোলাপুর, সাঙ্গলি, ও খিরাজ জেলা বিড়ির তামাক উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ, (৪) সৌরাষ্ট্র, (৫) উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও পশ্চিম দিনাজপুর, এবং (৬) আসামের গোয়ালপাড়া জেলা। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলায়ও কিছু তামাক চাষ হয়। ভারতবর্ষে ১,০২২ হাজার একার জমিতে ৩০৬ হাজার টন তামাক উৎপন্ন হয়।

চা (Tea)—পার্ব্বত্য অঞ্চলে যেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় অথচ

মাটিতে জল দাঁড়ায় না এইরূপ ঢালু জমিতে চা জন্মে। পশ্চিমবঙ্গের দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা, আসাম উপত্যকা ও উত্তর পার্ব্বত্য অঞ্চল এবং দক্ষিণ ভারতে নীলগিরি ও কেরালা রাজ্যে চায়ের ব্যাপক চাষ হয়। উত্তর প্রদেশের দেরাদুন এবং পঞ্জাবের কাংড়া উপত্যকায় কিছু চা জন্মে। ৫-৬ হাজার ফুট উচ্চে যে চা জন্মে তাহার গন্ধ (flavour) উৎকৃষ্ট হয়। দার্জ্জিলিং পর্ব্বতের চা উৎকৃষ্ট গন্ধযুক্ত, তরাই ও আসামের চায়ের নির্য্যাস (Liquor) ভাল হয়। পৃথিবীর শতকরা ৪০ ভাগ চা ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষে ৭৭৯ হাজার একার জমিতে চা বাগিচা রহিয়াছে।

কফি (Coffe)—সাধারণতঃ ৩ হাজার ফুট উচ্চ, অপেক্ষাকৃত অল্প বৃষ্টিযুক্ত স্থানে কফি ভাল জন্মে। পশ্চিমঘাট পর্ব্বত, মহীশূর, নীলগিরি ও কেরালা রাজ্যে কফি উৎপন্ন হয়। ২৩৪ হাজার একার জমিতে ৫৯ হাজার টন কফি উৎপন্ন হয়।

মশলা (Spices)—আদা, হলুদ, লঙ্কা, ধনে, মৌরি প্রভৃতি রন্ধনের মশলা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই কিছু কিছু উৎপন্ন হয়। এলাচি, লবঙ্গ, দারুচিনি, তেজপাতা, গোলমরিচ প্রভৃতি মশলা মালাবার উপকূল এবং দক্ষিণ ভারতের পার্ব্বত্য অঞ্চল ও উপত্যকায় উৎপন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গের দার্জ্জিলিং জেলায় কিছু বড় এলাচ জন্মে। লঙ্কার চাষ হয় ১৪৫০ হাজার একার জমিতে, উৎপন্নের পরিমাণ ৩৫৪ হাজার টন।

রবার (Rubber)—নিরক্ষীয় উষ্ণ আর্দ্র অঞ্চলে রবার বৃক্ষ জন্মে। ঐ বৃক্ষের আঠা হইতে রবার প্রস্তুত হয়। মহীশূর, কেরালা ও মালাবার অঞ্চলে রবার জন্মে। ভারতবর্ষে রবার চাষের সূত্রপাত মাত্র ৬০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে হয়। বর্ত্তমানে ১৭৪ হাজার একার জমিতে ৪৩ হাজার টন রবার উৎপন্ন হইতেছে। পৃথিবীর মোট রবার উৎপাদনের শতকরা মাত্র দুইভাগ ভারতবর্ষে জন্মে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফসল উৎপাদনে জলবায়ুর প্রভাব

(Climatic factors in crop production)

কৃষিকার্য্য নানা প্রকার প্রাকৃতিক ঘটনার প্রভাবাধীন। কতকগুলি সমাধান সাপেক্ষ আর অনেকগুলি এখনও মানুষের আয়ত্তের বাহিরে। যেগুলি মানুষের ক্ষমতার বাহিরে রহিয়াছে তাহার মধ্যে জলবায়ু (climate) এবং আবহাওয়া (weather) সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি প্রধান। জলবায়ু এবং আবহাওয়া বিষয়ে জ্ঞান থাকিলে তাহাদের অনুকূল ও প্রতিকূল প্রভাবের সম্মুখীন হইবার চেষ্টা করা যায়। ভৌগোলিক অবস্থান, বৃষ্টিপাত, সূর্য্যতাপ, বায়ুর তাপমাত্রা, চাপ ও আর্দ্রতা, তুহিন (frost), শিলাপাত (Snow fall) প্রভৃতির সমষ্টিগত প্রভাব সেই অঞ্চলের জলবায়ু (Climate) এবং কোন দিনের এইরূপ অবস্থা বিশেষকে বলে আবহাওয়া (weather)। জলবায়ু (climate) এবং আবহাওয়া (weather) উদ্ভিদ ও জীব জীবনে সবিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

ভৌগোলিক অবস্থান

ভারতবর্ষে কতকাংশ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল (Temperate zone) এবং বাকি অংশ উষ্ণ মণ্ডলের (Tropical zone) মধ্যে অবস্থিত। এইজন্য সারা বৎসর ব্যপিয়া এদেশে নানাবিধ উদ্ভিদ জন্মে। সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী অঞ্চলে দ্বীপপ্রকৃতির উদ্ভিদ (Island habitat) যেমন নারিকেল, সুপারি, গোলমরিচ, লবঙ্গ এবং নানা প্রকার উষ্ণমণ্ডলের (Tropical) ফল, ফুল, কন্দ জন্মে। পার্ব্বত্য অঞ্চলে শীতাঞ্চলের বহু উদ্ভিদ জন্মে।

বৃষ্টিপাত—জল জীবজগতের প্রাণস্বরূপ। উদ্ভিদের মূলাঞ্চলে সর্ব্বদা জলের প্রয়োজন। মাটির মধ্যে প্রাকৃতিক জল (Natural

water) থাকিতে পারে অথবা জল সেচন করা হয়, অথবা বৃষ্টিপাত হইতে জল পাওয়া যায়। সময়োপযোগী পরিমিত বৃষ্টিপাত হইলে পর্য্যাপ্ত ফসল উৎপন্ন হয়, নচেৎ উৎপাদনের তারতম্য ঘটে, এমনকি ফসল সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াও যাইতে পারে। বৃষ্টিপাত মানুষের আয়ত্তের বাহিরে। ভারতবর্ষের কৃষি বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের উপর একান্ত নির্ভরশীল।

মৌসুম—ভারতবর্ষে মৌসুমী বায়ু হইতে বৃষ্টি হয়। অধিকাংশ অঞ্চলে প্রধানতঃ গ্রীষ্মকালে জুন হইতে আগস্ট মাস অবধি গ্রীষ্মকালীন মৌসুমী বায়ুর প্রাদুর্ভাব হয়। কোন কোন অঞ্চলে শরৎকালে বৃষ্টিপাত হয়। মাদ্রাজ উপকূল এবং ভারতের দক্ষিণাংশে শীতকালে শীতকালীন মৌসুমী বায়ু হইতে দ্বিতীয় বার বৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষে দ্বাদশ মাসের বৃষ্টিপাত—জানুয়ারি হইতে জুন পর্য্যন্ত সাময়িক যৎ-সামান্য, কোন কোন অঞ্চলে আদৌ হয় না, জুন হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত মাঝারি রকমের (moderate), মাঝে মাঝে প্রচুর (Heavy), সেপ্টেম্বর মাসে হাল্‌কা ধরনের এবং অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত দ্বিতীয় মৌসুম প্রভাবাধীন অঞ্চলে অধিক বৃষ্টিপাত হয়।

ফসল উৎপাদনের সাফল্য কেবলমাত্র বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের মোট পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। ফসলের বিভিন্ন অবস্থায় বৃষ্টিপাতের মাত্রা অনুযায়ী ফসলের উৎপাদন একান্তভাবে নির্ভর করে। এদেশে অধিকাংশ স্থানে মৌসুমী বায়ুর সময় বৃষ্টিপাত অধিক হইয়া থাকে। যেসব অঞ্চলে বর্ষাকাল দীর্ঘস্থায়ী, সেইসকল স্থানে বৃষ্টিপাত সবদিন সমান পরিমাণে হয় না, কয়েক দিন মুষলধারায়, আবার কোন দিন সামান্য পরিমাণে বৃষ্টি হয়। এই কারণে বৃষ্টিপাতের মোট পরিমাণের অনুপাতে অল্প পরিমাণ জল মাটির নিম্নস্তরে প্রবেশ করে, অধিকাংশ জল নিম্নভূমি দিয়া নদী নালা বহিয়া চলিয়া যায়। এইরূপে প্রচুর জলের অপচয় ঘটে। অতি প্রাচীন কাল হইতে বড় বড় দীঘি খনন করিয়া এবং নিম্নস্থানে বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া ঐরূপ জল প্রবাহ (Over-

flow) ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখা হইত। বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় এইরূপ ব্যবস্থা দেখা যায়। ময়ুরাক্ষী, কংসবতী, দামোদরউপত্যকা প্রভৃতি পরিকল্পনাগুলি প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে। বর্ষাকালে এইসব নদী দিয়া যে প্রচুর জলরাশির অপচয় হয় উহা আটকাইয়া রাখিয়া গ্রীষ্ম ও শীতকালে সেচ প্রভৃতি কার্য্যে ব্যবহার করা হইবে। আবার এক-কালীন অত্যধিক বৃষ্টি, ফসলের সবিশেষ ক্ষতির কারণ হয়।

প্রয়োজনাতিরিক্ত বৃষ্টিপাত অপেক্ষা অনিয়মিত বৃষ্টিপাত (uneven distribution of rainfall) ফসলের পক্ষে অধিক ক্ষতিকর হয়। সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য ফসলের বিশেষ, বিশেষ অবস্থায় জলের প্রয়োজন হয়। জল পাইয়া ফসল সতেজে বৃদ্ধি পাইল কিন্তু ফুল ধরিবার সময় যেমন ধানগাছের থোড় মুখ অবস্থায়—বৃষ্টির অভাব হইলে শস্য জন্মে না। আবার বীজ বপনের পর অধিক বৃষ্টি হইলে মাটি চাপ বাঁধিয়া যায়, ফলে বীজ নষ্ট হইয়া যায়, অঙ্কুরোদ্গম হয় না।

বায়ুর তাপ

(Atmospheric temperature)

বায়ু অধিক উত্তপ্ত হইলে উদ্ভিদের উপর শুষ্ক প্রতিক্রিয়া (drying effect) সৃষ্টি করে। তাপ খুব নিম্ন হইলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি মন্থর হইয়া যায় (delaying effect), মুকুল নির্গমন কালে তুহিন হইলে মুকুল মরিয়া যায়। বাংলাদেশে পার্ব্বত্য অঞ্চল ব্যতীত সমতল ভূমিতে তুহিন হয় না। এদেশে গ্রীষ্মকালে কয়েকমাস বায়ুর তাপ খুব উচ্চে উঠে। সেইজন্য ঐ সময় কোন শস্যজাতীয় ফসলের আবাদ হয় না। উচ্চতাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পানের চাষ বরোজের মধ্যে করা হয়। শাকসব্‌জি ও ফলের চারা আচ্ছাদন দিয়া তাপ হইতে রক্ষা করিতে হয়। এদেশে উচ্চ পার্ব্বত্য অঞ্চল ব্যতীত সমতলভূমিতে শীতকালে যে পরিমাণ তাপের হ্রাস হয় তাহা শীতপ্রধান অঞ্চলের

মত উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকর হয় না। শীতাঞ্চলে শীতকালে অতি নিম্নতাপের ফলে বৃক্ষের সমুদয় পাতা ঝরিয়া যায়, কোন প্রকার আবাদ করা যায় না।

বায়ুর আর্দ্রতা (Humidity)—বায়ুর আর্দ্রতার তারতম্যের জন্য আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন হয়। এদেশে মৌসুমী বৃষ্টি দ্বারা বায়ুর আর্দ্রতা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়। যে স্থানে মৌসুমী বৃষ্টিপাত অধিক সেই স্থানের বায়ুর আর্দ্রতাও অধিক হয়। দার্জ্জিলিং অঞ্চলে বর্ষাকালে বায়ুর আর্দ্রতা ৯৫ পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। বায়ুর আর্দ্রতা কম হইলে আবহাওয়া শুষ্ক হয়। মার্চ্চ, এপ্রিল মাসে বায়ুর আর্দ্রতা কমিয়া যায়। গাঙ্গেয় অঞ্চলে বায়ুর আর্দ্রতা এই সময় গড়ে প্রায় ৩০ থাকে। নিম্নবঙ্গে বায়ুর সর্ব্বনিম্ন আর্দ্রতা ৫০ এবং সর্ব্বোচ্চ ৮০ হইয়া থাকে। বৃষ্টিপাতের সহিত বায়ুর তাপ ও আর্দ্রতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বায়ুর আর্দ্রতা কম হইলে উদ্ভিদের বৃদ্ধির পক্ষে প্রতিকূল হয়। এইরূপ অবস্থায় সেচ দিবার প্রয়োজন হয়। বায়ুর আর্দ্রতা বৃদ্ধি পাইলে বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টির জল পাইয়া উদ্ভিদ সতেজে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। স্থানীয় স্বাভাবিক উদ্ভিদের (natural vegetation) পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও জলবায়ু অনুযায়ী দেহকলার বিশেষ প্রকার গঠন হয়। ভিন্ন স্থানের ও ভিন্ন আবেষ্টনের উদ্ভিদ স্থানান্তরিত করিলে ভিন্ন প্রকৃতির আবহাওয়া ও বায়ুর আর্দ্রতা তাহাদের বৃদ্ধির পক্ষে অন্তরায় হয়।

ফসল ঋতু (Crop Seasons)—উদ্ভিদের জীবন স্থানীয় ঋতুর প্রভাবাধীন। সূর্য্য প্রদক্ষিণকালে পৃথিবীতে যে বিভিন্ন প্রকার অবস্থা প্রকাশ পায় সেইগুলি বিভিন্ন ঋতু। শীতপ্রধান দেশে উদ্ভিদের উপর ঋতু পরিবর্ত্তনের প্রভাব বিশেষ প্রকটিত হয়। শীতের প্রখরতার জন্য তৎকালে উদ্ভিদের বৃদ্ধি রুদ্ধ হইয়া যায়। শীতের প্রকোপ কমিলে বসন্ত ও শরৎকাল হইতে চাষ আবাদের সূত্রপাত হয় এবং গ্রীষ্মকালে উদ্ভিদ সতেজ হইয়া উঠে। ভারতবর্ষে এবং নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে

তাপমাত্রা কোন সময়ে খুব নিম্ন হয় না, এবং উহা উদ্ভিদের বৃদ্ধির পক্ষে কখনও অন্তরায় সৃষ্টি করে না। এইজন্য ভারতবর্ষে সকল ঋতুতে নানাবিধ উদ্ভিদ জন্মিয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশের মত অত্যাধিক তাপমাত্রা হ্রাসের জন্য ঋতুর বিরাট পরিবর্ত্তন হয় না। এদেশে ঋতুকালীন অবস্থা মৌসুমদ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। সারা বৎসর সকল ঋতুতে স্বাভাবিক উদ্ভিদ এবং আবাদী ফসল জন্মিয়া থাকে। এইজন্য শীতপ্রধান অঞ্চলের উদ্ভিদের মত শীতকালে এই স্থানের উদ্ভিদের পাতা ঝরিয়া যায় না। যেসব বৃক্ষের পাতা ঝরিয়া যায় তাহা গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপের প্রভাবে হইয়া থাকে এবং বৃক্ষের পত্রহীন অবস্থাও স্বল্পকাল স্থায়ী হয়।

সারা বৎসর উদ্ভিদ জন্মিতে পারে বলিয়া সব ঋতুতে একই ফসলের আবাদ করা যায় না। প্রত্যেক ফসল একটি নির্দ্দিষ্ট ঋতুতে সম্যক পরিপুষ্ট ও ফলপ্রসূ হয়। ভিন্ন ঋতুতে আবাদ করিলে সেইরূপ হয় না। কাহারও দীর্ঘকাল ধরিয়া অঙ্গজ বৃদ্ধি (Vegetative growth) হইতে থাকে, তুই একমাস বিলম্বে ফুল ফোটে, ফলন বিশেষ হ্রাস পায়। আবার কোন উদ্ভিদের বিপরীত অবস্থা ঘটে, অর্থাৎ সম্যক বৃদ্ধি পাইবার পূর্ব্বেই চারা অবস্থায় ফুল ফুটিয়া যায়। সুতরাং ফলন কিছুই হয় না। অসময়ে লাগাইলে ফসলে নানাপ্রকার রোগ ও কীটের আক্রমণ হয়। স্থানীয় জলবায়ু অনুসারে বিভিন্ন প্রকার আবাদী ফসলের বপন সময় বিভিন্ন হইয়া থাকে। এইজন্য স্থানীয় অভিজ্ঞতা হইতে বপন সময় নির্দ্ধারণ করিতে হয়।

ভারতবর্ষে ফসলঋতু প্রধানতঃ তুইটি—(১) দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমের সময়—জুন, জুলাই মাসে বীজ বপন করা হয় এবং নভেম্বর, ডিসেম্বর মাসে ফসল কাটা হয়। ইহাকে বর্ষাতি বা খরিফ ফসল বলা হয়। দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী অঞ্চলের ইহা প্রধান ফসলঋতু; (২) উত্তরপূর্ব্ব মৌসুমীবায়ু প্রভাবিত অঞ্চলে অক্টোবর মাসে বীজ বপন করা হয় এবং ফেব্রুয়ারি ও মার্চ্চ মাসে ফসল কাটা হয়।

ইহাকে রবি ফসল বা শীতকালীন ফসল বলা হয়। যেসব অঞ্চলে দুইটি মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয় সেইসব স্থানে দুইটি বর্ষাতি ফসলের আবাদ হয়। যেখানে একটি বর্ষাতি ফসল জন্মে সেখানে উদ্ভিদের বৃদ্ধিকাল অধিক এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া বৃষ্টি পায় বলিয়া ফলন অধিক হয়। কিন্তু যেখানে দুইটি বর্ষাতি ফসলের আবাদ করা হয় সেখানে উদ্ভিদের বৃদ্ধিকাল স্বল্প এবং অধিক দিন বৃষ্টির সুযোগ পায় না বলিয়া ফলন কম হয়। এইসব অঞ্চলে প্রথম বৃষ্টিপাতের সময় এপ্রেল, মে মাসে বীজ বপন করা হয় এবং আগস্ট, সেপ্টেম্বর মাসে ফসল কাটা হয়। আবার সেপ্টেম্বর মাসে আর একবার বীজ বপন করা হয় এবং ডিসেম্বর, জানুয়ারী মাসে ফসল কাটা হয়। খাল, বিলের ধারে অথবা যেখানে জল সঞ্চিত থাকে সেইসব স্থানে আরো একটি ফসলের আবাদ করা হয়। জলের ব্যবস্থা থাকিলে বৎসরে তিনটি ফসল উৎপাদন করা যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

মৃত্তিকা ; এঁটেল, পলি, বালি ও দোআঁশ মাটির ধর্ম্ম

(Soils, properties of clay, silt, sand and loam)

মৃত্তিকা (Soil)—নৈসর্গিক কারণে উৎপন্ন খনিজ পদার্থের সমষ্টিকে শিলা (rock) বলে। নানাপ্রকার প্রকৃতিক শক্তির প্রভাবে শিলা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়। শিলাচূর্ণের সহিত উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ পদার্থের মিশ্রণকে মৃত্তিকা বলে। পরীক্ষা করিলে দেখা যায় মাটি প্রধানতঃ চারিটি উপাদানের সংমিশ্রণ—(১) বালি (Sand), (২) এঁটেল (Clay), (৩) চূণ (Lime), (৪) হিউমাস্ (Humus)। প্রথম তিনটি উপাদান খনিজ (Minerals or inorganic) এবং চতুর্থটি জৈব পদার্থ (Organic)—মৃত উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর দেহ ও বিষ্ঠা প্রভৃতি পচিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। উক্ত সংমিশ্রণের সহিত সংখ্যাতীত জীবাণু থাকে।

পদার্থ মাত্রেরই দুই প্রকার ধর্ম্ম আছে—ভৌত ধর্ম্ম (Physical properties) এবং রাসায়নিক ধর্ম্ম (Chemical properties)।

বালিঃ ভৌতধর্ম্ম—বিশুদ্ধ বালি (pure sand) বর্ণহীন অথবা শ্বেত।

(১) সংশক্তি (Cohesion)—বালুকণা কোণাকৃতি (angular), আকারে বড় বলিয়া পরস্পর সংযুক্ত থাকে না (do not cohere)। মৃত্তিকায় বালি অধিক পরিমাণে থাকিলে মৃত্তিকার সংযোগশক্তি কমিয়া যায়। এই প্রকার মাটিকে হালকা মাটি (Light soil) বলে। এস্থলে হালকা অর্থে ভার (weight) নয়, কর্ষণ করা কম আয়াসসাধ্য বুঝায়।

(২) আপেক্ষিক ওজন (Relative weight) :—জল অপেক্ষা বালি ২.৫৬ গুণ ভারি।

(৩) সচ্ছিদ্রতা (Porosity) ঃ—বালি অতি দ্রুত জল শোষণ করে এবং কণাগুলির ফাঁকের ভিতর দিয়া জল সহজে প্রবাহিত হইয়া যায়। বালির সচ্ছিদ্রতা অধিক।

(৪) ধারণশক্তি (Retentivity) ঃ—বালির মধ্য দিয়া জল প্রবাহিত হইলে শতকরা ২৫ ভাগ মাত্র জল উহার মধ্যে ধৃত থাকে (retained)। বালির জলধারণ শক্তি অত্যন্ত কম (Low retentivity)।

(৫) কৈশিক আকর্ষণ (Capillarity) ঃ—বালুকণাগুলি পরস্পর সংলগ্ন থাকে না বলিয়া উহাদের মধ্যে বহু ফাঁক থাকে। ঐ ফাঁকগুলিকে Pore space বলে। ফাঁকগুলি মিলিয়া নালিকার সৃষ্টি করে, উহাকে কৈশিকনালী (Capillary tube) বলে। সূক্ষ্ম নালিকার মধ্য দিয়া তরল পদার্থের উর্দ্ধগতিকে বলে কৈশিক আকর্ষণ (Capillarity)। বালির মধ্যকার ফাঁকগুলি বড় বলিয়া কৈশিকনালিকার মধ্য দিয়া জলের উর্দ্ধগতি দ্রুত হয় কিন্তু ঐ গতি অধিক উচ্চগামী হয় না।

(৬) আপেক্ষিক তাপ (Specific Heat) ঃ—জল উত্তপ্ত হইতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়, বালি তদপেক্ষা কম তাপে উত্তপ্ত হয়। সুতরাং শীত ঋতুর অবসানে বালি শীঘ্র গরম হয়।

রাসায়নিক ধর্ম্ম ঃ—বিশুদ্ধ বালি কেলাসিত সিলিকা বা কোয়ার্জ চূর্ণ। (Quartz is the crystalline form of silica)। মাটিতে সাধারণতঃ যে অবস্থায় বালি পাওয়া যায় তাহা প্রধানতঃ সিলিকা হইলেও উহাতে নানাপ্রকার খনিজ উপাদান সংলগ্ন থাকে। ঐ উপাদানগুলি ক্রমে ক্রমে বিয়োজিত হইলে (on slow decomposition) সামান্য পটাশ, ফস্‌ফরিক্ অ্যাসিড প্রভৃতি পাওয়া যায়। সুতরাং মাটির বালি অংশে উদ্ভিদ খাদ্য যৎসামান্যই থাকে। কিন্তু খাদ্যের পরিমাণ কম থাকিলেও বালির ভৌতধর্ম্মের জন্য মাটির মধ্যে উহা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

এঁটেল (Clay) :—খাঁটি এঁটেল Hydrated silicate of alumina ($H_2O+Al_2O_3+SiO_2$)। ইহাতে উদ্ভিদ খাদ্য কিছুই নাই। ইহা কলয়েড পদার্থ (Colloid substance), আঠার মত চট্‌চটে। এঁটেল সর্ব্বপ্রকার মাটিতে অল্পাধিক থাকে। বিশুদ্ধ এঁটেল প্রকৃতিতে সাধারণতঃ থাকে না। Kaolin or china clay চিনামাটিতে কতকটা বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। গ্র্যানাইট প্রস্তর ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে উহার ফেলস্‌পার্ (Felsper) অংশ বিচূর্ণিত হইলে কেওলিন্, পটাশ, সোডিয়াম ও চূণ ঘটিত লবণ পাওয়া যায়। কিছু পরিমাণ পটাশ জলে দ্রবীত হইলেও এঁটেল মাটিতে প্রচুর পটাশ থাকিয়া যায়। কিন্তু (P_2O_5) ফস্‌ফরিক অ্যাসিড ও চূণ বিশেষ থাকে না। বিচূর্ণকালে গ্র্যানাইটের কোয়ার্জ সূক্ষ্ম বালুতে পরিণত হইয়া এঁটেলের সহিত মিশ্রিত হয়। এঁটেল মাটিতে হিউমাসও থাকে। সুতরাং মাটির মধ্যে এঁটেল যে অবস্থায় পাওয়া যায় তাহার সহিত বহুপ্রকার পদার্থ মিশ্রিত থাকে। ঐগুলির মধ্যে কতকগুলি উদ্ভিদের অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য। ঐ মিশ্রণ পদার্থগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) অতি সূক্ষ্ম সিলিকা (SiO_2) অর্থাৎ বালি, (২) আয়রন্ অক্সাইড (F_eO_3) এবং (৩) Na, K, Ca ও Mg। এইগুলির মধ্যে পটাশ উদ্ভিদের খাদ্য হিসাবে অতি মূল্যবান। এইজন্য এঁটেল মাটিতে (Clay soil) পটাশের কখনও অভাব হয় না। এঁটেল মাটিতে শতকরা ১ ভাগ, কখনও কখনও অধিক পটাশ পাওয়া যায়। হাল্‌কা মাটিতে (Light soil) পটাশ কম থাকে।

ভৌতধর্ম্ম :—(১) সংসক্তি—এঁটেল কণাগুলি এত সূক্ষ্ম যে জলে সিক্ত হইলেই উহারা পরস্পর দৃঢ়সংযুক্ত হইয়া যায়। ঐ অবস্থায় উহাকে নাড়িলে কণাগুলির ফাঁকের মধ্যস্থ বায়ু নির্গত হইয়া ঐ শূন্যস্থান জলে পূর্ণ হইয়া যায়, তাহার ফলে কণাগুলির সংযোগ দৃঢ়তর হয়। এই অবস্থাকে বলে Puddled। বর্ষাকালে আমন ধানের জমিতে কাদা করিয়া যে চাষ দেওয়া হয় তাহাতে মাটির ঐরূপ

অবস্থা হয় অর্থাৎ মৃত্তিকার মধ্যে অধিক পরিমাণে জল প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। এঁটেল মাটির সংসক্তি অত্যধিক বলিয়া চাষ করিতে অধিক শ্রমের প্রয়োজন হয়। এই প্রকার মাটিকে ভারি মাটি (Heavy soil) বলে। চূণ প্রয়োগ করিলে এইপ্রকার মাটির সংসক্তি কমিয়া যায়।

(২) ওজন :—এঁটেল চূণ অপেক্ষা সামান্য ভারি এবং বালি অপেক্ষা হাল্কা।

(৩) সচ্ছিদ্রতা :—এঁটেল মাটিতে জল পড়িলে প্রথমে উপরিভাগ puddled হইয়া যায় সুতরাং মাটির নীচে জল প্রবেশের পক্ষে বাধা জন্মে, জল অতি ধীরে ধীরে প্রবেশ করে।

(৪) জলধারণ শক্তি :—ইহার ওজনের অনুপাতে $\frac{৩}{৪}$ ভাগ অর্থাৎ শতকরা ৭৫ ভাগ জল ধারণ করিয়া রাখে। এঁটেলের জলধারণ শক্তি খুব বেশী (Highly retentive of water)।

(৫) কৈশিক আকর্ষণ :—এঁটেলের কণাগুলি খুব সূক্ষ্ম হইবার কারণে উহার কৈশিক নালীগুলি সূক্ষ্ম হয়। সেইজন্য ঐগুলির ভিতর দিয়া জল অতি ধীরে ধীরে উপরে উঠে। গতি ধীর হইলেও বহুদূর উর্দ্ধে উঠিয়া যায়।

(৬) আপেক্ষিক তাপ :—অধিক জল ধারণ করে বলিয়া এঁটেল মাটি উত্তপ্ত হইতে বিলম্ব হয়। এইজন্য ইহাকে Late soil বলা হয়।

(৭) আর্দ্রতাগ্রাহী (Hygroscopic) :—এঁটেলের একটি বিশেষ গুণ ইহা জলীয় বাষ্প, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি শোষণ করিয়া লইতে পারে। বালি কিম্বা চূণের এই গুণ নাই। এঁটেলের এইরূপ শোষণ শক্তি থাকার জন্য জৈব সারের মধ্যস্থ নাইট্রোজেন, অ্যামোনীয় গ্যাস এবং অ্যামোনিয়া ঘটিত লবণ মাটিতে প্রয়োগ করিলে মাটির মধ্যে স্থিতিলাভ করে (fixed in the soil), জলের সহিত মাটি হইতে নিক্রান্ত হইয়া যাইতে পারে না। P_2O_5 এবং K প্রায় সম্পূর্ণ আবদ্ধ

হইয়া থাকে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে চূর্ণ এঁটেল মাটি শুষ্ক করিয়া খুব পাতলা ভাবে বিছাইয়া রাখিবার তিন দিন পরে উহার ওজনের শতকরা ৫ ভাগ পরিমাণ জল বায়ু হইতে শোষণ করিয়াছে।

এঁটেল মাটিতে হিউমাস এবং aluminium silicate অধিক পরিমাণে থাকায় সূর্য্য তাপে ঐগুলি শুকাইয়া যাইলে মাটির সংকোচন ঘটে, ফলে মাটি কঠিন হইয়া যায়, অধিক শুকাইলে মাটি ফাটিয়া যায়।

এঁটেল মাটির স্থূল এঁটেল কণাগুলি কলয়েড ধর্ম্ম সম্পন্ন বলিয়া উহাদের Soil colloid বলে। কলয়েড মৃত্তিকা কণাগুলিকে পরস্পর দৃঢ় সংযুক্ত করিয়া রাখে এবং উহাতে চটচটে (Stickiness), সংশক্তি (cohesion) এবং নমনীয়তা (plasticity) প্রভৃতি ধর্ম্ম আরোপ করে।

পলি (Silt)

শৈলচূর্ণ বৃষ্টি ও নদীস্রোতে বাহিত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিয় যায়। স্রোতের বেগ যত মন্দীভূত হইয়া আসে শৈলচূর্ণগুলি ক্রমান্বয়ে নীচে পড়িয়া যাইতে থাকে। প্রথমে প্রস্তরখণ্ড (Gravel), তারপর মোটা বালু (Coarse sand), তারপর সূক্ষ্ম বালু (fine sand), তারপর তদপেক্ষা সূক্ষ্ম পলি (Silt) পড়িতে থাকে। স্রোতবেগ নিশ্চল হইলে সূক্ষ্মতম এঁটেলকণা (clay particles) থিতাইয়া নীচে পড়ে। উহাদের সহিত প্রচুর উদ্ভিজ্জ হিউমাস্ মিশিয়া থাকে। এইরূপে ক্রমান্বয়ে নূতন নূতন স্তর জমিয়া যে মৃত্তিকা গঠিত হয় তাহাকে alluvial soil বা alluvium বলে। পলির কণাগুলি বালুকণা অপেক্ষা সূক্ষ্ম কিন্তু এঁটেলের মত তত সূক্ষ্ম নয়। পলি ও কলয়ড। জলের সংস্পর্শে এঁটেলের মত চটচটে হইয়া যায়।

আকার অনুযায়ী শৈলচূর্ণগুলির শ্রেণী বিভাগ করা হয়। উহাদের আকৃতির পরিমাপের জন্য বিজ্ঞানীগণ একটি আন্তর্জাতিক মাপ (International scale) নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। পর পৃষ্ঠায় উহা প্রদত্ত হইল ঃ

	পরিধি (Diameters) মিলিমিটারে
(Coarse sand) মোটা বলি ...	২—০˙২
(Fine sand) সূক্ষ্ম বালি ...	০˙২—০˙০২
(Silt) পলি	˙০২—˙০০২
(Clay) এঁটেল	˙০০২ অপেক্ষা কম।

মাটির মধ্যে উক্ত বিভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট কণাগুলির পরিমাণ অনুসারে মাটির শ্রেণী বিভাগ করা হয়। মাটিতে শতকরা ৬০ ভাগের বেশী বালুকণা থাকিলে বালুমাটি (Sandy soil), শতকরা ৭০—৮৫ ভাগ এঁটেল (Clay) এবং ৩০ ভাগের কম বালি থাকিলে এঁটেল দোআঁশ (Clayey loam) এবং এঁটেলের পরিমাণ তদপেক্ষা বেশী থাকিলে কঠিন এঁটেল মাটি (Stiff clay) বলে।

দোআঁশ (Loan)

এঁটেল মাটি ও বালি মাটির মধ্যবর্ত্তী অবস্থার মাটিকে দোআঁশ মাটি (Loams or Loamy soils) বলে। এই প্রকার মাটিতে শতকরা ৩০—৬০ ভাগ বালি থাকে। দোআঁশ মাটি জল নিষ্ক্রমণ (drainage), জলধারণ (moisture holding capacity) এবং জল সংরক্ষণ (retentiveness) প্রভৃতি ধর্ম্ম বিশিষ্ট হয়। অর্থাৎ উহার ধর্ম্ম এঁটেল ও বালি মাটির মধ্যবর্ত্তী অবস্থাবিশিষ্ট হয়। এইরূপ মাটি সকল প্রকার কর্ষণ কার্য্যের (tillage operations) উপযোগী এবং প্রায় সবরকম ফসল ইহাতে উৎপাদন করা যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

মাটির উর্ব্বরতা (Soil fertility)

মাটির মধ্যে প্রচুর উদ্ভিদ খাদ্য থাকিলেই উহাকে উর্ব্বর বলা যায়না। সচরাচর এঁটেল মাটিতে (Clay soils) যৌগ নাইট্রোজেন (Nitrogen compounds) এবং পটাশ প্রচুর থাকে, ফস্‌ফরিক অ্যাসিডেরও বিশেষ অভাব থাকে না, কিন্তু মৃত্তিকাকণাগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট থাকায় মাটির মধ্যে জল ও বায়ু সহজে প্রবেশ করিতে পারে না সুতরাং ফসল ভালরূপ জন্মিতে পারে না। কোন কোন হাল্‌কা মাটিতে (Light soil) যথেষ্ট উদ্ভিদ খাদ্য থাকিলেও ঐ প্রকার মাটির স্বাভাবিক সচ্ছিদ্রতার জন্য উহা হইতে শীঘ্র জল বাহির হইয়া যায় সুতরাং মাটি শীঘ্র শুকাইয়া যায়। এই প্রকার মাটি কেবল মাত্র বর্ষা ঋতুতে জল পাইয়া ফসল প্রদান করে। অধিকাংশ নিরেস মাটিতে (poor soil) প্রচুর পরিমাণে কেবলমাত্র সার প্রয়োগ করিয়া উদ্ভিদের বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ উন্নতি সাধন করা যায় না। খাদ্য সরবরাহ ব্যতীত অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা দূর না করিলে ঐ জমি হইতে পর্য্যাপ্ত ফসল উৎপাদিত হয় না। ঐরূপ প্রতিবন্ধকতাকে বলে Limiting factor। বোঁদ মাটিতে (Peaty bog) প্রচুর জৈব পদার্থ ও নাইট্রোজেন থাকে। অধিক পরিমাণে জৈব পদার্থ পচিয়া মাটি অম্ল হইয়া অনুর্ব্বর (infertile) হইয়া যায়। মাটি অম্ল হইলে তাহার মধ্যে (Nitrogen fixing and Nitrifying bacterias) নাইট্রোজেন সংযোগকারী এবং নাইট্রোজেন-কারী ব্যাক্‌টিরিয়াগুলি জন্মে না। খনিজ খদ্যোপাদানগুলির (mineral plant foods) ও অভাব হয় এবং মাটির অভ্যন্তরে বায়ু ও জল প্রবেশ করিতে পারে না। আবার মাটির মধ্যে প্রচুর খাদ্যোপাদান থাকিলেও সেইগুলি যদি উদ্ভিদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য অবস্থায় (in available form) না থাকে, তাহা হইলে উহাদের স্বার্থকতা থাকে না।

আবার খাদ্যোপাদানগুলির মধ্যে একটি মাত্র কম থাকিলে অপরগুলির প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও উহা পূর্ণ উৎপাদনের পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করে। যেমন কোন জমিতে ৩৫ মণ ফসল উৎপাদনের উপযোগী পটাশ, ফস্‌ফরাস প্রভৃতি বর্ত্তমান কিন্তু মাত্র ১৫ মণ ফসল উৎপাদনের উপযোগী নাইট্রোজেন আছে ঐরূপ অবস্থায় ১৫ মণের অধিক ফসল কিছুতেই জন্মিবে না। একটিমাত্র উপাদানের ঘাট্‌তির জন্য উৎপাদন হ্রাস পাওয়াকে বলে Law of minimum।

সুতারং খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য অনেকগুলি বিষয়ের সহিত মাটির উর্ব্বরতা বিজড়িত। এইগুলির মধ্যে প্রধানতঃ মাটির ভৌম অবস্থা (Physical conditions)। মাটির ভৌম প্রকৃতি অনুযায়ী মাটির অভ্যন্তরে জল ও বায়ুর অবস্থিতি নির্ভর করে এবং মাটির মধ্যে জৈবনিক ক্রিয়া (Biological activities) মাটির উর্ব্বরতার পক্ষে অপরিহার্য্য। মৃত্তিকার উর্ব্বরতা খাদ্যের প্রাচুর্য্য অপেক্ষা ঐগুলির উপর সবিশেষ নির্ভর করে।

উদ্ভিদের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য মাটির মধ্যে পরিমিত জল ও বায়ুর একান্ত প্রয়োজন। উদ্ভিদদেহ গঠনের জন্য উহার দেহের শুষ্ক পদার্থের (dry matter) অনুপাতে শত শতগুণ জলের প্রয়োজন হয়। প্রস্বেদনে প্রচুর জল মোক্ষণ হয় এবং মাটির মধ্যে খাদ্য দ্রবীত হইবার জন্য জল অত্যাবশ্যক।

মূলের শ্বাসকার্য্যের জন্য মাটির অভ্যন্তরে oxygen এর প্রয়োজন। oxygen এর অভাব ঘটিলে মূল বৃদ্ধি পায় না। মাটির মধ্যে যে স্থানে বায়ু থাকে কেবল সেই স্থানে মূল আবদ্ধ হইয়া যায়, উহার বাহিরে বিস্তার লাভ করে না। মাটির মধ্যে অতিরিক্ত জল সঞ্চিত হইলে মাটির অভ্যন্তরের বায়ু নির্গত হইয়া যায় এবং বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং মাটির ভৌম অবস্থা মাটির মধ্যে জল ও বায়ুর অবস্থিতির পক্ষে অনুকূল হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

সাধারণতঃ স্থানান্তরিত মৃত্তিকার (Transported) কণাগুলি সম

আকৃতিবিশিষ্ট (uniform) ও সূক্ষ্মভাবে সজ্জিত থাকে। উহারা এঁটেল কণা অপেক্ষা বড় হওয়ায় কৈশিক আকর্ষণে জলের গতি উহাদের মধ্যে সহজ হয় এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে জল চুয়াইয়া আসে। এই প্রকার মাটিতে যথেষ্ট জৈবপদার্থ থাকে। পর্য্যাপ্ত হিউমাস, জল ও বায়ু থাকায় জৈবনিক ক্রিয়া অবাধে চলিতে থাকে। এইরূপ মাটিতে ফসল অধিক পরিমাণে জন্মে। সুতরাং যে মাটিতে উদ্ভিদ খাদ্য সহজলভ্য অবস্থায় (available form) থাকে এবং উহার ভৌম অবস্থা উদ্ভিদ বৃদ্ধির অনুকূল হয় সেই প্রকার মাটি উর্ব্বর বলিয়া পরিগণিত হয়।

উদ্ভিদের প্রধান খাদ্যোপাদান এবং উদ্ভিদ ও মৃত্তিকায় উহাদের প্রভাব (Major plant nutrients and their effects on soil and crop)

পৃথিবীর উপাদানে আছে প্রায় ১০০টি মৌলিক পদার্থ। উদ্ভিদের অঙ্গ গঠন ও খাদ্য প্রস্তুতের জন্য উহাদের মধ্যে অনেকগুলির প্রয়োজন হয়। জগতে একমাত্র উদ্ভিদই মৌলিক পদার্থের সংযোগ সাধন করিয়া নিজ খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে, অন্য কোন প্রাণী ঐরূপ করিতে পারে না। উদ্ভিদ দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে গ্রহণ করিয়া অন্যান্য প্রাণী জীবনধারণ করে। উদ্ভিদের কতকগুলি মৌলিক পদার্থ অধিক পরিমাণে এবং কতকগুলি অল্প পরিমাণে প্রয়োজন হয়। অত্যাবশ্যকীয় উপাদানগুলির মধ্যে কার্ব্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। উদ্ভিদ জল ও বায়ু হইতে এইগুলি লইয়া থাকে। অন্যান্য উপাদান মাটি হইতে লয়। উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য খাদ্যোপাদানগুলিকে প্রয়োজনের অনুপাতে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ঃ—

(১) প্রধান খাদ্যোপাদান (Major plant food elements)

(২) মাধ্যমিক খাদ্যোপাদান (Secondary plant food elements)

(৩) সামান্য খাদ্যোপাদান (Trace elements)

প্রধান খাদ্যোপাদান—নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস্ এবং পটাশ্।

মাধ্যমিক খাদ্যোপাদান—ক্যাল্‌সিয়ান্, ম্যাগনেসিয়াম্ এবং সাল্‌ফার।

সামান্য খাদ্যোপাদান—লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, তামা, জিঙ্ক, মলিবডেনাম, কোবল্ট, বোরোন্, আইওডিন্ প্রভৃতি।

এই উপাদানগুলি বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে থাকে। আবার উদ্ভিদের বিভিন্ন অবস্থায় এবং বিভিন্ন অঙ্গে বিভিন্ন পরিমাণে থাকে। সাধারণতঃ বীজের মধ্যে লাইম্ বা চূণ ও ফস্‌ফরিক অ্যাসিড, কাণ্ড, ডালপালা ও পাতায় পটাশ ও সিলিকা—খড় ও ঘাসে সিলিকা বেশী থাকে এবং কাষ্ঠল অংশে পটাশ ও কার্ব্বন অধিক পরিমাণে থাকে। উদ্ভিদ দেহে অন্যান্য খনিজ পদার্থের অনুপাতে লাইম, পটাশ এবং ফস্‌ফেট অধিক পরিমাণে থাকে। ফলবৃক্ষের পটাশ এবং ফসফরাসের প্রয়োজন অধিক হয় এবং উহাতে ম্যাগনেসিয়াম, আয়রণ অক্সাইড এবং হাইড্রোক্লোরিক ও সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড ঘটিত লবণ সামান্য পরিমাণে থাকে।

প্রধান ও মাধ্যমিক উপাদানগুলি অপেক্ষা সামান্য উপাদানগুলির প্রয়োজনীয়তা আদৌ হেয় নয়। বহু ক্ষেত্রে একটিমাত্র সামান্য উপাদানের অভাব উদ্ভিদের বৃদ্ধির পক্ষে প্রতিবন্ধক স্বরূপ (limiting factor) হয়। আবার কোন কোন উদ্ভিদের কোন একটি সামান্য উপাদানের বিশেষ প্রয়োজন হয়, যেমন নারিকেল, পালম শাক, বীট, ওলকপি, বাঁধাকপি, পুঁইশাক প্রভৃতি অধিক পরিমাণে সোডিয়াম গ্রহণ করে।

উদ্ভিদখাদ্যের অত্যাবশ্যকীয় উপাদানগুলির মধ্যে নাইট্রোজেন, পটাশ এবং ফস্‌ফরিক অ্যাসিড প্রধান। উদ্ভিদের এইগুলি ব্যতীত অন্যান্য খনিজ উপাদানগুলির খুব সামান্য প্রয়োজন হয়। মাটিতে ঐ উপাদানগুলি যে পরিমাণে থাকে তাহাতে সাধারণতঃ উহাদের অভাব ঘটে না। সিলিকা সব মাটিতে থাকে, বিশেষ বালি মাটিতে অপর্য্যাপ্ত থাকে

কারণ বিশুদ্ধ বালিই সিলিকা। ভারতবর্ষের মাটিতে সচরাচর চূণের অভাব দেখা যায় না।

প্রধান উপাদানগুলির ক্রিয়া

নাইট্রোজেন—উক্ত তিনটি উপাদানের মধ্যে নাইট্রোজেনের ক্রিয়া অতি দ্রুত প্রকাশ পায়। উদ্ভিদ কোষের ইহা বিশিষ্ট উপাদান। উদ্ভিদের অঙ্গ সরস করিয়া উহার বৃদ্ধি সাধন করে, এবং পাতায় গাঢ় সবুজ ,বর্ণ প্রদান করে। ধান, গম প্রভৃতি শস্যের দানার (grains) আকার এবং তন্মধ্যে প্রোটিন বৃদ্ধি করে। অপরাপর খাদ্য উপাদানসমূহ যথা ফসফরাস, পটাসিয়াম, ক্যাল্‌সিয়াম প্রভৃতির শোষণ ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে।

নাইট্রোজেনের অভাব ঘটিলে উদ্ভিদের বর্ণ ফিকা অথবা হাল্‌কা হলুদ বর্ণ হয় এবং উহার বৃদ্ধি রহিত হইয়া যায়। মূল বৃদ্ধি পায় না, সরু ও গুচ্ছাকার হইয়া যায়। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই ফসল পাকিয়া যায়। সুতরাং উৎপাদন কম হয়। ফসলের শস্য বা শাঁসভাগ (Kernel) কমিয়া যায়, বীজ স্বাভাবিক আকারের না হইয়া ছোট হয় অথবা সঙ্কুচিত (Shrivelled) ও হাল্‌কা হয়। ফলবৃক্ষের পাতা শীঘ্র ঝরিয়া যায় এবং ফলের বর্ণ অস্বাভাবিক (unusual colour) হয়।

মাটিতে নাইট্রোজেন অতিরিক্ত হইলে উদ্ভিদ গাঢ় সবুজ বর্ণ (dark green) ধারণ করে। ধান, গম প্রভৃতি ফসলের গাছগুলি অত্যাধিক বৃদ্ধি হেতু হেলিয়া পড়ে (lodge) এবং পরিপুষ্ট হইতে বিলম্ব হয়। শীষের মধ্যে নরম অল্পসংখ্যক ফল হয়। শাকসব্‌জির সংরক্ষণ ক্ষমতা (keeping quality) হ্রাস পায়। উদ্ভিদে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে ফস্‌ফরাসের পরিমাণ কমিয়া যায়। ঘাস ও শাক্‌সব্‌জির মধ্যে নাইট্রেট অধিক থাকিলে পশু ও মানুষের খাদ্য হিসাবে ক্ষতিকর হইতে পারে।

ফস্‌ফরাস—মাটির জৈবাংশে কিছু ফস্‌ফরাস থাকে এবং অজৈব ভাগে ক্যাল্‌সিয়াম্‌, লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাঙ্গানিস্‌ ফস্‌ফেটরূপে থাকে। ফস্‌ফরাস্‌ বিহনে কোন প্রাণী জীবিত থাকিতে পারে না। প্রোটিন প্রস্তুতের জন্য নাইট্রোজেন এবং ফস্‌ফরাস প্রয়োজন। ফস্‌ফরাসের অভাবে উদ্ভিদকোষের বিভাজন (cell division), স্নেহ গঠন (fat formation), শ্বেতসার শর্করায় পরিবর্ত্তন (conversion of starch into sugar) প্রভৃতি নিষ্পন্ন হয় না। উদ্ভিদের মূল বৃদ্ধি, (root developement) বীজ গঠন (seed formation) এবং ফুল ও ফল উৎপাদনের জন্য পর্য্যাপ্ত ফস্‌ফরাস প্রয়োজন। শস্য ও খড়ের অনুপাত এবং শস্যের পরিমাণ ফস্‌ফরাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহা খড়কে দৃঢ় করে, হেলিয়া পড়িতে দেয় না, এবং শস্যের পরিপুষ্টি সাধন করে। ইহার প্রভাবে শীষ শীঘ্র নির্গত হয়। ফসলের গুণের উৎকর্ষ বিধান করে। বিশেষ করিয়া শাকসব্‌জি সুস্বাদু হয়। চারার মূল বৃদ্ধি ও পত্রোদ্গম ত্বরান্বিত করিয়া চারাকে অতি শীঘ্র রোপণের উপযোগী করিয়া দেয়। অতিরিক্ত নাইট্রোজেনের প্রতিক্রিয়া দূর করে এবং মাটিতে অধিক চূণ থাকিলে উহার অনিষ্টকারিতা নাশ করে। বৃক্ষের পল্লব অধিক সংখ্যায় নির্গত হয় এবং মূল বৃদ্ধি পায়। বীজ ও শস্য (Seeds or grains) উৎপাদনের জন্য ফস্‌ফরাস অত্যাবশ্যক। বিশেষ করিয়া কন্দ ফসলের (root crops) পরিপুষ্টি ও বৃদ্ধির পক্ষে ফস্‌ফরাস অপরিহার্য্য। শিম্বি গোত্রীয় ফসলে (Leguminous crops) ইহার ক্রিয়া সবিশেষ প্রকটিত হয়। ফস্‌ফরাস থাকিলে মৃত্তিকার ব্যাক্‌টিরিয়াগুলি খুব শীঘ্র বৃদ্ধি পায় এবং মূলে অধিক সংখ্যক অর্বুদ (nodules) গঠন করে।

মৃত্তিকায় ফস্‌ফরাসের অভাব হইলে গাছের তেজ কমিয়া যায়, পাতা ধূমল বর্ণের হইয়া যায় (purplish), ফলের আকার ক্ষুদ্র হয় এবং ফলন কমিয়া যায়। শস্যজাতীয় উদ্ভিদের (Cereals) পাতা ঘন সবুজ বর্ণ ও গাছ সতেজ হইলেও উহাদের গোড়া হইতে ফেঁক্‌ড়ি

বিশেষ বাহির হয় না (tillering) অর্থাৎ গুছি ছাড়ে না। জমিতে নাইট্রোজেনের অভাবের মত ফস্‌ফরাসের অভাব সহজে বুঝা যায় না।

পটাশ—উদ্ভিদের সালোক সংশ্লেষের জন্য (Photosynthesis) পটাশিয়ামের প্রয়োজন হয়। কার্ব্বনডাইঅক্সাইড এবং হাইড্রোজেন সংযোগে শর্করা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ইহার প্রয়োজন অপরিহার্য্য। ইক্ষু, আলু প্রভৃতি শর্করা ও শ্বেতসার প্রধান ফসলের পটাশের অধিক প্রয়োজন হয়। ক্লোরোফিল্ গঠনের জন্যও ইহা আবশ্যক। পটাশ, ধান্য প্রভৃতি ফসলের (cereals) খড় শক্ত করে, গাছকে দীর্ঘকাল সবুজ ও সতেজ রাখে, উদ্ভিদের স্বাস্থ্য ও তেজ বৃদ্ধি করে, প্রতিকূল আবহাওয়ার প্রভাব হইতে রক্ষা করে, রোগ ও কীট আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তি প্রদান করে, অত্যধিক নাইটোজেনের প্রভাব হ্রাস করে (Slows down) এবং অতিরিক্ত ফসফরাসের প্রভাবজনিত অগ্রিম পরিপক্কতা (early maturity) প্রতিরোধ করে। বিশেষ করিয়া তামাক, আলু, আখ, কার্পাস, শাক-সবজি, ফল প্রভৃতি উন্নত গুণসম্পন্ন করে। শস্য ও ফলের সদ্‌গুণ বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিমাণে পটাশের প্রয়োজন হয়।

পটাশের স্বল্পতা হইলে chlorosis দেখা দেয় অর্থাৎ ক্লোরোফিল জন্মে না, তাহার ফলে পাতা সাদা অথবা পীতাভ হইয়া যায় এবং ফল বৃক্ষের পাতা কুঁকড়াইয়া ঝলসিয়া যায় (Leaf scorch) এবং পল্লবের অগ্রভাগ (tips of shoots) শুকাইয়া মরিয়া যায়—(dying back), ফল খুব ক্ষুদ্র অবস্থায় ঝরিয়া যায়। মাটিতে পটাশের আধিক্য হইলে অধিকাংশ ফসলের পক্ষে ক্ষতিকর হয় না।

নিম্নোক্তপ্রকার **মাটিতে নাইট্রোজেনের অভাব থাকে**:—

(ক) লালচে অথবা পাংশুবর্ণ (ashy grey),

(খ) বালি প্রধান,

(গ) যাহাতে জৈব পদার্থ বিশেষ কম,

(ঘ) অতিরিক্ত অম্লযুক্ত।

নিম্নোক্ত কারণে নাইট্রোজেনের অভাব হয়ঃ—

(ক) উপরস্তরের মাটির ক্ষয় হইলে,

(খ) নিয়মিত সবুজ সার অথবা জৈবপদার্থ প্রয়োগ না করিলে,

(গ) মাটির উপরের উদ্ভিদ নিয়মিত পুড়াইয়া ফেলিলে।

মাটিতে নাইট্রোজেনের অভাব হইলে উদ্ভিদ (ক) খর্ব্বাকৃতি হয়, (Stunted growth) বাড়ে না, (খ) পাতা ফিকা সবুজ (Pale green) অথবা হলুদে (yellowish) হয়, (গ) শস্য অপরিণত অবস্থায় পাকিয়া যায় (ঘ) এবং গাছের পাতা অকালে ঝরিয়া যায়।

মাটিতে ফস্‌ফেটের অভাব

লাল, লাল্‌চে বাদামী অথবা শ্বেতপাংশু (whitish grey) মাটিতে ফস্‌ফেটের অভাব থাকে। যেসব জমিতে ফস্‌ফেটের অভাব থাকে তাহার—

(ক) মৃত্তিকাকণাগুলি অতি সূক্ষ্ম অর্থাৎ এঁটেল ভাবাপন্ন (clayish) হয়,

(খ) জৈবপদার্থ অল্প থাকে,

(গ) মাটি অতিরিক্ত অম্লযুক্ত হয়,

(ঘ) ফসল গাছের (crop plants), বিশেষ ক্ষুদ্রশস্য জাতীয় উদ্ভিদের বৃদ্ধি সাধারণভাবে ভাল হইলেও শস্য উৎপাদন অল্প হয় এবং শস্যের অনুপাতে খড় অধিক জন্মে,

(ঙ) নাইট্রোজেন ও পটাশ সার প্রয়োগ করিলেও গাছের বৃদ্ধি হয় না, খর্ব্বাকৃতি থাকিয়া যায়,

(চ) গাছের পাতা লাল্‌চে বর্ণের (Purplish colour) হয় এবং মূলের প্রসার হয় না।

নিম্নোক্তপ্রকার **মাটিতে পটাশের অভাব থাকে**ঃ—

(ক) লালবর্ণ মাটি,

(খ) অধিক বালিময় মাটি,

(গ) বোঁদ মাটি (Peaty soil),

(গ) চূণা মাটি (Calcarious soil)।

উক্তপ্রকার মাটীতে পটাশের অভাবজনিত লক্ষণসমূহ উদ্ভিদে পরিস্ফুট হয়।

মাটিতে যথেষ্ট জৈবপদার্থ থাকিলে পর্য্যাপ্ত নাইট্রোজেন থাকে।

মাটিতে অধিক নাইট্রোজেন থাকিলে :—

(ক) শস্যের গাছগুলি ধীরে, ধীরে পরিপুষ্টি লাভ করে,

(খ) পাতা গাঢ় সবুজবর্ণ হয়,

(গ) গাছের বৃদ্ধি দ্রুত হয়,

(ঘ) শস্যগাছ বিশেষ ক্ষুদ্রশস্য জাতীয় গাছগুলি বিশেষভাবে হেলিয়া পড়ে (badly lodge)।

মাটিতে পর্য্যাপ্ত ফস্‌ফেট থাকিলে :—

(ক) অধিক সংখ্যায় বলিষ্ঠ মূল প্রসার লাভ করে,

(খ) গাছ যথাসময়ে পরিপুষ্ট হয়,

(গ) খড় ও শস্যের অনুপাত স্বাভাবিক হয়,

(ঙ) গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়।

মাটিতে পর্য্যাপ্ত পটাশ থাকিলে :—

(ক) ফসল বৃক্ষের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়,

(খ) মূলের প্রসার ভাল হয়,

(গ) কাণ্ড, ডালপালা শক্ত ও বলিষ্ঠ হয়,

(ঘ) গাছ সতেজ হয়,

(চ) গাছে পটাশের অভাবজনিত কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না।

উদ্ভিদের বিশিষ্টলক্ষণগুলি দেখিয়া মাটিতে বিশেষ খাদ্যোপাদানের অভাব বুঝা যায়।

পাতা ভালরূপে না গজাইলে এবং পাতার রং হল্‌দে হইলে— মাটিতে নাইট্রোজেনের অভাব বুঝায়।

পাতা ধূসর বর্ণের (Greyish) দেখাইলে—মাটিতে পটাশ ও ফস্‌ফেটের অভাব বুঝায়।

পাতা অপরিণত অবস্থায় মরিয়া যাইলে—নাইট্রোজেন, পটাশ অথবা ফস্‌ফেটের অভাব বুঝায়।

পাতা ঝল্‌সান (Scorched) দেখাইলে—মাটিতে চূণের আধিক্য বুঝায়।

পাতা গাঢ়বর্ণ ও সঙ্কুচিত (Curling) দেখাইলে—মাটিতে চূণের অভাব নির্দ্দেশ করে।

পাতার সমুদয় অংশ সবুজ না হইলে—মাটিতে পটাশের অভাব থাকে।

পটাশের অভাবে ফলের আকৃতি বিশেষ টোমাটে অসমান হয়। নাইট্রোজেনের অভাব হইলে ফল ঝল্‌সান দেখায়। ফস্‌ফেটের অভাব অথবা নাইটোজেনের আধিক্য হইলে শস্যের দানা (grains), শুঁটি (pods) এবং কন্দ বিলম্বে পরিপক্ক হয়। মাটিতে প্রয়োজনীয় পটাশ না থাকিলে ফল পাকে না। মাটিতে চূণ অথবা ফস্‌ফেট অথবা উভয়ের অভাব হইলে মূল ক্ষুদ্রাকার হয় (Stunted roots), বাড়ে না।

মাটির মধ্যে জৈবপদার্থের গুরুত্ব

(Importance of soil organic matter)

মৃত উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর দেহ এবং বিষ্ঠা প্রভৃতি পচিয়া গাঢ় বাদামী রংএর স্পঞ্জের মত যে পদার্থে পরিণত হয় (dark brown spongy substance) তাহাকে হিউমাস্‌ বলে। শৈলচূর্ণের ফাঁকের মধ্যে হিউমাস থাকে। শৈলচূর্ণ যত ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয় ততই ফাঁকের সংখ্যা বাড়িয়া যায় এবং তাহাদের মধ্যে হিউমাস ততই অধিক প্রবেশ করে। হিউমাস স্পঞ্জ সদৃশ হওয়ায় মৃত্তিকাকণাগুলিকে ধরিয়া রাখে। শৈলচূর্ণের সহিত হিউমাস যতই মিশিতে থাকে ততই উহারা হাল্‌কা হইয়া যায়। বালির ভিতর দিয়া জল সহজে প্রবাহিত হয়।

হিউমাসের মধ্য দিয়া জল অনুরূপভাবে প্রবাহিত হয়। উহার জল-ধারণ শক্তিও খুব বেশী, উহার ওজনের দেড়গুণ জল ধরিয়া রাখিতে পারে। হিউমাসের মধ্যে জল অতি দ্রুতবেগে এবং বহু উচ্চে উঠিতে পারে। গাঢ় বর্ণের জন্য হিউমাস তাপ শোষণ করিতে পারে। এঁটেল মাটির দ্বিগুণ পরিমাণ জলীয় বাষ্প শোষণ করে। এই সকল ভৌতধর্ম্ম থাকার জন্য হিউমাস এঁটেল মাটিকে হাল্‌কা ও নরম করিয়া কর্ষণের পক্ষে সহজসাধ্য করিয়া দেয় এবং হাল্‌কা মাটির কণাগুলিকে সংযুক্ত করিয়া জল শোষণ, ধারণ ও সংরক্ষণ শক্তিসম্পন্ন এবং জলের উর্দ্ধগতি বৃদ্ধি করে। হিউমাস থাকিলে মাটির মধ্যে জৈবনিক ক্রিয়া বৃদ্ধি পায় এবং উহা নাইট্রেটে পরিণত হয়। সাধারণতঃ মাটির উপরস্তরে হিউমাস অধিক থাকে, মাটির নীচেরদিকে ক্রমশঃ কমিয়া যায়।

উদ্ভিদ প্রধানতঃ মাটির হিউমাস হইতে অত্যাবশ্যকীয় নাইট্রোজেন পাইয়া থাকে। হিউমাসের প্রোটিড অংশে নাইট্রোজেন থাকে। একজাতীয় ব্যাক্‌টিরিয়া হিউমাস আক্রমণ করিয়া উহার প্রোটিডের নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়ায় পরিণত করে। আর এক জাতীয় ব্যাক্‌টিরিয়া ঐ অ্যাম্যেনিয়াকে নাইট্রাইটে এবং অন্য আর এক জাতীয় ব্যাক্‌টিরিয়া উহাকে নাইট্রেটে পরিণত করে। এই নাইট্রেট বিশ্লেষণ করিয়া উদ্ভিদ নাইট্রোজেন গ্রহণ করে। সুতরাং মাটির মধ্যে হিউ-মাসের গুরুত্ব অপরিসীম।

পঞ্চম অধ্যায়

খামারের প্রয়োজনীয় সাধারণ কৃষিযন্ত্র ও উহাদের ব্যবহার

(Common Farm implements and their operation)

কৃষিসংক্রান্ত বিভিন্ন কার্য্যের জন্য নানাপ্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যন্ত্রগুলির ব্যবহার তিন প্রকার উপায়ে করা হয়—(ক) মানুষের দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া, (খ) বলদ, মহিষ, অশ্ব প্রভৃতি পশুশক্তি দ্বারা, (গ) যান্ত্রিক শক্তির সাহায্যে। বিভিন্ন প্রকার কৃষিকার্য্য—(১) মাটির কঠিন স্তর ভাঙ্গিয়া মাটি বীজ বপনের উপযোগী করা, (২) বপনের পূর্ব্বে বীজ শোধন করিয়া লওয়া, (৩) বীজ বপন করা, (৪) ফসলের মধ্যে পাইট করা, (৫) সেচ দেওয়া, (৬) ফসল কাটা (৭) ফসল মাড়াই করা (৮) ফসল ঝাড়াই ও পরিস্কার প্রভৃতি কার্য্যের জন্য নানাবিধ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়।

(১) মাটির কঠিন স্তর ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিবার জন্য যেসব যন্ত্র ব্যবহার করা হয় ঃ—প্রায় সব দেশে কেবল সামান্য পরিমাণ বাগানের কাজে কোদাল ব্যবহার করা হয়। খুব কঠিন বা প্রস্তরময় স্থানে যেখানে কোদাল দিয়া মাটি খোঁড়া যায় না, সেইসব স্থানে গাঁতিদ্বারা মাটি খোঁড়া হয় এবং বেল্চার (Shovel) সাহায্যে মাটি তুলিয়া ফেলা হয়। কোদাল প্রধাণতঃ দুই প্রকার—সাধারণ কোদাল (digging spade) ও লম্বা দাঁত কোদাল বা ফর্ক কোদাল। কোদাল সোজা হইলে উহার কোপ সোজা পড়ে এবং মাটিতে গর্ত্ত গভীর হয়। কোদাল যত বাঁকা হয় গর্ত্তের গভীরতা তত কম হয়। ভিন্ন, ভিন্ন স্থানের মাটীর প্রকৃতিও প্রয়োজন অনুসারে কোদালের গঠন বিভিন্ন হইয়া থাকে।

লাঙ্গল—মানুষ যখন যাযাবর অবস্থা হইতে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে লাগিল তখন হইতে কৃষি সভ্যতার সূত্রপাত হয়। এই সভ্যতায়

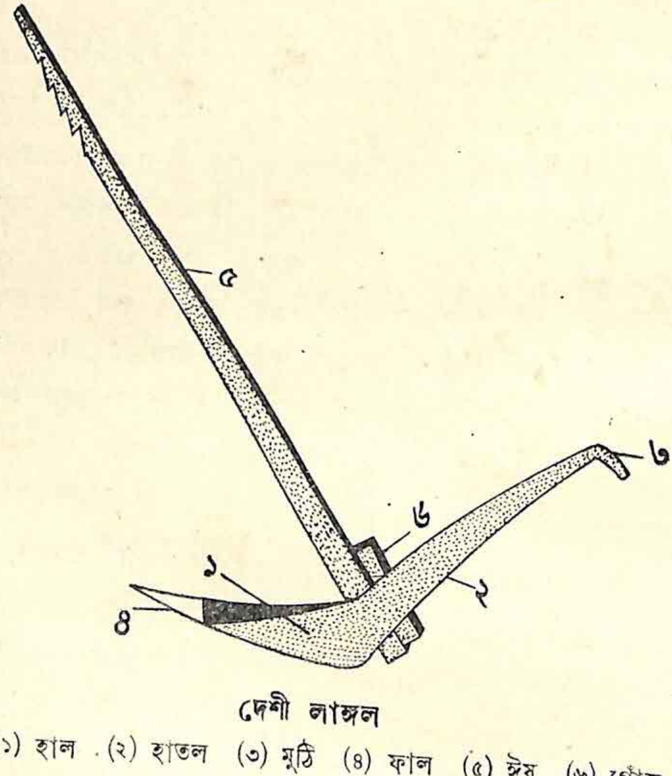
মনুষ্যশক্তির পরিবর্তে পশুশক্তি কৃষিকার্য্যে প্রযুক্ত হয়। সম্ভবতঃ লাঙ্গল কৃষিযন্ত্রের প্রথম উদ্ভাবন। উন্নত দেশগুলি ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে এখনও সেই সনাতন গঠনের লাঙ্গলের ব্যবহার চলিতেছে। পাশ্চাত্য দেশেও মাত্র দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে লাঙ্গলের গঠনের পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

দেশী লাঙ্গল—ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রই সেই প্রাচীন গঠনের একই প্রকার লাঙ্গল ব্যবহৃত হয়। অঞ্চল বিশেষে স্থানীয় মাটি, গোবংশের দৈহিক আকার এবং জলবায়ুর প্রকৃতি অনুযায়ী লাঙ্গলের আকৃতির তারতম্য অর্থাৎ ছোট বা বড় এবং অংশ বিশেষের সামান্য পরিবর্ত্তন দেখা যায়। কিন্তু মূল গঠন প্রকৃতি একই প্রকার। যেমন বাংলাদেশের মাটি সাধারণতঃ নরম এবং স্থানীয় বলদ ক্ষুদ্রাকৃতি সেইজন্য এই অঞ্চলে লাঙ্গলের আকার ক্ষুদ্র। পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের মাটির প্রকৃতি ভিন্নরূপ এবং ঐ অঞ্চলের বলদও দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ সেই কারণে ঐসব স্থানে লাঙ্গলের গঠন বৃহৎ, অপেক্ষাকৃত গভীর চাষের উপযোগী।

দেশী লাঙ্গলের কার্য্য—দেশী লাঙ্গলের ফাল ইংরাজী V অক্ষরের মত রেখায় মাটি কাটিয়া যায়। আঁতর বা নালীর (furrow) গভীরতা ও উহার প্রস্থ লাঙ্গলের আকৃতির উপর নির্ভর করে। নালীর গভীরতা সাধারণতঃ ৪" এবং নালীর উপরি ভাগের প্রস্থ ৬" অধিক হয় না। মাটির সহিত লাঙ্গলের ঈষ যে কোণ সৃষ্টি করে তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া নালীর গভীরতা ও প্রস্থ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। লাঙ্গলের সহিত ঈষের সংযোগ স্থানে গোঁজ আঁটিয়া ঈষ উঁচু অথবা নীচু করা হয়। অথবা ঈষদণ্ডের অগ্র অথবা পশ্চাদ দিকে জোয়াল বাঁধিয়া ঐ কোণ পরিবর্ত্তন করা হয়। হলাকর্ষণকালে ফালের দুই পার্শ্বে মাটি পড়িতে থাকে, নালীর ভিতরেও কিছু মাটি পড়িয়া যায়। নালী V আকৃতি হইবার ফলে পাশাপাশি দুই নালীর মধ্য স্থান অকর্ষিত থাকিয়া যায়। এড়ো চাষ দিবার পরও

(Cross ploughing) অকর্ষিত স্থান ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র চতুর্ভুজ আকারে থাকিয়া যায়। সুতরাং সমুদয় জমি কর্ষিত হয় না।

সাধারণতঃ শিশু, বাব্‌লা অথবা যে কোন শক্ত কাঠ দিয়া দেশী লাঙ্গল তৈয়ার করা হয়। ইহার অংশগুলি নিম্নোক্ত প্রকার—(১)



দেশী লাঙ্গল

(১) হাল (২) হাতল (৩) মুঠি (৪) ফাল (৫) ঈষ (৬) গোঁজ

হাল—ইহা লাঙ্গলের প্রধান অংশ, ত্রিভুজের মত (২) উহার একটি ভুজের প্রান্ত বাঁকা হইয়া উপর দিকে লম্বাভাবে থাকে। উহাকে হাতল বলা হয়। লাঙ্গল চালাইবার সময় হাতলের মাথায় চাপ দিয়া ধরিয়া রাখিবার জন্য উহার সহিত (৩) মুঠি সংযুক্ত থাকে। হাল ও হাতল যেখানে কোণ সৃষ্টি করে তাহার উপরে একটা বড় ছিদ্র থাকে, (৫) ঐ ছিদ্রে দীর্ঘ ঈষদণ্ড লাগান থাকে। ঈষের অপর প্রান্তে কয়েকটি খাঁজ কাটা থাকে। ঐ খাঁজগুলির সহিত

বলদের কাঁধের জোয়াল বাঁধিয়া দেওয়া হয়, মাটি কর্ষণের গভীরতা নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বিভিন্ন খাঁজের প্রয়োজন হয়, (৬) ঈষ দণ্ডটি হালের যে গর্ত্তের মধ্যে প্রবিষ্ট থাকে তাহাকে দৃঢ় রাখিবার জন্য একটি কীলক ব্যবহার করা হয়, উহাকে গোঁজ বলে। ঐ গোঁজ ঈষের উপরে বা নীচে গর্ত্তের মধ্যে আঁটিয়া কর্ষণের গভীরতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

মোলবোর্ড লাঙ্গল (Mould board plough)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে প্রথম পুরাতন লাঙ্গলের গঠন পরিবর্ত্তন করিয়া মোলবোর্ডযুক্ত লাঙ্গল প্রবর্ত্তন করা হয়। এইপ্রকার লাঙ্গলের দ্বারা জমির সমুদয় মাটি কর্ষিত হয়, কোন অংশ অকর্ষিত থাকিয়া যায় না, দেশী লাঙ্গলের মত নালীর দুই পার্শ্বে মাটি ছড়াইয়া পড়িবার পরিবর্ত্তে এক পার্শ্বে চতুর্ভুজাকৃতি চাঙ্গর হইয়া উল্টাইয়া পড়ে অর্থাৎ মাটির উপরিভাগ নীচে চাপা পড়ে এবং নীচের মাটি উপরে উন্মুক্ত হইয়া থাকে, জমির কোন স্থান অকর্ষিত থাকে না। দেশী লাঙ্গলের মত বারংবার লম্বা ও এড়ো চাষ দিয়া মাটি প্রস্তুত করিতে হয় না। মোল্ডবোর্ড লাঙ্গলের দ্বারা একবার চাষ ও একবার হ্যারো দিলে (Harrow) ঐ কার্য্য সম্পন্ন হয়। দেশী লাঙ্গলে মাটি উল্টাইয়া যায় না, মোল্ডবোর্ড লাঙ্গল দ্বারা চাষ করিলে মাটি উল্টাইয়া যাওয়ার ফলে উপরের ঘাস, আগাছা প্রভৃতি মাটির নীচে চাপা পড়ে এবং পচিয়া জমি উর্ব্বর করে। যে সকল পোকামাকড় মাটির নীচে থাকে সেইগুলি মাটির উপরে উঠিয়া আসে, পক্ষী প্রভৃতি তাহাদের খাইয়া ফেলে। মাটির মধ্যে উদ্ভিদের নানা-প্রকার রোগ জীবাণু থাকে উহারাও এইরূপে উন্মুক্ত হইলে সূর্য্যতাপে নষ্ট হইয়া যায়। মাটি অধিক কর্ষিত হইলে মৃত্তিকাকণাগুলির মধ্যে ফাঁকের সংখ্যা বাড়িয়া যায়, সুতরাং মাটির মধ্যে বৃষ্টির জল অধিক পরিমাণে শোষিত হয়।

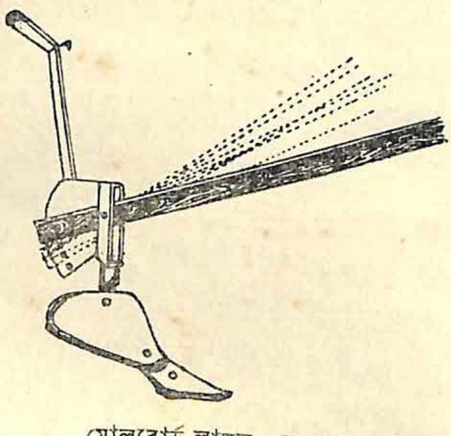
অধুনা নানাপ্রকার মোল্ডবোর্ড লাঙ্গলের প্রচলন হইয়াছে। প্রকার

বহু হইলেও মোল্ডবোর্ড লাঙ্গলে প্রধানতঃ চারিটি অংশ থাকে—(১) লাঙ্গলের নীচের অংশ ইহাকে ফ্রগ (frog) বলে, এই অংশে থাকে, ফাল (share), বুক (mould board) ও পার্শ্বরেখ (Land side) ইহা মাটির পার্শ্বে লাগিয়া থাকে এবং নালীরেখা সোজা রাখে ; (২) ঈষ (Beam) ইহা হেক্ (Hake) নামক একটি অংশের গায়ে আঁটা থাকে ; (৩) হাতল (Handle) ইহা হেকের অপর পৃষ্ঠে আঁটা থাকে ; লাঙ্গলের নিম্নাংশ ঈষের সহিত এই অংশে যুক্ত থাকে।

মোল্ডবোর্ড লাঙ্গল পরিচালনা

মোল্ডবোর্ড লাঙ্গল দিয়া জমি দুই প্রণালীতে চাষ করা যায়।

প্রথম প্রণালী :—জমির মধ্যস্থানে এক ফালি অংশ নির্দিষ্ট করিয়া লওয়া হয়। ঐস্থানের ঠিক মধ্যবরাবর একটা আঁতর (furrow) করা হয়। ঐ আঁতরের শেষে দক্ষিণদিকে অর্থাৎ মোল্ড-বোর্ডের দিকে লাঙ্গল ঘুরাইয়া তাহার পাশে দ্বিতীয় আঁতর করা হয়। তাহাতে উভয় আঁতর হইতে নিক্ষিপ্ত মাটি মিলিত হইয়া একটা উঁচু ঢিবি (Ridge) গঠন করে। দ্বিতীয় আঁতরের শেষে লাঙ্গল পুনরায় ডান পাশে ঘুরাইয়া প্রথম আঁতরের অপর পার্শ্বে তৃতীয় আঁতর করা হয়। তাহার পর আবার ডান দিকে লাঙ্গল ফিরাইয়া দ্বিতীয় আঁতরের পাশে চালাইয়া চতুর্থ আঁতর করা হয়। এইরূপ পুনরাবৃত্তি করিয়া সমুদয় জমি চষা হয়। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় আঁতরের চারিপার্শ্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জমির শেষ প্রান্তে গিয়া চাষ শেষ হয়।



মোলবোর্ড লাঙ্গল—সুফলা

এইপ্রকারে চাষ করিলে জমির মধ্যস্থলে আলের মত একটা উঁচু লম্বা ঢিবি (Ridge) সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় প্রণালী—জমির দৈর্ঘ্যের দক্ষিণ প্রান্তের এক কোণ হইতে কর্ষণ আরম্ভ করিয়া জমির শেষ সীমায় আসিয়া বাম দিকে লাঙ্গল ফিরাইয়া প্রস্থে কর্ষণ করা হয়। প্রস্থের শেষ সীমায় আসিয়া আবার বাম পার্শ্বে ফিরিয়া জমির অপর দৈর্ঘ্যে চাষ দিয়া শেষে আবার বাম পার্শ্বে ফিরিয়া অপর প্রস্থ চষিয়া আরম্ভ স্থানে আসা হয় এবং প্রথম আঁতরের পাশ দিয়া দ্বিতীয় আঁতর কাটা হয়। এইরূপে সমুদয় জমি বাহির দিক হইতে চষিয়া কেন্দ্রে আসিয়া শেষ হয়। এইপ্রকারে জমিতে চাষ দিলে জমির কেন্দ্রস্থানে তুইবার আঁতর পড়িয়া একটা নালীর সৃষ্টি হয়।

দেশী লাঙ্গল দিয়া বীজ বপনের উপযোগী মাটি প্রস্তুত করিবার জন্য প্রথমে লম্বাভাবে চাষ দিবার পর এড়ো চাষ ও মই দেওয়া হয়। উপর্যুপরি কয়েকবার ঐরূপে চাষ দিয়া মাটি বীজ বপনের উপযোগী করিতে হয়। ইহাতে সময়, পরিশ্রম ও ব্যয় অধিক হয়। মোল্ডবোর্ড লাঙ্গল দ্বারা জমিতে একবার চাষ দিবার পর উন্নত ধরনের হ্যারো (Harrow) যন্ত্রদ্বারা মাটি সহজে প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু ধান চাষের জন্য জমির "কাদান" বা কাদাচাষ মোল্ডবোর্ড লাঙ্গল দ্বারা সম্ভব নয়, এবং ভারি মাটিতে (Heavy clay soil) চাষ দেওয়া বলদের পক্ষে বিশেষ শ্রমসাধ্য। দেশী লাঙ্গল অপেক্ষা ভারি বলিয়া বাংলার দেশীয় বলদ দ্বারা ভারি মোল্ডবোর্ড লাঙ্গল চালনা করা যায় না।

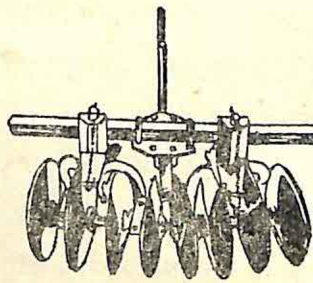
মোল্ডবোর্ড লাঙ্গলের প্রধান অংশগুলির কার্য্য—

মোল্ডবোর্ড লাঙ্গলের মাটি কাটিবার অংশের মুখাগ্রকে ফাল (share) এবং উহার পশ্চাদভাগের অংশকে কোল্টার (coalter) বলে। ফাল সোজাভাবে (Horizontally) এবং কোল্টার খাড়াভাবে মাটি কাটিয়া দেয় এবং মোল্ডবোর্ড বা বুক দ্বারা ঐ মাটি পার্শ্বদিকে

উঠিয়া উল্টাইয়া যায়। লাঙ্গলে পার্শ্বরেখা (Landside) সংযুক্ত থাকার জন্য মাটি উল্টাইবারকালে লাঙ্গল স্থানচ্যুত হয় না, সোজা চলিতে থাকে। পার্শ্বরেখার নীচের অংশটিকে তল (Sole) বলে, উহা লাঙ্গল ও মাটির ভার ধারণ করে।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষিবিভাগ সুফলা নামক মোল্ডবোর্ড লাঙ্গল এদেশের মাটি ও বলদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলেন। এই লাঙ্গলের ফাল, বুক এবং হাতল নরম ইস্পাতের প্রস্তুত। ঈষ উঁচু, নীচু করিয়া লাগাইবার জন্য হেকের গায়ে একসারি ছিদ্র আছে। প্রয়োজন মত ঈষকে ঐ ছিদ্রগুলির সহিত যুক্ত করিয়া ৩"—৬" পর্য্যন্ত মাটি গভীর করিয়া চাষ করা যায়।

বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ নিম্নোক্ত প্রকার চাকতিবিদা এদেশের পক্ষে উপযোগী বলেন।


চাক্তি বিদে
Disc Harrow

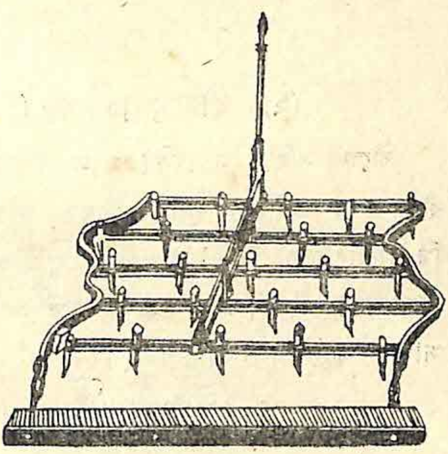
এই যন্ত্রে ১২" ব্যাসের ৬টি অথবা ৮টি নরম ইস্পাতের চাক্তি আটা থাকে। দুইটি চাক্তির মাঝে একটি করিয়া কোদালের মত অংশ থাকে। মাটিভেদ নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যবস্থা এবং চালকের বসিবার স্থান যন্ত্রে আছে। মোল্ডবোর্ড লাঙ্গল দিয়া মাটি চাষ দিবার পর চাক্তি বিদা দিয়া বীজ বপনের উপযোগী করিয়া মাটি সহজে প্রস্তুত করা যায়। এই যন্ত্র কঠিন ও এঁটেল মাটিতেও চালনা করা যায়। লাঙ্গলের পরিবর্তে চাকৃতি বিদা দিয়া রবি ফসলের জমি প্রস্তুত করিলে মাটির সরসতা অক্ষুন্ন থাকে।

যন্ত্রটি ওজনে ১৬৮ পাউণ্ড। বলদের কাঁধে ২১০ পাউণ্ড ওজনের চাপ পড়ে। সুতরাং এই যন্ত্র টানিবার জন্য বলিষ্ঠ বলদের প্রয়োজন।

চাক্‌তি বিদা দ্বারা একবারে ৩ ফুট প্রস্থে মাটি চাষ হয়। ইহা দ্বারা ঘণ্টায় ০'২৫ একার জমি চাষ করা যায়। মূল্য প্রায় ১৭০৲।

যে জমিতে পূর্ব্বে দুই একবার চাষ দেওয়া হইয়াছে, কিম্বা যে জমির ঢেলা সহজে ভাঙ্গিয়া যায় সেইরূপ জমিতে পুনরায় লাঙ্গল দিয়া চাষ দিবার পরিবর্ত্তে কাল্‌টিভেটার যন্ত্র ব্যবহার করিয়া মাটি প্রস্তুত করা সুবিধাজনক হয়। এই যন্ত্র ও একপ্রকার বিদা বিশেষ। কাল্‌টিভেটার দুই প্রকার হয়—গজাল দাঁতের বিদে (Toothed cultivator) এবং স্প্রিং দাঁতের বিদে (Spring Tyned cultivator)।

চতুষ্কোণ ফ্রেমে লম্বা পলকাটা তীক্ষ্ণ দাঁত বা গজাল লাগান থাকে। ফ্রেমের পিছনে একটা কাঠের বিম বা মই সংযুক্ত থাকে। এই যন্ত্রে মাটির ঢেলা ভাঙ্গিয়া যায়, গাছের গোড়া, আগাছা, শিকড় প্রভৃতি উঠিয়া আসে এবং বিম সংযুক্ত থাকায় ঢেলাগুলি ভাঙ্গিয়া মাটি সমান হইয়া যায়।



গজাল দাঁতের বিদে

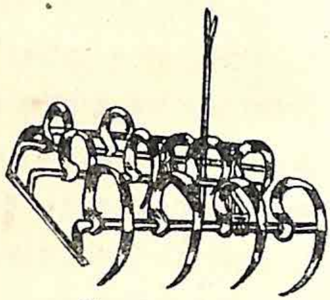
গজাল দাঁতের বিদের ওজন ১১২ পাউণ্ড। গরুর কাঁধে চাপ পড়ে ১৩৫ পাউণ্ড। গড়ে ৪"-৬" × ৩"-৬" চওড়ায় মাটি চাষ হয়। ঘণ্টায় কাজ হয় ০'৪৫ একার। মূল্য ১১০৲।

স্প্রিং দাঁতের বিদা (Spring tyned cultivator)

ইহার কাজ প্রায় গজাল দাঁত বিধের মত। ইহার দাঁতগুলি মাটির অধিক নীচে যায়। প্রায় ৪"-৫" পর্য্যন্ত মাটির ভিতরে প্রবেশ করে। স্প্রিং থাকায় মাটি উল্টাইয়া যায়, ঢেলাগুলি উপরে উঠিয়া

আসে ও বিম্ দ্বারা চূর্ণ হইয়া যায়। ঘাসযুক্ত পাথুরে মাটিতে ও এই যন্ত্র দিয়া কাজ করা যায়।

স্প্রিং দাঁতের বিদের ওজনে ১৩০ পাউণ্ড। বলদের কাঁধে চাপ পড়ে ১৫০ পাউণ্ড। এক একটি দাঁত ৫"×৩" করিয়া মাটি চাষ করে। ঘণ্টায় ০·৪ একার জমির কাজ হয়। মূল্য ১২০৲।



স্পিং দাঁতের বিদে
Spring Tyned cultivator

(২) বীজ শোধন যন্ত্র (Seed dresser)

বীজের সহিত নানাবিধ রোগ বীজাণুর স্পোর লাগিয়া থাকে। বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে বীজের সহিত রোগ প্রতিষেধক ঔষধ মিশাইবার জন্য Seed dresser যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। হস্তচালিত নানাপ্রকার বীজ শোধক যন্ত্র বাজারে পাওয়া বায়। এইরূপ একটি সাধারণ যন্ত্রের মূল্য প্রায় ৫০৲।

(৩) বীজ বপন যন্ত্র (Seed Drill)

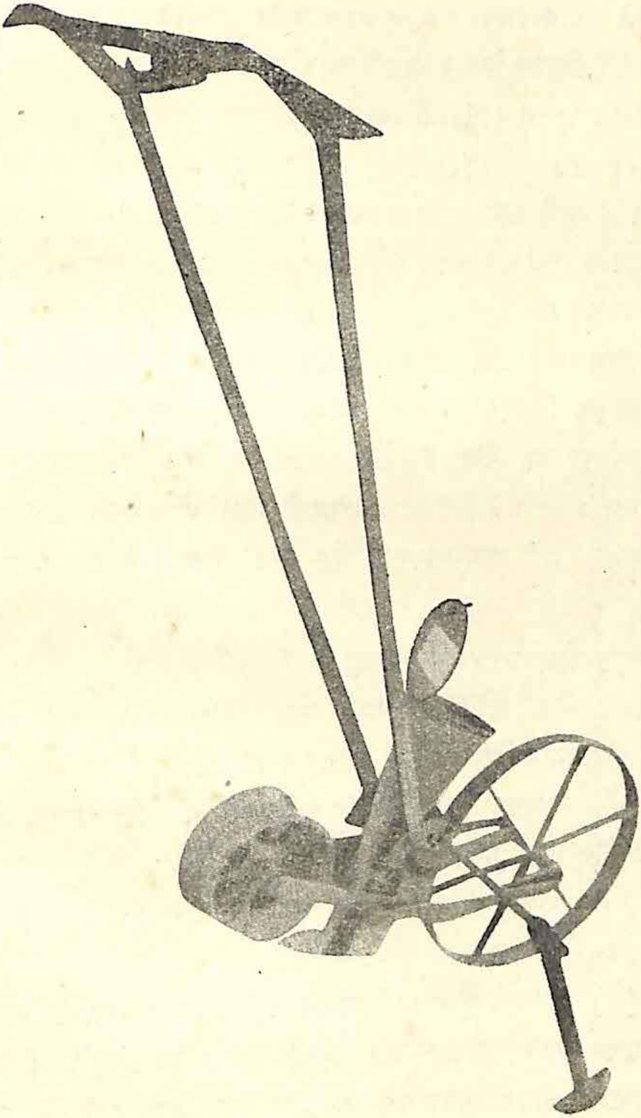
সারিতে বীজ বপনের জন্য হাতে ঠেলা বীজ বোনা Seed drill ব্যবহৃত হয়। এই যন্ত্রে বীজ রাখিবার জন্য একটি বাক্স থাকে। বাক্সের তলায় ছোট ছোট ছিদ্র থাকে। যন্ত্রটি ঠেলিয়া চালাইবার জন্য হাতল ও একটি চাকা থাকে। যন্ত্রে মাটি খুঁড়িয়া সারি প্রস্তুত করা, নালী ঢাকিয়া ও চাপিয়া দেওয়া একত্রে হয়। বীজ পড়ার দূরত্ব ও সারির ব্যবধান নিয়ন্ত্রণ করা যায়। নানাপ্রকার Seed Drill প্রচলিত আছে। সাধারণ মূল্য ১০০৲—১৫০৲।

বীজবপন যন্ত্রে সাধারণতঃ নিম্নোক্ত অংশগুলি থাকে—

(১) সম্মুখের একটি বড় চাকা (Front wheel),

(২) মাটি চাপিয়া দিবার জন্য পশ্চাদভাগে একটি চাকা (Press wheel)

(৩) সংযুক্তি দণ্ড (Connecting rod)



বীজবপন যন্ত্র Seed Drill

(৪) চিহ্নকারী দণ্ড (Marker)
(৫) নালী কাটার ফাল (Furrow opener)
(৬) বীজাধার (Hopper)
(৭) বীজাধারের মধ্যে সছিদ্র চাক্‌তি (Disc)
(৮) ডিস্কের উপরে একটি অংশ ফেল্ট (Felt)
(৯) হাতল (Handles)
(১০) স্ক্রেপার (Scraper) মাটি চাঁচিবার অংশ
(১১) মাটি জমা করিবার অংশ (Soil gatherer)

হাতল দুইটি দুই হাতে ধরিয়া সম্মুখের চাকাটির উপর চাপ দিয়া যন্ত্রটি সোজা চালান হয়। Furrow opener দ্বারা মাটি খুঁড়িয়া নালী প্রস্তুত হয় এবং বীজাধার হইতে বীজগুলি ডিস্কের ছিদ্রের মধ্য দিয়া নালীর ভিতরে পড়িতে থাকে, Scraper মাটি চাঁচিয়া নালী ভর্ত্তি করিয়া দেয় এবং Press wheel মাটি চাপিয়া দেয়। চিহ্ন দণ্ডটি পার্শ্বে রেখা টানিয়া যায়, পরবর্ত্তী নালী ঐ রেখার উপর দিয়া করা হয়। এই লাইনের দূরত্ব চিহ্ন দণ্ড নিয়ন্ত্রণ করিয়া ঠিক করা হয়।

সারিতে বীজ বপনের সুবিধা

(i) বীজ ছিটাইয়া বপন করা (Broadcasting) অপেক্ষা সারিতে বপন করিলে বীজের পরিমাণ কম লাগে ;

(ii) আবশ্যকানুযায়ী মাটির গভীরতা স্থির করিয়া সমুদয় জমিতে সহজে বীজ বপন করা যায় ;

(iii) ফসলের অন্তর্বর্ত্তী পরিচর্য্যা (Interculture) সহজ, সুবিধাজনক ও স্বল্প ব্যয়ে হয় ;

(iv) গাছের দূরত্ব সঠিকভাবে রাখিয়া ঘন সন্নিবিষ্ট গাছগুলি অনায়াসে তুলিয়া পাত্‌লা করা যায় ; বিশেষ অপরিপুষ্ট, কীটদুষ্ট ও রোগাক্রান্ত গাছগুলি সহজেই লক্ষ্য করা যায় এবং সেইগুলি বাছিয়া ফেলা যায় ;

(v) গাছের গোড়ায় অনায়াসে সমভাবে সার প্রয়োগ (Top-dressing), জল সেচ ও নিড়ানী দেওয়া যায় ;

(vi) গাছের গোড়ায় মাটি ধরাইবার পক্ষে খুব সুবিধা হয় ;

(vii) কীট ও রোগ বিনাশক ঔষধ সহজেই প্রয়োগ করা যায় ;

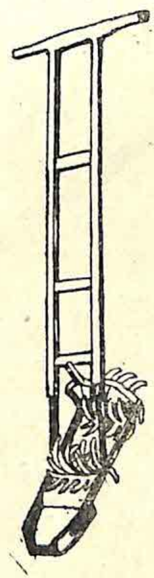
(viii) গাছগুলি সারিবদ্ধ থাকায় প্রত্যেকটি গাছ আলোক, বাতাস ও খাদ্য সমভাবে পায় সুতরাং উহাদের বৃদ্ধি সতেজ ও দ্রুত হয় ;

(ix) উপরোক্ত পরিবেশ ও প্রক্রিয়াগুলির ফলে অধিক ফলন হয় এবং

(x) ফসল তোলা অপেক্ষাকৃত সহজ ও স্বল্প ব্যয়ে হয়।

(৪) ফসলের মধ্যে পাইট (Inter tillage implements)

ফসলের মধ্যে আগাছা তোলা ও মাটি খোঁড়ার জন্য খুরপি, হাতফর্ক Handfork, নিড়ানী, ছোট কোদাল, ফর্ক কোদাল, আঁচড়া প্রভৃতি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। আউস ধানের জমিতে বলদ চালিত বিদে ব্যবহার করা হয়। ঐগুলি বাঁশ বা কাঠের প্রস্তুত। কাঠের বিদেয় লোহার বাঁকা লম্বা লম্বা গজাল লাগান থাকে। মাটির সহিত চাপিয়া ধরিবার জন্য একটি হাতল বা মুঠি থাকে। এইপ্রকার বিদেয় ভাল কাজ হয়। উন্নত ধরণের কয়েকটি Inter tillage যন্ত্রের বিবরণ প্রদত্ত হইল।



আগাছা নিড়ানী যন্ত্র
Weeder

ফসলের মধ্যে হাল্কা ভাবে মাটি খোঁড়ার যন্ত্রকে বলে নিড়ানী বা হো (Hoe)। সারিতে বোনা ফসলের মধ্যে হস্তচালিত তিন ফলার চাকা নিড়ানী দিয়া ভাল কাজ হয়। এই যন্ত্র চালাইবার জন্য হাতল ও একটি চাকা থাকে। প্রয়োজনমত দুই সারির ব্যবধান ঠিক করিবার জন্য চাকার পিছনে ফলাগুলি লাগান যায়।

এই যন্ত্রে ঘণ্টায় দুই একর জমির মাটি আল্গা করিয়া খুঁড়িয়া দেওয়া যায়। মূল্য ৩০৲।

আগাছা নিড়ানী (weeder)

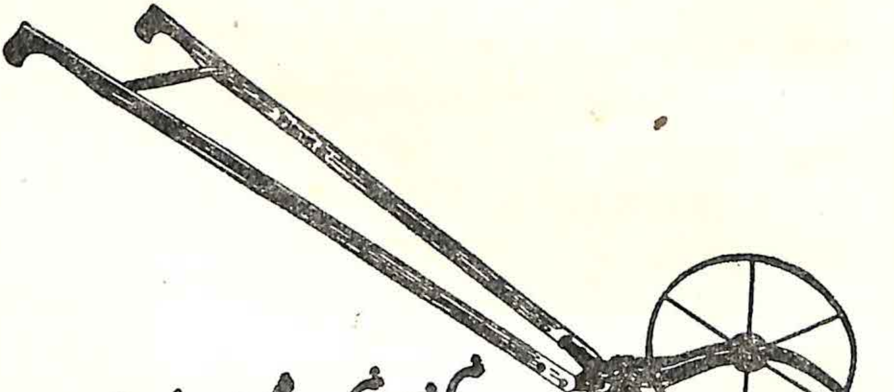
এই যন্ত্র হাতে ঠেলিয়া সামনে ও পিছনে উভয় দিকে চালান যায়। এই যন্ত্রে দুই সারি তারকাকৃতি চাকা থাকে। চাকাগুলি আগাছা কাটিয়া মাটি আল্গা করিয়া দেয়। ঘণ্টায় ২ একার জমিতে কাজ করা যায়। মূল্য ৩০৲।

ধানক্ষেতের আগাছা নিড়ানী (Paddy weeder)

ইহাও অনুরূপ যন্ত্র। ঘণ্টায় ২ একর জমিতে নিড়েন দেওয়া যায়। মূল্য ৩০৲।

Planet Junior set

এই যন্ত্রে নানাপ্রকার কাজ করা যায়। বাগানের কাজে ইহা বিশেষ উপযোগী। এই যন্ত্রে নানাপ্রকার অংশ (parts) লাগাইয়া

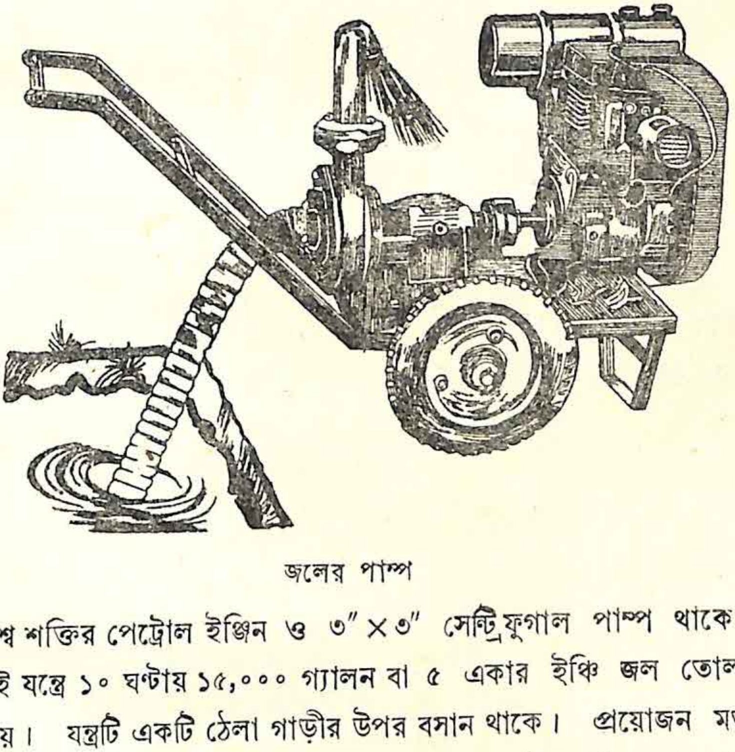


Planet Junior set'

ফসলের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার কাজ করা যায়। অংশগুলি—হর্স হোও কাল্‌টিভেটার সেটে থাকে ৩″×৮″ চারিটি, একটি ৪″×৮″ কাল্‌টি-ভেটার স্টীল, একটি ৬″ মোলবোর্ড লাঙ্গল, পাঁচটি দাঁত বিশিষ্ট

স্প্রিংটুথ্ কাল্টিভেটার, ১২ দাঁতের টুথ্ হ্যারো, রেক, স্টার পাল্ভা-রাইজার। প্রয়োজন মত বিভিন্ন অংশ লাগাইয়া কাজ করা যায়। বর্ত্তমানে ইহার মূল্য ২৫০৲।

(৫) **সেচ যন্ত্র**—সেচ দিবার জন্য এদেশে সিউনী ও ডোঙ্গা বা দোন ব্যবহার করা হয়। শক্তিচালিত পাম্পের সাহায্যে সেচ দেওয়া সুবিধাজনক! বঙ্গীয় কৃষি বিভাগ পেগ সন্ পাম্প ও দেশী এম্, এম্, এম্ পাম্প ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। এই প্রকার পাম্পে ৫—৭



জলের পাম্প

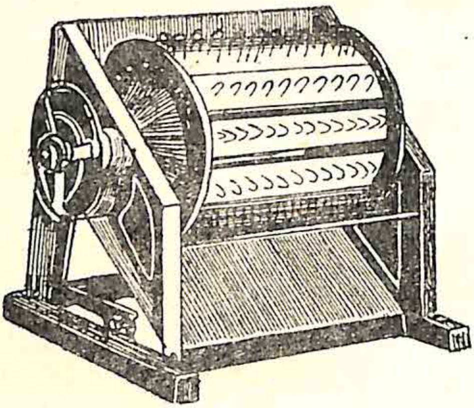
অশ্ব শক্তির পেট্রোল ইঞ্জিন ও ৩″×৩″ সেন্ট্রিফুগাল পাম্প থাকে। এই যন্ত্রে ১০ ঘণ্টায় ১৫,০০০ গ্যালন বা ৫ একার ইঞ্চি জল তোলা যায়। যন্ত্রটি একটি ঠেলা গাড়ীর উপর বসান থাকে। প্রয়োজন মত সহজে ঠেলিয়া স্থানান্তরিত করা যায়। ২৫ ফুট আর্মড স্যাক্শান নল এবং ২৫ ফুট রবারের ডেলিভারী নল সমেত একটী পাম্পের মূল্য দুই হাজার টাকা।

(৬) ফসল কাটা কাস্তে দিয়া হইয়া থাকে। কাস্তে দুই প্রকার হয় একপ্রকারে করাতের মত ছোট ছোট দাঁত থাকে, আর

এক প্রকারে দাঁত থাকে না। করাতের মত কাস্তে দিয়া ধান, গম, ভুট্টা, প্রভৃতি শস্যের গাছ কাটা সুবিধাজনক হয়।

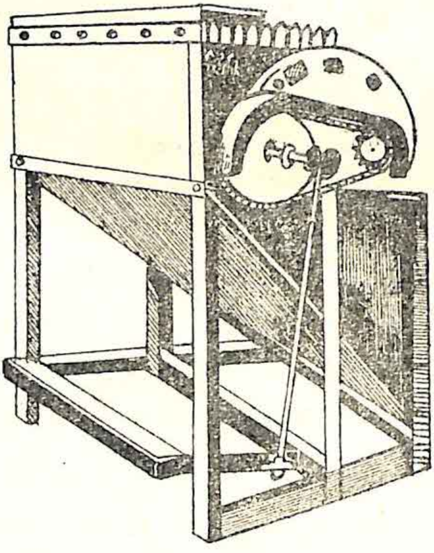
(৭) মাড়াইকল (Thrasher)

জাপানী ওটেক্ নামক পা দ্বারা চালিত ধান মাড়াই কলের অনুকরণে প্রস্তুত মাড়াই-যন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে। এই যন্ত্রে একটী বড় ড্রামের গায়ে কতকগুলি রিং বা আঁংটা লাগান থাকে। পা দিয়া প্যাডলে চাপ দিলে ড্রামটি ঘুরিতে থাকে। শস্যের আঁটি ড্রামের উপর ধরিলে শীষ



মাড়াইকল

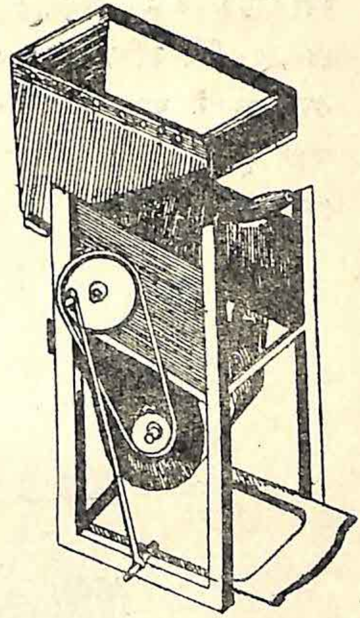
হইতে শস্য ঝরিয়া পড়ে। একজন লোক দিনে ৮ ঘণ্টায় প্রায় ২০ মণ ধান এই যন্ত্রে মাড়াই করিতে পারে। দাম ১৫০৲।



ঝাড়াইকল

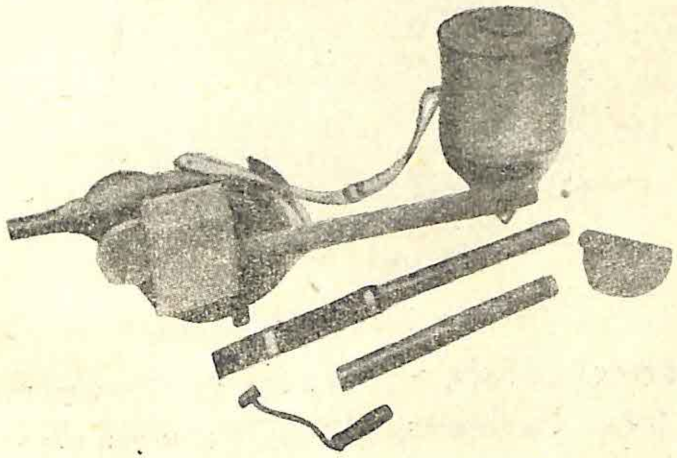
(৮) ঝাড়াই কল (winnower)

এই যন্ত্রে একটি দাঁতযুক্ত চাকার সঙ্গে একটা চেন্ বা শিকল লাগান থাকে। শিকলটি একটি ব্লেডের পাখায় যুক্ত থাকে। পা-দ্বারা প্যাডেল চালাইলে পাখাটি ঘুরিতে থাকে এবং উপরে শস্যের বাক্স হইতে খড়, কুটিকাটি, আবর্জ্জনা প্রভৃতি হাওয়া লাগিয়া উড়িয়া যায় এবং পরিস্কার শস্য বাক্সের নীচে ঝরিয়া পড়ে। দুই জন লোক এই যন্ত্রে ৮ ঘণ্টায় ৫০—৬০ মণ শস্য ঝাড়াই করিতে পারে ইহার মূল্য ১২০৲।



ঝাড়াইকল

পোকামাকড় ও উদ্ভিদের রোগ নিবারণের জন্য **ক্ষেপন যন্ত্র**-দ্বারা (Duster) গুঁড়া ঔষধ ছড়াইয়া দেওয়া হয় এবং **সিঞ্চন যন্ত্র**-দ্বারা



কীটনাশক গুঁড়া ঔষধ ছিটাইবার যন্ত্র—Duster

(Sprayer) তরল ঔষধ ছিটাইয়া দেওয়া হয়। এই যন্ত্রগুলি দুই প্রকারের হয়—হস্তচালিত এবং পেট্রোল ইঞ্জিন চালিত। একটি হস্তচালিত যন্ত্রদ্বারা গড়ে দৈনিক ৩—৪ বিঘা জমিতে ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। ৩—৪ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট পেট্রলচালিত যন্ত্রদ্বারা দৈনিক ২৫—৩০ বিঘা জমিতে ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। হস্তচালিত গুঁড়া ঔষধ ক্ষেপন যন্ত্রের মূল্য ১০০৲—১২০৲ এবং হস্তচালিত সিঞ্চন যন্ত্রের মূল্য প্রায় ১৬০৲। অধিক মূল্যের শক্তিচালিত নানাপ্রকার ক্ষেপন ও সিঞ্চন যন্ত্র প্রচলিত আছে, উহাদের মূল্য ১২৫০৲ ও তদূর্দ্ধ।

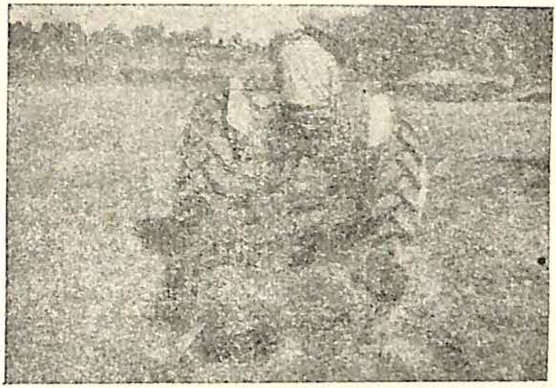


তরল ঔষধ সিঞ্চন যন্ত্র Sprayer

উন্নত দেশগুলিতে বিস্তীর্ণ জমির উপর এরোপ্লেন হইতে যন্ত্রের সাহায্যে কীট নিবারক ঔষধ নিক্ষেপ করিয়া কীটের আক্রমণ দমন করা হয়।

উন্নত ও অগ্রসর দেশগুলিতে অধুনা যাবতীয় কৃষিকার্য্যে যান্ত্রিক

শক্তির ব্যবহার হইতেছে। মাটি কর্ষণ হইতে উৎপন্ন ফসল গোলাজাত করা পর্য্যন্ত কৃষি-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য নানাবিধ কৃষিযন্ত্র দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে। এইসব যন্ত্রের মধ্যে Tractor বা কলের লাঙ্গলের ব্যবহার খুব ব্যাপক। কলের লাঙ্গলে দুই প্রকার ফাল ব্যবহার করা হয়—মোল্ডবোর্ড যুক্ত ফাল অথবা চাকতি ফাল (Disc plough)। Disc



Tractor

তিন ফলা মোল্ডবোর্ডযুক্ত এই ট্রাক্টারটি ৪৫ মিনিট সময়ে
এক একার জমি কর্ষণ করে।

plough-এ পিরিচ আকৃতির কয়েকটি ধারাল চাক্‌তি (Disc) লাগান থাকে। ইঞ্জিনের শক্তি এবং মাটির অবস্থা অনুযায়ী Disc অথবা মোল্ডবোর্ড ফালের আকার ও ঐগুলির সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করা হয়। সাধারণ ট্রাক্টারে মাটি ৯" গভীর ও খুব প্রশস্ত হয়। ডিস্ক্ লাঙ্গলের দ্বারা ভূমি-কর্ষণ করিলে মোল্ডবোর্ড লাঙ্গল অপেক্ষা আঁতর অধিকতর প্রশস্ত এবং মাটি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া নিক্ষিপ্ত হয়।

চাকৃতি লাঙ্গল (Disc Plough)

ফাল, কোল্টার ও মোল্ডবোর্ডের পরিবর্ত্তে ডিস্ক্ লাঙ্গলে কয়েকটি বড় অবতল ইস্পাতের ধারাল চাক্‌তি সংযুক্ত থাকে। চাক্‌তিগুলি লাঙ্গল টানিবার রেখার সহিত ঈষৎ কোণ করিয়া লাঙ্গলে আঁটা থাকে।

ঐগুলি মাটি কোদলাইয়া নালী কাটিয়া একপার্শ্বে মাটি উল্টাইয়া ফেলিয়া দেয়। চাক্‌তির মধ্যে মাটি যাহাতে লাগিয়া না থাকে তজ্জন্য চাক্‌তির সহিত একটি করিয়া মাটি চাঁচিবার যন্ত্র (Scraper) সংযুক্ত থাকে। চাক্‌তিগুলি মাটির মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার জন্য চাক্‌তিগুলির উপর ভার চাপান থাকে।

মোল্ডবোর্ড লাঙ্গল দ্বারা পাথুরে মাটি চাষ করা যায় না, চাকি্‌ত লাঙ্গল দ্বারা ঐ প্রকার মাটি ও ঘাস ও জঙ্গলময় এঁটেল মাটিতে চাষ দেওয়া সুবিধাজনক হয়। মোল্ডবোর্ড লাঙ্গলে কর্ষিত মাটির তলায় একটা কঠিন স্তর (Plough pan or Plough sole) সৃষ্টি হয়, চাক্‌তি লাঙ্গল দ্বারা চাষ দিলে মাটির তলায় ঐরূপ কঠিন স্তর হয় না, মোল্ডবোর্ড লাঙ্গল অপেক্ষা এই লাঙ্গল চালাইতে কম শক্তির প্রয়োজন হয়।

বহুপ্রকার ট্রাক্টার প্রচলিত হইয়াছে। বিভিন্ন প্রকার ট্রাক্টারের চাকা বিভিন্ন রকম হয়, যেমন রবার টায়ার চাকা, গজাল দাঁতযুক্ত চাকা, Caterpillar চাকা। মৃত্তিকা ও আবহাওয়া অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ট্রাক্টর ব্যবহার করা হয়।

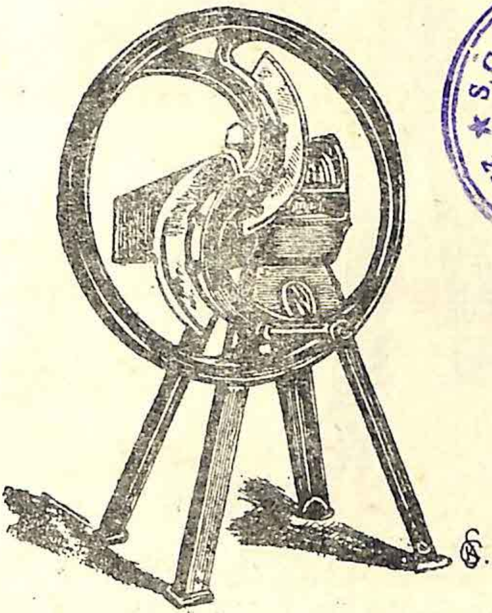
ট্রাক্টার দ্বারা চাষের বিশেষ সুবিধা এই যে ইহা দ্বারা একটি মাত্র চাষ দিবার পর, একবার বিমযুক্ত হ্যারো চালনা করিলে মাটি প্রস্তুত হইয়া যায়। ট্রাক্টারের এঞ্জিনের সাহায্যে নানাপ্রকার কৃষিযন্ত্র চালনা, খড় বা শস্য বোঝাই গাড়ী টানা প্রভৃতি খামারের বহুবিধ কার্য্য করা যায়।

খড়কাটা কল

পশুদের খড়, জোয়ার প্রভৃতি কাটিয়া খাওয়াইবার জন্য খামারে হস্তচালিত খড়কাটা কলের প্রয়োজন হয়।

নরম ইস্পাতের চারিটি পায়ার উপর এই যন্ত্রটি যুক্ত থাকে। যন্ত্রের উপর দিকে একটি কাঠের লম্বা বাক্স থাকে; বাক্সের যে প্রান্তটি যন্ত্রের সহিত সংলগ্ন সেইস্থানে দাঁতযুক্ত দুইটি রোলার আঁটা থাকে। বাক্সের অপর প্রান্ত দিয়া খড় অথবা জোয়ার গাছ ভরিয়া দেওয়া হয়।

কলের চাকা ঘুরাইলে ঐ রোলার দুইটী খড়ের আঁটী চাপিয়া ধরে এবং চাকার সহিত আঁটা দুইটী ব্লেডের মধ্যে চালনা করিয়া দেয়। সেখানে ঐগুলি টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া কাটীয়া যায়। এই যন্ত্রে $\frac{৫}{১৬}$—$\frac{৫}{৮}$ ইঞ্চি লম্বা করিয়া খড় কাটা যায়। প্রয়োজন হইলে ব্লেড খুলিয়া শান দেওয়া যায়। এই যন্ত্রে একজন লোক ঘণ্টায় এক মণ খড় কাটীতে পারে। ইহার আনুমানিক মূল্য প্রায় ২৫০৲। হস্তচালিত কল ব্যতীত অধুনা তড়িৎ চালিত কলের ব্যবহার হইতেছে।

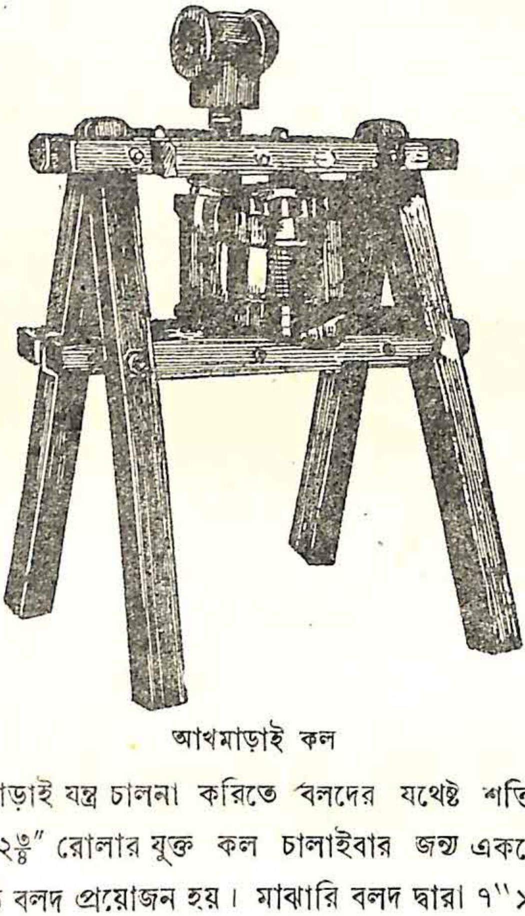


খড়কাটা কল

আখমাড়াই কল :—আখ চাষ করিলে খামারে আখমাড়াই কলের প্রয়োজন হয়।

আখের রস নিষ্কাশন করিবার জন্য বলদ অথবা মহিষ চালিত আখমাড়াই কলের যথেষ্ট প্রচলন হইয়াছে। আখমাড়াই কলের কাঠামো লোহাকাঠ দিয়া প্রস্তুত করা হয়। এই কলে তিনটী ভারি রোলার থাকে। একটী রোলার আখকে টানিয়া দুইটি রোলের মধ্যে

চালনা করিয়া দেয় এবং ঐ দুইটি রোলারের চাপে আখ পেষিত হইয়া রস নির্গত হইয়া আসে। এইরূপ যন্ত্রে আখের ৬০ শতাংশ রস নিষ্কাশিত হয় এবং ঘণ্টায় দুই মণ আখ পেষণ করা যায়।



আখমাড়াই কল

আখ মাড়াই যন্ত্র চালনা করিতে বলদের যথেষ্ট শক্তি ব্যয় হয়। ৮"×৮"×২¾" রোলার যুক্ত কল চালাইবার জন্য একজোড়া মহিষ অথবা বলিষ্ঠ বলদ প্রয়োজন হয়। মাঝারি বলদ দ্বারা ৭"×৮"×২¾" রোলার বিশিষ্ট আখমাড়াই কল চালনা করা যায়। ইহার অনুমানিক মূল্য ২০০৲।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বীজতলা প্রস্তুত, বীজ বপন, রোপণ এবং ফসলের মধ্যে পাইট

ভূমি কর্ষণ (Tillage)—মাটি কঠিন চাপ অবস্থায় থাকে। মাটির ঐ কঠিন স্তর ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিলে উদ্ভিদের মূল মাটির ভিতরে সহজে প্রবেশ করিয়া বিস্তৃত হইতে পারে তাহাতে উদ্ভিদের বৃদ্ধি হয়। মাটির কঠিন অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া বীজ বপন এবং ফসল বৃদ্ধির উপযোগী করাকে জমি চাষ (tillage of the soil) বলে। এই কাজটি সুসম্পন্ন করার উপর ফসলের উৎপাদন বিশেষভাবে নির্ভর করে।

কর্ষণদ্বারা জমির ভৌত অবস্থা পরিবর্ত্তন ব্যতীত মৃত্তিকার মধ্যে নানাবিধ রাসায়নিক ও জৈবিক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

ভৌত পরিবর্ত্তন—

(i) বন্ধুর জমি সমতল হয়, জমির কোন স্থানে জল দাঁড়াইতে পারে না ;

(ii) মৃত্তিকা কণাগুলি সুবিন্যস্ত হয় (improves the structure of the soil) ;

(iii) মৃত্তিকার কণাগুলি সুবিন্যস্ত হইলে উদ্ভিদের মূল বিশেষতঃ চারা ও কোমল উদ্ভিদ ও গুচ্ছমূলবিশিষ্ট উদ্ভিদের মূল মাটির মধ্যে সহজে বিস্তারলাভ করে, কন্দের বৃদ্ধি সহজ হয়। মূল বৃদ্ধি পাইলে মূলের শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া অধিক সংখ্যক মৃত্তিকা কণার সংস্পর্শে আসে এবং অধিক খাদ্য আহরণ করিতে সক্ষম হয়। সুতরাং উদ্ভিদের বৃদ্ধি দ্রুত ও অধিক ফলপ্রসূ হয় ;

(iv) মৃত্তিকা চূর্ণীকৃত হইলে বৃষ্টির জল জমি হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারে না, মাটি অধিক পরিমাণ জল শোষণ ও ধারণ করে।

কর্ষণের পর মই দিয়া উপরের মাটি সামান্য চাপিয়া দিলে মাটির মধ্যে জল সংরক্ষিত থাকে, বৃষ্টির জল অপচিত হয় না ;

(v) মৃত্তিকা চূর্ণ হইলে মৃত্তিকা কণাগুলির মধ্যে ফাঁকের সংখ্যা (Pore space) বৃদ্ধি পায় সুতরাং মৃত্তিকার অভ্যন্তরে অধিক বায়ু চলাচল করে তাহার ফলে মূল ও উদ্ভিদের অঙ্গজ বৃদ্ধি তরান্বিত হয় ;

(vi) কর্ষিত মৃত্তিকার অভ্যন্তরে তাপ সংরক্ষিত থাকে ;

(vii) আগাছাসমূহ দমিত হয়, ঐগুলি উৎপাটিত হইয়া মাটি চাপা পড়িলে পচিয়া জমি উর্ব্বর হয় ;

(viii) জমিতে সার প্রয়োগ করিলে সেইগুলি সর্ব্বত্রই মাটির সহিত সংমিশ্রিত হয় ;

(ix) মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থ কীট, শূক, পুত্ত প্রভৃতি মাটির উপর উৎক্ষিপ্ত হইয়া পক্ষী প্রভৃতি দ্বারা ভক্ষিত হয় এবং উদ্ভিদের রোগ-বীজাণু (Spores) উন্মুক্ত হইয়া সূর্য্যতাপে বিনষ্ট হয় ;

রাসায়নিক পরিবর্ত্তন—

নীচের মাটি উপরে উঠিয়া আসিলে জল, বায়ু ও তাপের প্রভাবে ঐগুলি অধিক চূর্ণীত হয় এবং নানাপ্রকার রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া অলভ্য খাদ্যবস্তুগুলি উদ্ভিদের পক্ষে সহজলভ্য অবস্থায় আসিতে থাকে।

জৈবিক পরিবর্ত্তন—

জল, বায়ু ও তাপের প্রভাবে মৃত্তিকার মধ্যে ব্যাক্‌টিরিয়া প্রভৃতির বৃদ্ধি ঘটে ও উহারা সক্রিয় হয়।

আর এক দিক দিয়া—"Tillage is manuring" অর্থাৎ জমি কর্ষণ করার অর্থ জমিতে সার দেওয়া, উর্ব্বর করা।

ফসল উৎপাদনের জন্য দুই প্রকার প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়—(১) মাটির কঠিন স্তর ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া মাটি বীজ বপনের উপযোগী করা ; (২) চারা জন্মিবার পর ফসলের মধ্যে জমির পাইট করা (interculture)।

প্রথম বৃষ্টিপাতের পর মাটির জো অর্থাৎ মাটি সরস হইলে লাঙ্গল দিয়া চাষ করিয়া মাটি খুলিয়া দেওয়া হয়। উপর্য্যুপরী কয়েকবার দেশী লাঙ্গল অথবা মোলবোর্ড লাঙ্গল, চাক্তি বিদা ও মই দিয়া মাটি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ঘাস আগাছা, শিকড় প্রভৃতি মাটি হইতে বাছিয়া ফেলা হয়। এই সময় জমির উপর সমভাবে (Heavy and bulky manures) গোবর, আবর্জ্জনা সার, পাঁকমাটি ইত্যাদি ছড়াইয়া লাঙ্গল অথবা বিদা দিয়া মাটীর সহিত মিশাইয়া মই দিয়া জমি সমতল করিয়া দিতে হয়। এইরূপে মাটি বীজ বপনের উপযোগী করা হয়।

বীজ তিন প্রকার পদ্ধতিতে বপন করা হয়—(১) বপন বা বীজ ছিটাইয়া বোনা (Broad casting)। জমির উপর বীজ ছিটাইবার পর চাষ ও মই দিয়া বীজগুলি মাটির ভিতর ঢাকিয়া ও চাপিয়া দেওয়া হয়;

(২) বপন যন্ত্রের সাহায্যে (seed drill) সারি করিয়া বীজ বপন করা (drilling)।

(৩) লাঙ্গলের আঁতরের মধ্যে একটী একটী করিয়া বীজ ফেলিয়া মই দিয়া মাটি চাপা দেওয়া, অথবা গর্ত্ত করিয়া গর্ত্তের মধ্যে বীজ পুঁতিয়া দেওয়া। ইহাকে (Dibbling) বীজপোঁতা বলে।

রোপণ (Transplanting) ঃ—কোন কোন ফসলের বীজ বিশেষ শীতকালীন সবজি ও ফুলের বীজ এবং ফলের বীজ হাপর বা বীজতলায় বপন করিয়া চারা প্রস্তুত করা হয় এবং চারাগুলি উপযুক্ত হইলে তুলিয়া জমিতে রোপণ করা হয় (transplanting)।

বীজতলা

সর্ব্বপ্রকার আবাদী ফসল, যেমন ধান এবং তরিতরকারী, ফল ও ফুলের বীজ সরাসরি বপন করিলে গাছ ভাল হয় না এবং আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। বোনা (Broad casting) অপেক্ষা রোয়া ধানের (Transplanting) ফলন অধিক হয়। শীতকালীন সব্জী, ফুল ও ফলের চারা পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়া পরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রোপণ করা হয়। যে জমিতে বীজ হইতে প্রথমে চারা উৎপাদন

করা হয় তাহাকে বীজতলা বা হাপর বলে। ধানের বীজতলা সম্বন্ধে ধান চাষের অধ্যায়ে বিশদভাবে উক্ত হইয়াছে। এস্থলে শাক্‌সবজি ফুল ও ফলের বীজতলা প্রস্তুত বিষয়ে বলা হইতেছে।

স্থান নির্ব্বাচন—সাধারণতঃ উঁচু জমি যেখান হইতে সহজে জল নিকাশ হইয়া যায়, নিকটে কোন বড় গাছ নাই এবং সেচের জন্য সহজে জল পাওয়া যায় এইরূপ স্থান বীজতলার জন্য নির্ব্বাচন করিতে হয়।

মাটি—বেলে দোআঁশ অথবা দোআঁশ মাটি বীজতলার পক্ষে প্রশস্ত। এঁটেল বা ভারি মাটি বীজতলার পক্ষে অনুপযুক্ত।

মাটি শোধন—মাটির মধ্যস্থ কীট ও রোগবীজাণু বিনষ্ট করিবার জন্য বীজতলার উপরিভাগের মাটি পুড়াইয়া দেওয়া অথবা মাটিতে প্রতিষেধক ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয়।

বীজতলা বা হাপর প্রস্তুতি (Preperation of seedbed)—মাটি ৯''—১২'' গভীর করিয়া কোদলাইয়া মিহি করিয়া চূর্ণ করিতে হয়। জমি হইতে ৩''—৬'' উচ্চ ১০ ফুট লম্বা ও ৩ ফুট চওড়া বীজ-তলা প্রস্তুত করিতে হয়। প্রয়োজন মত বীজতলার আয়তনের তারতম্য করা যাইতে পারে। এইবার উহার উপর তিন ঝুড়ি কাঠের ছাই এবং তিন ঝুড়ি পচাগোবর সার এবং এক পাউণ্ড সুপার ফস্‌ফেট সার সমভাবে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। মাটির উপর স্তরে তিন ইঞ্চির মধ্যে কোদাল দিয়া উত্তমরূপে সার মিশাইয়া দেওয়া হয়। তারপর হাপরের উপর পাতলা করিয়া কিছু গুঁড়া আবর্জ্জনা সার (compost) ছড়াইয়া দিলে বীজতলা প্রস্তুত হয়। এই প্রকারে শাকসবজি, ফল, ফুল প্রভৃতির চারা উৎপাদনের পক্ষে আদর্শ বীজতলা (ideal seed bed) প্রস্তুত হয়।

এই আকারের হাপরে ২—২½ তোলা কপি প্রভৃতির ন্যায় ক্ষুদ্র বীজ বপন করা যায়। বীজ খুব ছোট হইলে ৬—৮ গুণ পরিমাণ ছাই বা সূক্ষ্ম বালি মিশাইয়া পাতলা করিয়া (Thinnly) সমভাবে (uni-

formly) হাপরের উপর ছিটাইয়া দেওয়া হয়। বীজ ছিটাইবার পূর্ব্বে হাপরের মাটিতে জো করিয়া রাখিতে হয় (Moist but not soaking wet)। বীজ বুনিবার পর মিহিমাটি বীজের উপর ছড়াইয়া ঢাকিয়া দেওয়া হয়। সন্ধ্যার প্রাক্কাল বীজ বপনের প্রশস্ত সময়। পিপীলিকা প্রভৃতির আক্রমণ রোধ করিবার জন্য হাপরের চারিপার্শ্বে কেরোসিন মাখা ছাই অথবা গ্যামাক্সিন ১" চওড়া করিয়া বেড় দেওয়া হয়। প্রখর রৌদ্রতাপ হইতে চারাগুলি রক্ষা করিবার জন্য আচ্ছাদন দেওয়া প্রয়োজন হইতে পারে। রৌদ্র পড়িলেই আচ্ছাদন উঠাইয়া লইতে হয়। হাপরে ঘাস আগাছা জন্মিতে দেখিলেই তুলিয়া ফেলিতে হয়। প্রয়োজনমত জল ছিটাইতে হয়। ২" লম্বা হইলে, চারাগুলি সাবধানে তুলিয়া ঐ হাপরেই ১" ব্যবধানে আবার বসাইয়া দিতে হয়। এইরূপ করিলে চারা শক্ত ও ভাল হয়। ৪"—৬" লম্বা হইলে চারাগুলি মাঠে লাগাইবার উপযুক্ত হয়। চারা লাগাইবার ব্যবধান উদ্ভিদের অঙ্গজ প্রকৃতি অনুযায়ী নির্দ্ধারণ করা হয়।

ফসলের মধ্যে পাইট (Intercultural operation)

জমিতে চারা লাগাইবার পর কিছু বাড়িলে জমির পাইট করা হয় (interculture)। ঘাস, আগাছা প্রভৃতি তুলিয়া এবং গাছের গোড়ায় সার দিয়া হাল্কা করিয়া মাটি খুঁড়িয়া দিতে হয়। তাহার পর সেচ দেওয়া হয়। যতদিন না উদ্ভিদ সতেজে বাড়িয়া উঠে ততদিন এই প্রকার পাইট মধ্যে মধ্যে করা প্রয়োজন।

মাটি প্রস্তুত করিবার সময় যতই সাবধানতা অবলম্বন করা যায় না কেন, আগাছা জন্মিবেই, কিছুতেই সম্পূর্ণ রোধ করা যায় না। ফসলের চারা অপেক্ষা আগাছা অধিক শক্তিশালী (Hardy)। উহারা শীঘ্র বাড়িয়া স্থান দখল করিয়া চারাগুলিকে চাপিয়া দেয়, উহাদের বৃদ্ধির পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করে। মাটি হইতে উদ্ভিদখাদ্য এবং জল টানিয়া লয় এবং প্রস্বেদন দ্বারা মৃত্তিকাস্থ জলের অপচয় ঘটায়। সুতরাং আগাছা দেখা দিলেই উহাদের ধ্বংস করিতে হয়।

জমির উপরিস্তর শক্ত হইয়া যাইলে মাটির অভ্যন্তরে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না এবং মাটির মধ্যস্থ জল উপরে (Surface) উঠিয়া বাষ্পীভূত হইয়া অপচিত হয়। বিশেষ বৃষ্টি বা সেচ দিবার পর জমির উপরিভাগ শুকাইয়া চটা (crust) পড়ে। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় মাটি হাল্‌কা করিয়া খুঁড়িয়া দিলে মাটির উপরে একটা আস্তরন (mulch) সৃষ্টি হয়। তাহার ফলে মাটিরমধ্যস্থ জল জমির উপর পর্য্যন্ত আসিতে পারে না, আস্তরনের নীচে থাকিয়া যায়, তাহাতে মাটির মধ্যে জল সংরক্ষিত থাকে এবং মাটির মধ্যে অবাধে বায়ু চলাচল করিতে পারে। এই সব পাইট করিলে চারা তাড়াতাড়ি বাড়িয়া যায়। মাঠে বীজ ছিটাইয়া বপন করা হইলে (Broadcast) উপরোক্ত পাইট করিবার পূর্ব্বে অতিরিক্ত চারা তুলিয়া ফেলিতে হয় (Thinning) এবং Hoe বা বিদা দিয়া মাটি হালকা করিয়া খুঁড়িয়া দিতে হয়।

পশ্চিম বাংলার ফসল

(প্রথম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট)

১৯৫৮-৫৯ সনের সরকারী বিবরণী হইতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রকার উৎপন্ন ফসলের নিম্নোক্ত তথ্য অবগত হওয়া যায়।

ফসলের নাম	জমির পরিমাণ হাজার একার হিসাবে	একার প্রতি ফলন মণ হিসাবে	মোট ফলন হাজার টন হিসাবে
আউস চাল	১২৭২.৫	৭.০৭	৩৩০.৩
আমন চাল	৯২১৩.৫	১০.৯৫	৩৭০৭.৮
বোরো চাল	৪৭.৪	১১.০৪	১৯.২
গম	৮৭.০	৭.৫০	২৪.০
যব	১০৭.৯	৭.২৮	২৮.৯
জোয়ার	৪৯.০	৬.৫৮	১.২
বাজরা	১.১	৫.৫৪	০.২

ফসলের নাম	জমির পরিমাণ হাজার একার হিসাবে	একার প্রতি ফলন মণ হিসাবে	মোট ফলন হাজার টন হিসাবে
ভুট্টা	১৩৩·৯	৭·৩৬	৩৬·২
রাগি	২৭·৫	৬·২৭	৬২·০
ছোলা	৪৭৬·৫	৬·২১	১০৮·৮
খরিফ ডাল	৫৬·২	৫·৫৯	১১·৫
রবি ডাল	১১৮৮·৩	৪·৯৮	২১৭·৭
তিল	১৯·৮	৪·৩৮	১·৯
সরিষা	২৪০·১	৪·৭৮	৪২·২
তিসি	৯৫·৪	৩·২১	১১·৩
ইক্ষু	৬৫·৯	৪৮৪·৯১	১১৭৪·০
আলু	১১৮·৪	১০০·৯৮	৪৩৯·২
তামাক	৩৮·৭	৬·৮৯	১০·৬
আদা	১·৬	১১·৭৮	০·৭
লঙ্কা	১৬·২	১০·৬৮	৬·৪
শন	১০·৬	১·৪৮	১৫·৭
			হাজার গাঁইট
পাট	৮৭৫·৮	২·৯৬	২৫৯৬·৬
মেস্তা	৩৬২·১	২·৩৮	৮৬১·১

এক গাঁইটের পরিমাণ ৪০০ পাউণ্ড

তূলা—জমি ৫০ একার এবং উৎপাদন ৫০ গাঁইটের কম হইলে হিসাবের মধ্যে ধরা হয় না। পশ্চিমবঙ্গে কার্পাস তূলার আবাদ উক্ত সংখ্যার কম।

তৃতীয় পরীক্ষাপত্র

পঞ্চম ভাগ

খামার পরিচালন ও পশুপালন

Syllabus

(i) Animal and its external parts.

(ii) Study of animals in relation to agriculture.

(iii) Handling of common farm animals, eg, Cattle, Buffalo and Goat including fowls.

(iv) The features of dairy type and comparison with draught and dual purpose types of Cattle.

(v) The Geographical spread of Dairying and Poultry farming in India. Statistics relating to West Bengal Live stock.

(vi) Origin and domestication of breeds of Live stock.

(vii) Characteristics and economic value of important breeds of Cattle and poultry.

(viii) Numbering, Castration with Burdizzo Castrator, ageing, casting and drenching etc.

পশুপালন

প্রথম অধ্যায়

Animal and its external parts. study of animals in relation to agriculture.

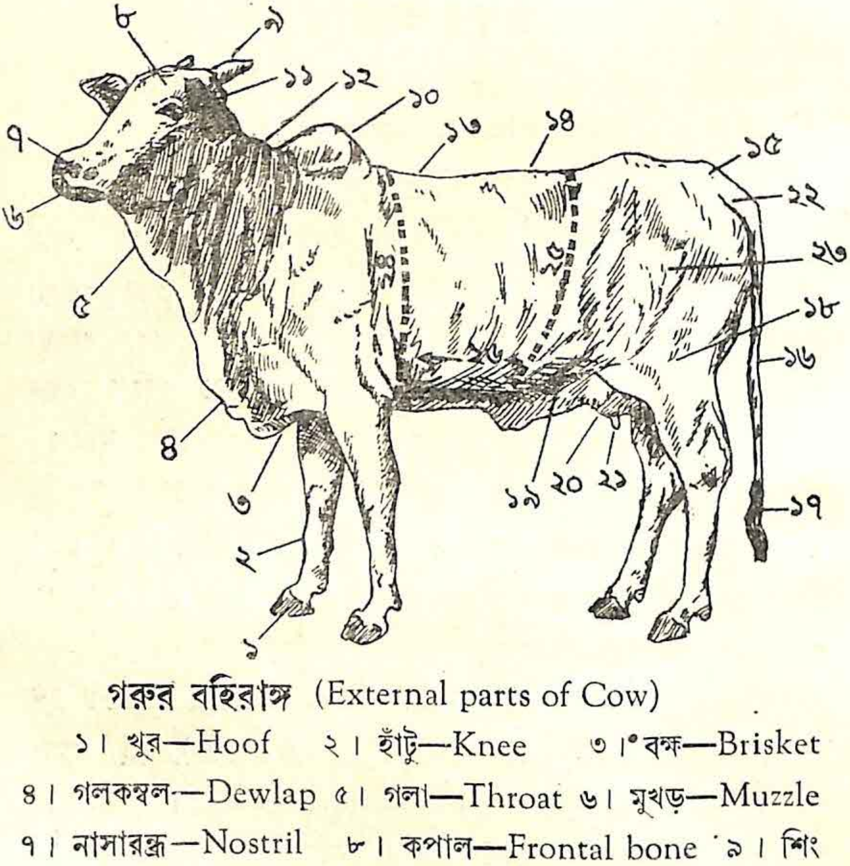
গৃহপালিত পশু

সম্ভবতঃ মানুষ বনের পশুর মধ্যে সর্ব্ব প্রথম কুকুরকে পোষ মানাইয়া শিকার সঙ্গী করিয়াছিল। তাহার পর গরু, ঘোড়া প্রভৃতিকে ভারবাহীরূপে ব্যবহার করিতে থাকে। যাযাবর অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া মানুষ যখন স্থায়ী বসবাস আরম্ভ করিল তখন ভারবহন ব্যতীত খাদ্য, বস্ত্র ও শিল্পোৎপাদানে উহাদের নিয়োগ করিল। মানুষের সহবাসে গৃহপরিবেশে প্রতিপালিত হইয়া পশুদের প্রকৃতি নম্র হইল এবং বন্য অবস্থা অপেক্ষা প্রভূত উন্নত হইল। এইরূপে কোন প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে গরু মানুষের অন্ন বস্ত্র উৎপাদনের প্রধান অবলম্বন হইয়া রহিয়াছে।

জীব-বিজ্ঞান অনুসারে আহার ভেদে মেরুদণ্ডী প্রাণীদিগকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—(i) মাংসাশী (Carnivorous), (ii) তৃণ-ভোজী (Harbivorous)। যেসব চতুষ্পদ জন্তুর সন্তান স্তন্য পান করে তাহাদের স্তন্যপায়ী (Mammal) বলে। ইহাদের মস্তকগঠন সম্মুখ ভাগে লম্বা। মাংসাশীদিগের মস্তকের গঠন গোলাকার। যে সব জন্তুর পায়ের খুর বিভক্ত তাহারা খাদ্য রোমন্থন করিয়া থাকে।

পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই গরু দেখিতে পাওয়া যায়। দেশ বিশেষের জলবায়ুর প্রভাবে উহাদের সামান্য আকৃতিগত পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। ভারতীয় গোরুর স্কন্ধদেশে কুকুদ থাকে। বৃষের কুকুদ অপেক্ষাকৃত বড় হয়। কয়েকজাতীয় গরুর কুকুদ থাকে না। গরু নিরীহ প্রকৃতির পশু, সহজে পোষ মানে ও পালকের অনুগত হয়। ইহারা

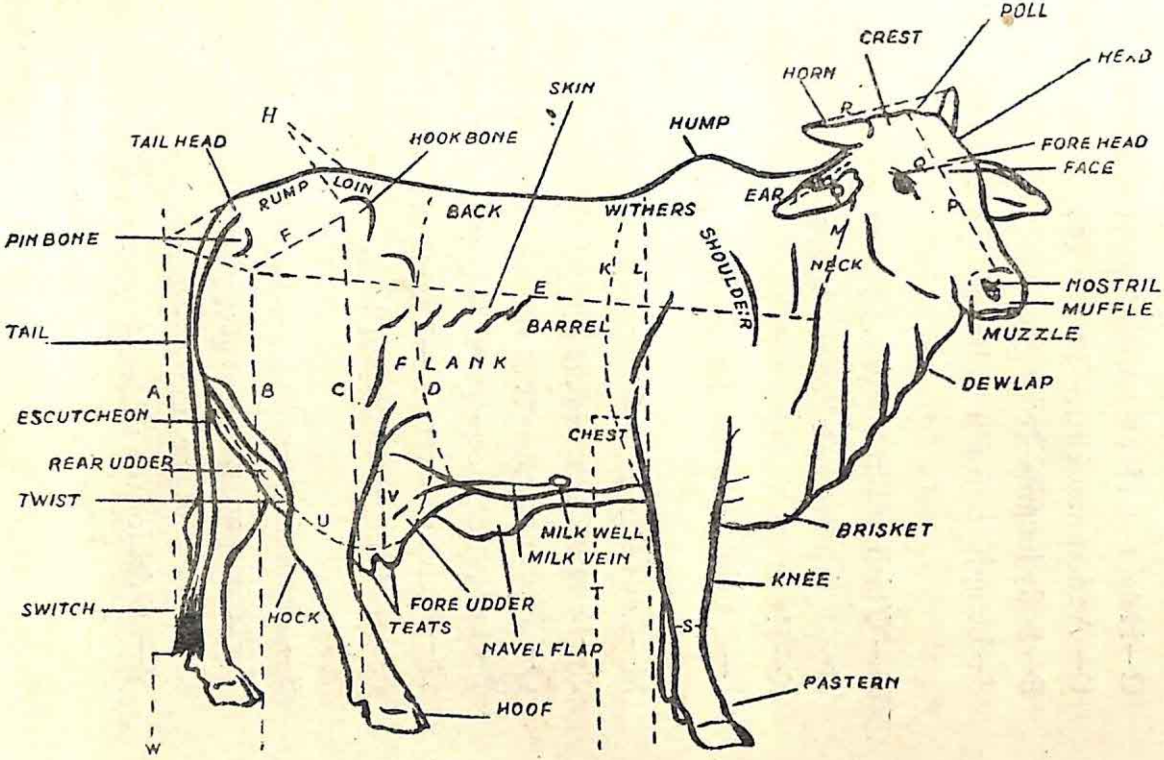
সহজে গৃহত্যাগ করে না। গরুর ঘ্রাণ ও শ্রবণশক্তি তীক্ষ্ণ। ঘ্রাণের সাহায্যে সকল বস্তুর স্বরূপ বুঝিতে পারে। ঘ্রাণশক্তির তুলনায় ইহাদের দর্শন শক্তি তত প্রখর নয়। ইহারা অত্যন্ত সন্তান বৎসল।



গরুর বহিরাঙ্গ (External parts of Cow)

১। খুর—Hoof ২। হাঁটু—Knee ৩। বক্ষ—Brisket ৪। গলকম্বল—Dewlap ৫। গলা—Throat ৬। মুখড়—Muzzle ৭। নাসারন্ধ্র—Nostril ৮। কপাল—Frontal bone ৯। শিং—Horn ১০। কুকুদ—Hump ১১। কান—Ear ১২। স্কন্ধ—Shoulder ১৩। পিঠ—Back ১৪। কোমর—Loin ১৫। লেজের গোড়া—Tailhead ১৬। লেজ—Tail ১৭। পুচ্ছ—Switch ১৮। উরুদেশ—Thigh ১৯। দুগ্ধ শিরা—Milk vein ২০। পালান—Udder ২১। বাঁট—Teat ২২। যোনি—Vagina ২৩। পার্শ্ব—Flank ২৪। দেহের পরিধি—Girth ২৫। উদরের পরিধি—Abdominal girth ২৬। উদর—Barrel।

গরুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—parts of Cow—*contd.*



A—Length of tail—লেজের দৈর্ঘ্য

B—Height of pin bone—খুঁটি অস্থির উচ্চতা

C—Height at Hook bone—আঁক্‌ড়া অস্থির উচ্চতা

D—Abdominal girth—কোমরের বেড়

E—Body length—দৈহিক দৈর্ঘ্য

F—Length from pin to hook—খুঁটি অস্থি হইতে আঁকড়া অস্থি পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্য

G—Width at pin bones—দুই খুঁটি অস্থির মধ্যের প্রস্থ

H—Width at hook bones—আঁকড়া অস্থির মধ্যের প্রস্থ

K—Heart girth—দৈহিক পরিধি বা বেড়

L—Height behind the hump—কুকুদের পশ্চাদপার্শ্বের উচ্চতা

M—Length of neck—ঘাড়ের দৈর্ঘ্য

N—Length of ear—কর্ণের দৈর্ঘ্য

O—Width of ear—কর্ণের প্রস্থ

P—Length of face—মুখমণ্ডলের দৈর্ঘ্য

Q—Width of forehead—কপালের প্রস্থ

R—Width between tip of horns—শৃঙ্গ দুইটির মধ্যবর্ত্তী দৈর্ঘ্য

S—Circumference of the shank—পায়ের অস্থির পরিধি

T—Height at elbow—কনুইয়ের উচ্চতা

U—Length of the udder—পালানের দৈর্ঘ্য

V—Width of the udder—পালানের প্রস্থ

W—Tip of the tail from the ground—জমি হইতে লেজের অগ্রভাগ।

Face মুখমণ্ডল Head মস্তক Forehead কপাল Poll মস্তকের পশ্চাদার্দ্ধ Nostril নাসারন্ধ্র Muffle ওষ্ঠ ও নাসার স্থূল অংশ

Muzzle মুখড় Crest ঝুঁটি Horn শিং Ear কান Neck ঘাড় Hump কুকুদ Shoulder স্কন্ধদেশ Withers স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সন্ধিস্থান Skin চর্ম্ম Back পৃষ্ঠদেশ Loin কোমর Rump পাছা, শিরদাঁড়ার প্রান্ত এবং তৎসন্নিহিত অংশ Tail Head লেজের গোড়া Pinbone খুঁটি অস্থি Hook bone আঁকড়া অস্থি Tail লেজ Escutcheon সুচিহ্ন লোমরাজী Rear udder পালনের পশ্চাদভাগ Twist পেঁচ বা পাক Switch লেজের কেশগুচ্ছ Hock পশ্চাদপদের কনুই Teats বাঁট fore udder পালনের সম্মুখভাগ Hoof খুর Navel flap নাভি দেশের ঝোলা মাংস Milk vein দুগ্ধশিরা Milk well দুগ্ধকূপ Chest বক্ষপঞ্জর Barrel উদর Dewlap গলকম্বল Brisket পঞ্জর সংলগ্ন বক্ষোমাংস Knee জানু, হাঁটু Pastern গুল্‌ফ খুর ও উপরের গ্রন্থির মধ্যের অংশ, Flank পার্শ্বাঙ্গ।

কৃষি সম্পর্কে পশু পর্য্যালোচনা

(Study of animals in relation to agriculture)

ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। এ দেশের প্রায় ৮৫ শতাংশ অধিবাসী গ্রামে বাস করে। গ্রামীণ অর্থনীতির সহিত গরু ও মহিষ অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত। এই স্থানের কৃষিব্যবস্থা এখনও সম্পূর্ণরূপে গরু ও বলদের উপর নির্ভরশীল। গত আদমসুমারির হিসাব অনুযায়ী ভারতবর্ষে গরুর সংখ্যা ১,৫৮৯ লক্ষ এবং মহিষের সংখ্যা ৪৪৮ লক্ষ। পৃথিবীর কোন দেশে এত সংখ্যক গরু নাই। ইহাদের মধ্যে ৯৫ শতাংশ গ্রামে এবং ৫ শতাংশ দুধের জন্য শহর ও শহরতলী অঞ্চলে পালন করা হয়। পৃথিবীর মোট গৃহপালিত গো-মহিষের এক চতুর্থাংশের অধিক ভারতবর্ষে রহিয়াছে। এই সংখ্যা কিঞ্চিদধিক ২০ কোটি। ইহাদের নিকট হইতে বৎসরে ৪০ কোটি টন গোবর পাওয়া যায়। গোবরে ০·৫ শতাংশ নাইট্রোজেন থাকে। সুতরাং ঐ গোবর হইতে ২০ লক্ষ টন নাইট্রোজেন পাওয়া যাইতে পারে। উহা এক কোটি টন অ্যামো-নিয়াম সাল্‌ফেটের সমতুল্য। মৃত গো-মহিষের হাড় হইতে Bone

meal সার প্রস্তুত হয়। কৃষিমন্ত্রী ডাঃ আহমেদের মতে এদেশে গো-মহিষ হইতে বাৎসরিক এক হাজার কোটি টাকা মূল্যের শ্রম এবং সমপরিমাণ মূল্যের সার পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে গরুর শ্রম, দুধ, সার, মাংস, হাড়, চামড়া ও রপ্তানী প্রভৃতির মোট বাৎসরিক মূল্য কয়েক সহস্র কোটি টাকা।

ভূমিকর্ষণ, ভারবহন, যাত্রীগাড়ীটানা, ঘানি ও সেচযন্ত্রাদি পরিচালনা, শস্য মাড়াই প্রভৃতি বিবিধ কার্য্যে বলদ নিযুক্ত হয়। এক সময় দ্রুত যাত্রীগাড়ী টানিবার জন্য (fast trotting bullocks) অমৃতমহাল, নাগোরী প্রভৃতি জাতীয় বলদ প্রসিদ্ধ ছিল। যুদ্ধের কামান টানিবার জন্য হাঁনসি, কাঁক্রেজি, মহিশূরী বলদ ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমানে প্রগতিশীল দেশে কৃষিকার্য্যে যান্ত্রিক শক্তির প্রচলন হইলেও ঐসকল মূল্যবান যন্ত্র এ দেশের সাধারণ কৃষকের এখনও নাগালের বাহিরে রহিয়াছে। সেইজন্য ভারতবর্ষে অধুনা যে সব শ্রমসংক্ষেপকারী উন্নত ধরনের কৃষিযন্ত্র কৃষকদের মধ্যে প্রবর্ত্তনের চেষ্টা চলিতেছে সেইগুলি শক্তিশালী বলদ দ্বারা পরিচালন করিবার উপযোগী করিয়া নির্ম্মিত হইতেছে। এ দেশে পশুশক্তির সাহায্যে কৃষিকার্য্য কিছুকাল চলিতে থাকিবে। ভারতবর্ষের কৃষিব্যবস্থা গরুর সহিত এইরূপ অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত বলিয়া গরুর উৎকর্ষের উপর কৃষির উন্নতি নির্ভর করিতেছে। ভারতবর্ষে কৃষিউন্নত অঞ্চলগুলিতেই উন্নতশ্রেণীর গরু দেখা যায়। ঐ সব গরু হইতে কর্ম্মঠ ও শক্তিশালী বলদ পাওয়া যায়। ঐ প্রকার বলদ কৃষির উৎকর্ষসাধক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

Handling of common farm animals e.g. cattle, buffalo and goat including fowls. Approaching, grooming, cleaning and controlling live animals.

খামার পশু পরিপালন

গৃহপালিত পশু নিরীহ প্রকৃতির হইয়া থাকে। পালকের সদ্‌-ব্যবহারে উহারা শীঘ্রই আকৃষ্ট ও বশীভূত হয়। যত্ন সহকারে পালন করিলে উহারা প্রতিদানে কার্পণ্য করে না। নিজহস্তে খাইতে দিলে গৃহপালিত পশু দুই একদিনের মধ্যে অনুগত হয় এবং পালককে দেখিবামাত্র তাহার নিকটে আসে। গায়ে হাত বুলাইয়া আদর করিলে উহারা আনন্দবোধ করে।

গৃহপালিত পশুকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিলে এবং যথাযথ পরিচর্য্যা করিলে উহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে, সহজে রোগাক্রান্ত হয় না। দুগ্ধবতী গাভীর দুগ্ধদান ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। উহাদের বাসস্থানও সর্ব্বদা পরিষ্কৃত রাখিতে হয়। তাহার মধ্যে যেন রৌদ্র ও বায়ু অবাধে প্রবেশ করে। গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি রোমন্থনকারী পশুদের পালন, আহার, প্রজনন প্রভৃতি প্রায় অনুরূপ।

গৃহপালিত পশুর পরিপালনবিধি নিম্নোক্ত প্রকার—

(i) গাত্রমার্জ্জনা (Grooming) প্রতিদিন গরুর গাত্র নরম নারিকেল দড়ি বা শুষ্ক খড় দিয়া মর্দ্দন করিয়া দিতে হয়। নিয়মিত গাত্র মর্দ্দন ও মার্জ্জনা করিলে চর্ম্মের ক্লেদ, ঝরালোম, দেহসংলগ্ন ময়লা, প্রভৃতি পরিষ্কৃত হয়। দেহে রক্ত চলাচল সুচারু-রূপে চলিতে থাকে। দেহকান্তি বৃদ্ধি পায়। স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

(Lice, ticks) ডাঁস, এঁটুলি প্রভৃতি পোকামাকড় গায়ে লাগিয়া থাকিতে পারে না।

(ii) **লোম ছাঁটাই** (Clipping) পালানের চারিপার্শ্বের, পার্শ্বাঙ্গের, উরুদেশের লোম এবং লেজের অগ্রভাগ মধ্যে মধ্যে ছাঁটিয়া দেওয়া উচিত। ইহাতে উহার গাত্র পরিষ্কার থাকে এবং দোহনকালে গাত্র হইতে ঐ সকল বস্তু দুধে পড়িয়া দুধ অপরিষ্কৃত হয় না।

(iii) **গাত্র পরিষ্কার ও স্নান** (Cleaning) :—দোহনের পূর্ব্বে গাভীর পশ্চাদভাগ ধুইয়া ভালরূপে পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। পালান এবং বাঁটগুলি গরমজল দিয়া ধুইয়া দিতে হয়, যেন কোন প্রকার ময়লা, গোবর প্রভৃতি লাগিয়া না থাকে।

সুস্থ অবস্থায় নিয়মিত স্নান করান উচিত। গ্রীষ্মকালে প্রত্যহ, বর্ষাকালে সপ্তাহে দুই একবার এবং শীতকালে মাসে একবার স্নান করাইতে হয়। স্নানকালে পরিষ্কার খড়, নারিকেল দড়ি অথবা ব্রাশ দিয়া গাত্র পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। স্নানের পর গাত্র শুষ্ক করিয়া মুক্ত বায়ুতে খোলা মাঠে চরিবার জন্য পাঠাইতে হয়। রৌদ্রজ্জ্বল দিন স্নানের পক্ষে প্রশস্ত। দুগ্ধপোষ্য বাছুর ও ছাগলের স্নানের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু উহাদের দেহের ময়লা ধুইয়া পরিস্কার করিয়া দিতে হয়। মহিষকে গ্রীষ্মকালে জলাশয়ে কিছুকাল ছাড়িয়া দিতে হয়। জল কাদায় গড়াগড়ী (wallowing) দিলে উহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং অধিক দুধ দেয়। পশুর পা ও ক্ষুরের ফাঁকের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। ঐস্থানে যেন ময়লা, মাটি, কাঁকর প্রভৃতি ঢুকিয়া অথবা কাঁটা ফুটিয়া না থাকে। খুরের ফাঁক অপরিষ্কার থাকিলে কীটের আক্রমণে ক্ষত ও ব্যাধি সৃষ্টি হয়।

(iv) **চারণ** (Grazing) :—গৃহপালিত পশু মাত্রেরই ব্যায়ামের প্রয়োজন। উহাদের উন্মুক্ত মাঠে যত অধিক চরিতে দেওয়া যায় ততই উহাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকার হয়। প্রতিদিন অন্ততঃ কয়েক ঘণ্টা মুক্ত মাঠে বিচরণ করিতে দেওয়া অত্যাবশ্যক। ঘরের মধ্যে

সর্ব্বদা আবদ্ধ রাখিলে স্বাস্থ্যহানী ঘটে। ষাঁড়, শুষ্কগরু (dry cow) বাছুর, ছাগল প্রভৃতিকে সারাদিন মাঠে চরিতে দেওয়া উচিত। পূর্ণ গর্ভাবস্থায় গাভীকে অন্যান্য গরুর সহিত একত্রে মাঠে যাইতে দেওয়া সমীচীন নয়।

(v) **জল পান করান** (watering) :—পানের জন্য সর্ব্বদা প্রচুর বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখিতে হয় যাহাতে উহারা ইচ্ছামত জল পান করিতে পারে। একটি পূর্ণ বয়স্ক গরুর পানের জন্য দৈনিক প্রায় ১০০ পাউণ্ড জল প্রয়োজন হয়।

(vi) **রক্ষণাবেক্ষণ** (protection) :—প্রখর রৌদ্র ও বর্ষা হইতে পশুদের রক্ষা করিতে হয়। গাছতলা না পাইলে অতি গরম ও বৃষ্টির সময় ঘরের মধ্যে রাখা বিধেয়। প্রচণ্ড রৌদ্রে, মুষলধারা বৃষ্টিতে ভিজিলে কিম্বা খুব ঠাণ্ডা শীতের হাওয়া লাগিলে পশুরা অসুস্থ হইয়া পড়ে, বিশেষ ছাগল ও মুর্গী আদৌ বৃষ্টি সহ্য করিতে পারে না। বাছুর জলে ভিজিলে রোগাক্রান্ত হয়, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে। শীতের রাত্রে উহাদের গরম ঘরে রাখা প্রয়োজন। মেঝেতে শুষ্ক খড় বিছাইয়া শয্যার ব্যবস্থা করা খুবই ভাল। মূত্রসিক্ত খড় গোবরের সহিত মিশিয়া উৎকৃষ্ট জমির সার প্রস্তুত হয়।

(vii) **রুগ্ন পশুকে পৃথক রাখা** (Seggregation) :—রুগ্ন পশুকে অন্যান্য সুস্থ্য পশু হইতে দূরে পৃথক করিয়া রাখিতে হয়। মুর্গীর স্বাস্থ্য পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। মুর্গীর খোঁয়াড় (Pen) প্রতিদিন পরিস্কার করিয়া দিতে হয় এবং নিয়মিত রোগবীজাণুনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া খোঁয়াড় বিশোধন করিতে হয়। উহাদের বিচরণক্ষেত্র মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তন করিতে হয়। বিচরণ ক্ষেত্রের মাটি মধ্যে মধ্যে খুঁড়িয়া চূণ ছিটাইয়া দিতে হয়। রোগাক্রান্ত মুর্গীর মল রোগবীজাণুপূর্ণ থাকে, এমন কি সুস্থ মুর্গীর মলেও নানা-প্রকার রোগ বীজাণু থাকে। ঐ মল হইতে রোগ সংক্রামিত হয়। সেইজন্য মুর্গীর মল সর্ব্বদাই পরিস্কার করিয়া দিতে হয়।

মুর্গীকে ভোর হইতে সারাদিন উন্মুক্ত স্থানে ছাড়িয়া দিতে হয়। সন্ধার পর কেবল রাত্রিকালে উহাদের ঘরের ভিতরে রাখিতে হয়। রৌদ্রের সময় মুর্গীর জন্য ছায়াশীতল স্থানের ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হয়। মুর্গীর বিচরণক্ষেত্রে (Run) গাছের ছায়া না থাকিলে ঘাস বা খড়ের চালা করিয়া দিতে হয়, রৌদ্র অসহ্য হইলে যাহাতে উহার মধ্যে আশ্রয় লইতে পারে।

গরু, মহিষের মত মুর্গীর জল দিয়া স্নানের আবশ্যক হয় না, কিন্তু ধূলা, বালি দ্বারা উহাদের নিত্য স্নানের (Dust bath) একান্ত প্রয়োজন। মুর্গীর বিচরণক্ষেত্র বালুময় হইলে সেই বালুতে উহারা ঐকার্য্য করিয়া থাকে। বিচরণক্ষেত্র এটেল মাটিযুক্ত হইলে ধূলি-স্নানের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হয়। এক ফুট গভীর একটি কাঠের বাক্সে ধূলা, সূক্ষ্ম বালি অথবা ছাই দিয়া পূর্ণ করিয়া ছায়াযুক্ত স্থানে রাখিলে উহারা ইচ্ছামত উহার মধ্যে ধূলিস্নান করিয়া লইতে পারে। ইহাতে উহাদের যথেষ্ঠ ব্যায়াম হয় এবং স্বাস্থ্য ভাল থাকে। বিশেষজ্ঞ-দের মতে মুর্গীর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ধূলিস্নান একান্ত আবশ্যক।

মুর্গীর গায়ে মধ্যে মধ্যে গ্যামাক্সিন গুড়া মাখাইয়া দিলে উহাদের গায়ের পোকা মরিয়া যায় এবং পোকার আক্রমণ হয় না।

গোপালনকালে কয়েকটি সাধারণ প্রক্রিয়া অবলম্বনের আবশ্যকতা হয়—

(i) পরীক্ষার জন্য গরুর নিকট যাওয়া (Approaching)

গরুকে পরীক্ষা করিবার কালে ডানপার্শ্ব দিয়া—অর্থাৎ যে দিকে বসিয়া দুধ দোহন করা হয়—উহার নিকটে অগ্রসর হইতে হয়। প্রথমে উহাকে আদর করিয়া, পিঠ চাপড়াইয়া, গা চুলকাইয়া, মিষ্ট ভাষণ প্রয়োগ করিয়া শান্ত করিতে হয়। গরুর মুখ, গলা অথবা মস্তক পরীক্ষাকালে গো-রক্ষক গরুর শিং দুইটি ধরিয়া থাকিবে এবং পরীক্ষক বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ গরুর দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে এবং তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি দুইটি বাম নাসারন্ধ্রের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া ধরিবে।

দক্ষিণ হস্তদ্বারা মাথা ও মুখ পরীক্ষা করিবে। অঙ্গুলি দিয়া ঐরূপে ধরিবার পরিবর্ত্তে Bullholders নামক সাঁড়াশী যন্ত্রদ্বারা নাসিকা ধরিয়া পরীক্ষা করা যায়।

(ii) গরুকে উঠান (Raising)

গরু শুইয়া থাকাকালে উঠাইবার প্রয়োজন হইলে প্রথমে মিষ্ট কথা বলিয়া উহার পশ্চাদের উরুদেশে পা দিয় লঘুচাপ দিলে উঠিয়া দাঁড়ায়। এইরূপে না উঠিলে চাপ দিয়া উহার লেজ মাড়াইলে উঠিয়া পড়ে। অনেক সময় কাজ করিতে অনিচ্ছুক বলদ শুইয়া পড়ে, সহজে উঠিতে চায় না। উক্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া উহাকে উঠাইতে হয়।

(iii) গরু আয়ত্তে আনা (Controlling)

দুরন্ত গরুকে আয়ত্তাধীনে রাখিবার জন্য উহার মুখের উপর দড়ির ফাঁস (Halters) পরাইয়া ফাঁসের সহিত দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া রাখা হয়।

দুরন্ত ষাঁড়কে সংযত করিবার জন্য উহার নাক ছিদ্র করিয়া তামা অথবা পিতলের কড়া বা রিং (Nose ring) পরাইয়া দেওয়া হয়। দুই পার্শ্ব হইতে কড়ায় দড়ি বাঁধিয়া অথবা আঁকৃশি (Hooks) দিয়া উহাকে ধরিয়া রাখা হয়। বাছুরের বয়স এক বৎসর হইলে নাক ছিদ্র করিয়া কড়া পরাইতে হয়।

বলদের নাকে ছিদ্র করিয়া উহার মধ্য দিয়া দড়ি পরাইয়া মাথার উপরে বাঁধিয়া রাখা হয়। গলার দড়ির সহিত উহা সংযুক্ত করিয়া উহাকে পরিচালন করা হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

Features of Dairy type and comparsion with draught and dual purpose types of Cattle

দুগ্ধশালার গরু, মহিষ ও কাজের বলদের লক্ষণ

ভারতবর্ষে বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি বিশিষ্ট গোবংশ (Breeds) রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে কয়েক জাতির গাভীর দুগ্ধদান ক্ষমতা বেশ ভাল, কয়েকটি জাতি হইতে ভারবাহী এবং কৃষিকার্য্যের উপযোগী উৎকৃষ্ট বলদ উৎপন্ন হয়। আবার কয়েকটি জাতি আছে যাহাদের গাভী যথেষ্ট দুধ দেয় এবং শক্তিশালী ও পরিশ্রমী বলদও পাওয়া যায়, উহারা কৃষকের উভয় প্রয়োজন সাধন করিয়া থাকে, (Dual purpose) অর্থাৎ উভয় উদ্দেশ্যসাধক।

দুগ্ধবতী গাভীর লক্ষণ

উন্নত দেশে সচরাচর প্রত্যেকটি গরুর উৎপন্ন দুধের পরিমাণ এবং দুধে স্নেহের (Butter fat) পরিমাণের হিসাব রাখা হয়। অধিকন্তু গরুর বংশ পরিচয় অর্থাৎ পূর্ব্ব পুরুষের ইতিহাস—কে কি পরিমাণ ও কি প্রকার দুধ দিয়াছিল, বিশেষ পিতার কুলজী রাখা হয়। ঐসব বিবরণ হইতে গরু ভাল মন্দ বিচার করা হয়। ভারতবর্ষে একমাত্র সরকারী পশু প্রজনন কেন্দ্র ব্যতীত কোথাও ঐ প্রকার কুলজী রাখা হয় না। সুতরাং গরু নির্ব্বাচনকালে উহার দেহগঠন ও দুগ্ধদান ক্ষমতা দেখিয়া মোটামুটি বিচার করা ব্যতীত উপায়ন্তর থাকে না।

রক্তের উপাদান হইতে দুগ্ধ উৎপাদিত হয়। পালানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত রক্তের চারিশত ভাগ হইতে মাত্র একভাগ দুধ নিঃসৃত হয়। রক্ত উৎপন্ন হয় খাদ্য হইতে। গরু যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য খাইয়া জীর্ণ করিতে সমর্থ হইলে দেহে অধিক রক্ত উৎপাদিত হয়। সুতরাং যে

সকল আঙ্গিক লক্ষণ দ্বারা গরুর উক্ত ক্ষমতা বিচার করা যায় সেইগুলি প্রথমে লক্ষ্য করিতে হয়। লক্ষণগুলি নিম্নপ্রকার—

(১) দেহ গঠন

(ক) আকার সাধারণভাবে বেশ বড় ;

(খ) উদর বৃহৎ, পিপার মত আকৃতিক (big roomy barrel shaped) ;

(গ) দেহ ত্রিভুজাকৃতি (wedge shaped) অর্থাৎ সম্মুখভাগ হইতে পাশ্চাদভাগ ক্রশশঃ অধিক চওড়া ;

(ঘ) মেরুদণ্ড বেশ শক্ত, সবল ও সোজা, এইরূপ হইলে দেহভার অনায়াসে বহন করিতে সক্ষম হয় ;

মুখ—মুখগহ্বর বেশ চওড়া হইলে তাড়াতাড়ি অধিক খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে। গরুর মুখ এই প্রকার থাকিলে গরুটি যে অধিক পরিমাণ আহার্য্য গ্রহণ সক্ষম তাহাতে সংশয় থাকে না।

(২) অধিক খাদ্য গ্রহণের সার্থকতা দৈহিক পুষ্টিসাধনে। খাদ্যের পরিণতি অধিক গোবরে বর্ত্তাইলে অধিক খাদ্য গ্রহণ নিরর্থক। সেইজন্য গরুর দেহের বিভিন্ন অঙ্গের প্রক্রিয়া সুচারুভাবে নিষ্পন্ন হইবার লক্ষণগুলি উহার দেহে বর্ত্তমান কিনা সেইগুলি লক্ষ্য করিতে হয়। এইজন্য ঃ

(ক) বুক বেশ গভীর ও প্রশস্ত হইবে,

(খ) সম্মুখের পা দুইটি যথেষ্ট ফাঁক ফাঁক থাকিবে,

(গ) পঞ্জরাস্থিগুলি বেশ মোটা, পরস্পর ফাঁক ফাঁক এবং যথেষ্ট বাঁকান হইবে। এইরূপ হইলে বুকের মধ্যে বেশী স্থান থাকে তাহাতে ফুস্‌ফুস ও হৃদপিণ্ড বড় ও অধিক কার্য্যক্ষম হয়,

(ঘ) নাসিকা প্রশস্ত এবং নাসিকাগহ্বর প্রশস্ত হইলে শ্বাসকার্য্য ভালভাবে চলিতে থাকে,

(ঙ) উজ্জ্বল চক্ষু উত্তম স্বাস্থ্যের লক্ষণ,

(চ) গাত্রচর্ম্ম কোমল ও ঢিলা এবং লোম মসৃণ হইবে,

(ছ) কর্ণের অভ্যন্তর ভাগ ঈষৎ হরিদ্রাভ মোমের মত চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত হইবে। এইরূপ থাকিলে ভালরূপে রক্ত চলাচলের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এইসব লক্ষণ ব্যতীত দেহসৌষ্ঠব, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সুলক্ষণের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতে হয়।

(৩) খাদ্যপরিপাক

খাদ্য গৃহীত হইবার পর উহা দেহের মধ্যে নানারূপে প্রযুক্ত হইতে পারে, যেমন মাংস ও চর্ব্বি অথবা দুগ্ধ সৃষ্টি করিতে পারে, সেইজন্য দেহের অন্যান্য অবয়বগুলি দেখিতে হয়। অবয়বগুলি নিম্নোক্ত প্রকার হইলে অধিক দুগ্ধ উৎপাদিত হয় ;

(ক) পালান (udder) বেশ বড় হইবে। পালান বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ঠ স্থান থাকা আবশ্যক। তজ্জন্য পশ্চাদের পা দুইটি বেশ ফাঁক ফাঁক থাকিবে যাহাতে উরুদ্বয়ের মধ্য পর্য্যন্ত পালান বিস্তৃত হইতে পারে। কোমর সোজা ও সমতল হইবে। পালানটি সম্মুখে ও পশ্চাদে সমভাবে প্রসারিত এবং পালানের তলদেশ সমতল হইবে। পালান কেবল বড় হইলে চলিবে না, উহা স্পঞ্জের মত নরম এবং দুগ্ধ দোহনের পর সঙ্কুচিত হইয়া স্থিতিস্থাপক (elastic) ভাঁজে ঝুলিয়া থাকিবে। পালান এই প্রকার হইলে উহার মধ্যে অধিক দুধ নিঃসৃত ও সঞ্চিত হয়, মাংস পিণ্ডের মত শক্ত হইলে অথবা মাংসল হইলে এবং দুধ দোহনের পর সঙ্কুচিত না হইলে চর্ব্বিযুক্ত হয়। এই প্রকার পালানের মধ্যে দুধ ভাল নিঃসৃত হয় না ;

(খ) বাঁটগুলি মাঝারি লম্বা এবং পরস্পর সমদূরবর্ত্তী চতুষ্কোণে থাকিবে। সম্মুখের বাঁট দুইটি পিছনের বাঁট দুইটি অপেক্ষা বড় হইবে। বাঁট পিণ্ডহীন হইবে এবং সোজা নীচের দিকে ঝুলিয়া থাকিবে ;

(গ) পালানের উপর দিকে এবং উরুর গোড়ায় যে লোমগুলি থাকে সেইগুলি বিস্তৃত থাকা গাভীর অধিক দুগ্ধদানের পরিচায়ক।

(ঘ) দুগ্ধশিরা—পালানের মধ্য দিয়া বেশী রক্ত চলাচল করিলে অধিক দুগ্ধ নিঃসৃত হয়। গরুর উদরের নীচের দিকে উভয় পার্শ্বে

একটী করিয়া মোটা শিরা দেখা যায়। উহাদের দুগ্ধশিরা (Milk vein) বলে। হৃদপিণ্ড হইতে যে রক্তধারা পালানের মধ্যে প্রবাহিত হয় উহা হইতেই দুগ্ধ নিঃসৃত হইবার পর অবশিষ্ট রক্ত উক্ত শিরার মধ্য দিয়া হৃদপিণ্ডে ফিরিয়া যায়। এইজন্য ঐ শিরাগুলির ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। সুতরাং ঐ শিরাগুলি যত মোটা, লম্বা ও প্যাঁচানো হয় ততবেশী রক্ত পালানের মধ্য দিয়া চলাচল করে এবং তদনুপাতে দুগ্ধ নিঃসৃত হয়। এই কারণে পালানের উপরে শিরা উপশিরা অধিক থাকা বাঞ্ছনীয়।

(৪) **প্রকৃতি**—প্রকৃতি শান্ত ও নরম, কোমলভাবাপন্ন; দেহে চর্ব্বি সঞ্চয়ের লক্ষণ বর্জ্জিত হইলে গরুর গর্ভাশয় ও সন্তান ধারণ সংক্রান্ত অঙ্গ সুস্থ ও সতেজ হয়। এই প্রকার গরু নিয়মিত বৎস প্রসব করে। সহসা ভীত ও চকিত হয় না, দোহনকালে অস্থিরতা প্রকাশ করে না, গমন ধীর, মন্থর ও অলসভাবাপন্ন, বর্ণ উজ্জ্বল এবং পুচ্ছ দীর্ঘ এইরূপ গরু উত্তম হয়।

উৎকৃষ্ট বলদের লক্ষণ

(১) সবল দেহগঠন, কার্য্যক্ষম ও কষ্টসহিষ্ণু;

(২) শীত, তাপ ও বৃষ্টি সহনশীল;

(৩) পা বলিষ্ঠ, সোজা এবং কৃষ্ণখুরযুক্ত। লম্বাপা বিশিষ্ট বলদ দ্রুতগামী হয়;

(৪) গলকম্বল (Dewlap) চর্ব্বিযুক্ত মোটা ও বৃহৎ হইবে না;

(৫) (Navel flap) নাভিদেশের ঝোলা মাংস দীর্ঘ হইবে না;

(৬) লেজ বেশী লম্বা ও মোটা হইবে না;

(৭) আকার ও গঠন কার্য্যোপযোগী হইবে, অর্থাৎ অধিক ভারবহন, দ্রুত গমন, হলকর্ষণ প্রভৃতি কার্য্যোপযোগী সামঞ্জস্য থাকিবে;

(৮) মুখ অধিক লম্বা হইবে না;

(৯) চক্ষু ও নাসিকা বিস্তৃত হইবে;

(১০) কপাল প্রশস্ত হইবে ;
(১১) উপরিওষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ ও বিস্তৃত হইবে ;
(১২) বক্ষস্থল প্রশস্ত হইবে ;
(১৩) দেহ নিটোল ও পৃষ্ঠদেশ চওড়া হইবে ;
(১৪) প্রকৃতি শান্ত হইবে।

অনুপযুক্ত বলদ—নাভিদেশের মাংস (Navel flap) অধিক প্রলম্বিত ও বৃহৎ গলকম্বলযুক্ত বলদ লাঙ্গল ও গাড়ী টানার পক্ষে উপযুক্ত হয় না।

বলদের কান ঝোলা এবং মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা দুর্ব্বলতার লক্ষণ।

সাঁহিয়াল গরু প্রচুর দুধ দেয় কিন্তু ঐ জাতির বলদের নাভিদেশের মাংস দীর্ঘ এবং উহাদের প্রকৃতি অলস ও গতি মন্থর বলিয়া কৃষি-কার্য্যের পক্ষে সবিশেষ উপযোগী নয়। গীর্, হারিয়ানা, ওঙ্গল প্রভৃতি গরু ভাল দুধ দেয় এবং ঐ জাতির বলদ বিবিধ শ্রমসাধ্য কার্য্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইহারা উভয় উদ্দেশ্য সাধক জাতির গরু।

দুগ্ধবতী মহিষের লক্ষণ

(১) সম্মুখ অপেক্ষা পালানের পশ্চাদভাগ অধিক ভারি হইবে,
(২) পালান এবং উদরের আকৃতি বৃহৎ হইবে,
(৩) গাত্রচর্ম্ম পাতলা, মসৃণ ও উজ্জ্বল হইবে,
(৪) লোম পাতলা হইবে, ঘন হইবে না,
(৫) পায়ের অস্থি সুন্দর ও মজবুত হইবে।
(৬) জাতীয় বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের গরু, মহিষ ও মুর্গী

(Geographical spread of dairying and poultry farming in India)

আবহমান কাল হইতে ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রই গোপালন করা হয়। উত্তর ভারতের পশ্চিমাঞ্চল হইতে বিহার রাজ্যের শাহাবাদ জেলা পর্য্যন্ত গরুগুলি উন্নত শ্রেণীর, বিশেষ পাঞ্জাব রাজ্যের। ইহার পর হইতে বঙ্গ, উড়িষ্যা ও আসাম পর্য্যন্ত গোজাতিগুলি অনুন্নত। পশ্চিম বঙ্গের দার্জ্জিলিং জেলার সিরি জাতীয় গরু ব্যতীত সমতল ভূমির গরু নিকৃষ্ট শ্রেণীর। সৌরাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান, পাঞ্জাব উত্তর প্রদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গোজাতিগুলি বিশেষ উন্নত। এইগুলির মধ্যে গীর্, সিন্ধি, থরপাকড়, সাঁহিওয়াল, হারিয়ানা, নাগরা প্রভৃতি বিশিষ্ট। এইসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম, গোচারণ ভূমি ও বন জঙ্গল রহিয়াছে এবং সর্ব্বত্রই সাধ্যমত পশুখাদ্য উৎপাদন করা হয়। এইসব স্থানে দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি ও ঘৃত যথেষ্ট প্রস্তুত হয়। বিহার রাজ্যের পশ্চিমাংশে একমাত্র শাহাবাদী গরুর নাম উল্লেখ করা যায়। পশ্চিম ভারতে বোম্বাই রাজ্যের কাঁকরেজি জাতির গরু উৎকৃষ্ট। উক্ত গোজাতিগুলির তুলনায় মধ্য ভারতের গোবংশগুলি অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের। উহাদের মধ্যে গাওলাও এবং হায়দ্রাবাদ অঞ্চলের মাল্ভি জাতির গরু ভাল। দক্ষিণ ভারতে অন্ধ্র, মহিশূর, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ, স্বাস্থ্যকর এবং চারণভূমি ও বনজঙ্গল যথেষ্ট থাকায় ওঙ্গল, অমৃতমহাল, হাল্লিকর, কাঙ্গাম প্রভৃতি কয়েকটি উৎকৃষ্ট গোবংশ রহিয়াছে। উড়িষ্যা, আসাম ও সমতল বঙ্গের গরু নিকৃষ্ট। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব জাতির গরু পালিত হয় তাহাদের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

বর্ত্তমানে পশ্চিম পাকিস্থানের অন্তর্গত—

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ... ধান্নি
পশ্চিম পাঞ্জাবের মণ্টগোমারি জিলার মণ্টগোমারী বা সাঁহিওয়ালী
বেলুচিস্থানে ... ভাগ্‌নারী
সিন্ধু প্রদেশে ... লাল সিন্ধি
সিন্ধু প্রদেশের দক্ষিণ পশ্চিমে ... থর্‌পাকড়

বর্ত্তমান ভারতবর্ষে কচ্ছ ও রাজস্থানের
পশ্চিম অঞ্চলে ... থরপাকড়

পূর্ব্ব পাঞ্জাবের হিসার জিলা, আম্বালা
বিভাগ ও পূর্ব্ব রাজস্থানে ... হারিয়ানা, হিসার বা হান্‌সী
রাজস্থানের উত্তর পূর্ব্বে ... নাগোরি
সৌরাষ্ট্রে ... গীর্
কাথিওয়াড় ও গুজরাটে ... কাঁকরেজি
কৃষ্ণা নদীর অববাহিকায় ... কৃষ্ণা উপত্যকার গরু (Krishna valley breed)
নাগপুর ও নর্ম্মদা বিভাগে ... গেওলাও
মালভি, হায়দ্রাবাদ ও মধ্যভারতের
উত্তরাংশে ... মালভি
উত্তর প্রদেশের মথুরা জেলা ও পূর্ব্ব
রাজস্থানে ... কোশি
উত্তর প্রদেশে ... খেরি
বিহারে সাহবাদ জিলায় ... সাহাবাদী
দক্ষিণ ভারতের পূর্ব্বউপকূলে ... মহিশূরী
মহীশূর রাজ্যে ... মহিশূরী, হালিকার,
কাবেরী নদীর অববাহিকায় ... আলম্‌বাদী
অন্ধ্ররাজ্যে ... ওঙ্গল বা নেলোর
কোইম্‌বাটোরে ... কানগাম্

বঙ্গদেশের গরু উপরোক্ত জাতীয় গরুগুলির সমতুল্য নয়। এই স্থানের গরু অনুন্নত শ্রেণীর পশু (Nondescript), বিশেষ কোন জাতি (breed) বলিয়া পরিগণিত হয় না। ইহাদের দুগ্ধদান ক্ষমতা অতি কম কিন্তু দুধে স্নেহ ভাগের মান উচ্চ ৪˙৫—৫ শতাংশ। দার্জিলিং জেলার পার্ব্বত্য অঞ্চলে কুকুদবিহীন সিরি নামে একটি গোবংশ আছে। ইহাদের আকার লম্বা ও গঠন সুন্দর। গাভী ৪—৫ সের দুধ দেয়। বলদ বেশ বলিষ্ঠ এবং কার্য্যক্ষম। শীতল আবহাওয়ার উপযোগী। বঙ্গদেশের সমতল ভূমিতে ইহাদের পালন করা যায় না।

মুর্গী

ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রই পূর্ব্বে কেবলমাত্র নিম্ন জাতির লোক, মুসলমান ও খৃষ্টান সম্প্রদায় মুর্গী পালন করিতেন। মুর্গী পালনের দিকে এখন অনেকেই আকৃষ্ট হইয়াছেন। ভারতবর্ষে অধিকাংশ মুর্গী সংমিশ্রিত নিকৃষ্ট শ্রেণীর। কয়েকটি বিশিষ্ট জাতির মুর্গীও দেখা যায়। তাহাদের মধ্যে আসামে ব্রহ্মপুত্রনদের উপকূলে ব্রাহ্মাজাতির মুর্গী উৎকৃষ্ট। চট্টগ্রাম অঞ্চলে চাটগাঁ মুর্গী এবং দক্ষিণ ভারতের কোচিন মুর্গী প্রসিদ্ধ। একসময় উত্তর ভারতে "আসলি" এবং দক্ষিণ ভারতের কালাহস্তী জাতের মুর্গী লড়াই এর জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। পাশ্চাত্য ও মার্কিন দেশের বিশিষ্ট ও সুপরিচিত মুর্গীর তুলনায় সাধারণ দেশী মুর্গী নিকৃষ্ট। তবে মহীশূর রাজ্যে, পার্ব্বত্য অঞ্চলে, সিকিম ও কাশ্মীরে বেশ বড় আকারের মুর্গী পালন করা হয়। ইহাদের মাংস ভাল এবং ডিমও ভাল দিয়া থাকে। পূর্ব্ব পাকিস্থানের নোয়াখালী ও সিলেট অঞ্চলের মুর্গীও মন্দ নয়। ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত সরকারী বিবরণী অনুযায়ী ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রকার গৃহ-পালিত পশুর সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

সর্ব্বভারতীয় সংখ্যা—

গরু	...	১,৫৮৯ লক্ষ
মহিষ	...	৪৪৮ ,,

ভেড়া	...	৩৮৭ লক্ষ
ছাগল	...	৫৬৬ ,,
মুর্গী	...	৯৭৪ ,,

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিভাগ হইতে সংগৃহীত তথ্য হইতে জানা যায় পশ্চিমবঙ্গে গৃহপালিত পশুর সংখ্যা নিম্নোক্ত প্রকার—

গরু—১,১১,০৮,১৫৬	মুর্গী—৬৯,৮৯,০৭৮
মহিষ—৭,৮৮,৬০১	হাঁস—৩১,৩৭,৫২৯
ছাগল—৪২,৬৮,১৬৪	অন্যান্য পক্ষী—২,৬৮,৭৪৩
ভেড়া—৬,১১,৫১৯	মোট গৃহপালিত পক্ষীর সংখ্যা—১,০৩,৯৫,৩৫০।

পঞ্চম অধ্যায়

গোজাতির উৎপত্তি ও তাহাদের গ্রাম্যতাপাদান

(Origin and domestication of breeds of live stock)

গরুরমত আকৃতিবিশিষ্ট রোমন্থনকারী পশুদিগের একটি শাখা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। মহিষ দ্বিতীয় ও গরু তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। উহাদের আবার কয়েকটি উপশাখা আছে। নিম্নে উহাদের একটি ছক্ দেওয়া হইল।

রোমন্থনকারী গোসদৃশ পশু
(Ruminating Bovine animals)

- বাইসন্টাইন (Bisontine)
  - ইয়াক্ (Yak)
  - বাইসন্ (Bison or wild ox)
- বিউবোলাইন (Buboline)
  - মহিষ (Buffalo)
  - বন্যগরু (Jungle ox)
  - গৌর (gour)
- টরাইন—প্রকৃত গোজাতি (Taurine or ox group)
  - কুকুদহীন সরল পৃষ্ঠ (Gavaeus, straight backed)
  - বস্ টরাস (Bos taurus or Longiforms)
  - ভারতীয় জেবাস্ (Indian Zebus or Bos Indicus)

বাইসন্টাইন :—মধ্য এশিয়ার ইয়াক্। ইহাদের আদি বাসস্থান হিমালয়ের উত্তরে। মধ্যএশিয়া ও তিব্বতে ইহাদের বন্য অবস্থায় দেখা যায়। ঐসব অঞ্চলে উহাদের গৃহেও পালন করা হয়। ইহারা গোজাতির পূর্ব্বপুরুষ। শীতপ্রধান দেশে বাস বলিয়া ইহাদের দেহ দীর্ঘ লোমে আবৃত। লেজের নিম্নভাগের লোম খুব দীর্ঘ। লেজের এই

লোম হইতে চামর প্রস্তুত হয়। এইজন্য ইহাদের চামরী গরু বলে। ইহাদের পিঠসোজা, কুকুদ ও গলকম্বল থাকে না। মুখ নিম্নাভিমুখী। পা ছোট, ক্ষুর বিস্তৃত, শিং মস্তকের দুই পার্শ্ব হইতে উঠিয়া পশ্চাদদিকে বাঁকা। মাংস, লোম এবং চামড়ার জন্য ইহাদের শিকার করা হয়। উহাদের মাংস তিব্বত ও মধ্য এশিয়ার কিরঘিজ জাতির অতি প্রিয় খাদ্য। উহাদের দুধও তাহারা পান করে। বন্য চামরীগরু কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু গৃহপালিতগুলির বর্ণ শ্বেত অথবা শ্বেতকৃষ্ণ মিশ্রিত এবং তাহাদের শিং ক্ষুদ্র হয়। ইহাদের ওজন ১১০০—১২০০ পাউণ্ড, উচ্চতা ৪½—৫ ফুট।

বাইসন্ (Wild ox) ঃ—উত্তর আমেরিকা এবং উত্তরপূর্ব্ব ইউরোপের অরণ্যে ইহাদের বাস। মার্কিন দেশে ইহাদের বাফেলো বলে। ইহাদের দেহের পশ্চাদভাগ সম্মুখভাগ অপেক্ষা ভারি ও বড়। শিং ও লেজ ছোট, মস্তক বেশ বড়। ঘাড়, গলা, মস্তক ও স্কন্ধদেশে ঘন, দীর্ঘ ভূতলস্পর্শী লোম থাকে। গ্রীষ্মকালে লোম ঝরিয়া যায় এবং শীতকালে পুনরায় গজায়।

বিউবেলাইন

(ক) **মহিষ** (Buffalo) ঃ—ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্ত্তী পর্ব্বতের নিম্নভাগের জঙ্গলে, তরাই অঞ্চলে এবং পূর্ব্বে স্নুন্দর বনে ইহাদের বন্য অবস্থায় দেখা যায়। মধ্য এশিয়ার উপত্যকা অঞ্চল, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, এবং মালয়ে ইহাদের পালন করা হয়।

(খ) **গয়াল** (Jungle ox) ঃ—হিমালয়ের তরাইএর উত্তরভাগে, আসামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে এবং মণিপুর রাজ্যে ইহাদের দেখা যায়। আসাম উপত্যকার পার্ব্বত্য জাতিরা ইহাদের পালন করে। ইহারা অর্দ্ধগৃহপালিত, দিনের বেলায় জঙ্গলে বিচরণ করিয়া বেড়ায় সন্ধ্যা-কালে গ্রামে ফিরিয়া আসে। মহিষের মত ইহাদের মোটা, চেপ্টা বড় শিং হয়। জানু হইতে খুর পর্য্যন্ত সাদা। ইহারা বিশেষ শক্তিশালী

কিন্তু ইহাদের স্বভাব শান্ত, সহজে পোষমানে। ইহারা দুধ বিশেষ দেয় না।

(গ) **গৌর** :—দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়া এবং হিমালয়ের তরাইএর জঙ্গলে ইহাদের বাস। মধ্যভারত, দাক্ষিণাত্য, ব্রহ্মদেশ ও মালয়ের জঙ্গলে ইহাদের দেখা যায়। দেখিতে বন্য মহিষের মত। পূর্ণ-বয়স্কদের বর্ণ গাঢ় বাদামী অথবা কৃষ্ণ।

টরাইন্—প্রকৃত গোজাতি

(ক) **গেভাস্** :—দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়ার কুকুদহীন সরলপৃষ্ঠ (straight back) গরু। ইহাদের শিং কিছু চেপ্‌টা।

(খ) **টরাস্**—ইউরোপের কুকুদহীন, সরলপৃষ্ঠ, চোঙ্গাকৃতি শিংবিশিষ্ট গরু।

(গ) **ভারতীয় গো** :—ইহাদের কুকুদ বিশেষ পরিপুষ্ট। গাভী অপেক্ষা ষাঁড়ের কুকুদ বড়। ইহাদের শিং ঠিক গোলাকার নয়। কর্ণের অগ্রভাগ সূঁচল (pointed), মুখড় (muzzle) বড় ও সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ। ভারতীয় গো পৃথিবীর অন্যান্য গোজাতি অপেক্ষা অধিক পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু।

মহিষ—বন্যমহিষ উচ্চপার্ব্বত্য অরণ্যে থাকে না। সাধারণতঃ পাহাড়ের নীচে অরণ্যের প্রান্তভাগে জলা কর্দ্দমময় স্থানে দল বাঁধিয়া বিচরণ করে। ইহাদের গলকম্বল হয় না। গোদুগ্ধ অপেক্ষা মহিষের দুগ্ধে স্নেহ (fat) বেশী থাকে। গরু অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়। ভারী মাল বোঝাই গাড়ী টানা এবং হলকর্ষণে অধিকতর উপযুক্ত হইলেও শুষ্ক উষ্ণ অঞ্চলে এবং গ্রীষ্মকালে ইহারা রৌদ্রে কাজ করিতে পারে না, সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে, কর্ম্মক্ষমতা হ্রাস পায়।

গৃহপালিত স্ত্রী মহিষ ৩ বৎসর বয়সে প্রথম সন্তান প্রসব করে। গর্ভধারণকাল ১০ মাস। প্রথম বৎস জন্মিবার দুই, তিন বৎসর পরে আবার প্রসব করে। গাভীর মত প্রতি বৎসর প্রসব করে না। সারা জীবনে ৬-৭টি বৎস দিয়া থাকে। প্রসবের পর দুই বৎসরকাল ধরিয়া

দুধ দেয়। পরবর্ত্তী বৎস প্রসবের দুইমাস পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দুধ দিয়া থাকে। গরুর মত ভারতবর্ষে কয়েকটি বিশিষ্ট গৃহপালিত মহিষ বংশ আছে।

মুর্গী :—মুর্গীর আদিম নিবাস মধ্যএশিয়া, ভারতবর্ষ, বর্ম্মা ও সিংহল। এদেশে আদিম মুর্গী বন্য কুক্কুট বা বনমুর্গী নামে অভিহিত। ভারতের বনে জঙ্গলে, পাহাড় পর্ব্বতে ইহাদের দেখা যায়। চট্টগ্রাম, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম এবং আসামের পার্ব্বত্য জঙ্গলে প্রতিবৎসর বহু বন্যমুর্গী শিকার করা হয়। ইহাদের গতি অতিদ্রুত এবং ইহারা এমনই সতর্ক যে জীবিত অবস্থায় ইহাদের ধরা যায় না, ধরিতে পারিলেও পোষমানে না। ইহাদের পালকের রং অতি উজ্জ্বল। ঘাড়ের রং কাল, পিঠ ও ডানা গাঢ় লাল, বুক কাল এবং লেজের অগ্রভাগ গাঢ় নীল। ইহাদের শিখায় ফলক থাকে না অর্থাৎ খাঁজকাটা (serrated) হয় না। পায়ের বর্ণ নীল। দেখিতে ইহারা অতি চমৎকার। প্রাচীনপন্থী হিন্দুদিগের নিকট মুর্গীভক্ষণ নিষিদ্ধ হইলেও বন্যকুক্কুট ভোজনের বিধি আছে। প্রথমে মানুষ রসনাতৃপ্তির জন্য বনে কুক্কুট শিকার করিত কালক্রমে উহারা গৃহপালিত হয়। বন্যমুর্গী অপেক্ষা গৃহপালিত মুর্গী অধিক ডিম প্রসব করে। বন্য অবস্থায় উহাদের ডিম কম হইয়া থাকে। মুর্গীর লড়াই অনেকের নিকট বিশেষ উপভোগ্য। বহুদিন হইতে এদেশে যোদ্ধা মুর্গী অতি যত্নের সহিত পালন এবং উহাদের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইত। এই যোদ্ধা মুর্গী (fighting cock) সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষ হইতে মিশরে এবং সেইস্থান হইতে পরে ইউরোপে যায়। তারপর রোমানদিগের দ্বারা ইংলণ্ডে নীত হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিশিষ্ট জাতির গরু, মহিষ ও মুর্গীর মৌলিক বিশেষত্ব ও উহাদের আর্থিক গুরুত্ব

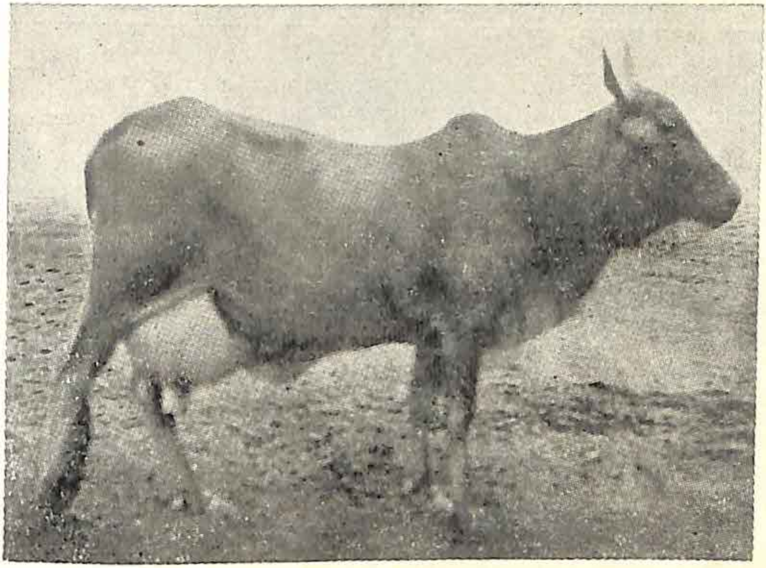
(Characteristics and economic value of important breeds of cattle and poultry)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ভারতবর্ষের গরু Indian Zebus or Bos Indicus শ্রেণীর অন্তর্গত। বহু কাল হইতে সংমিশ্রণের ফলে উহাদের বহু উপজাতি সৃষ্টি হইয়াছে। তথাপি ভারতবর্ষের কয়েকটি স্থানে কতকগুলি উৎকৃষ্ট গোবংশ এখনও রহিয়াছে। উহাদের নিজস্ব জাতিগত বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। গরুর মত ভারতবর্ষে কয়েকটি উৎকৃষ্ট জাতির মহিষ আছে। ভারতীয় কৃষি গবেষণাগার ভারতীয় গরু ও মহিষের মধ্যে সাতটি প্রসিদ্ধ জাতির গরু (Seven important breeds of cattle) এবং এক জাতীয় মহিষ উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করেন। ঐ প্রসিদ্ধ গোবংশগুলি সাঁহিওয়াল বা মণ্টগোমারি, লাল সিন্ধি, হারিয়ানা, গীর্, থর্পাকড়, কাঁকরেজি এবং ওঙ্গল বা নেলোর নামে পরিচিত। বিভিন্ন জাতির মহিষের মধ্যে মুড়া মহিষ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সরকারী পশুপালন ও প্রজনন কেন্দ্রগুলিতে উক্ত সাতটি জাতির গরু ও মুড়া মহিষের নানাবিধ পরীক্ষা ও গবেষণা দ্বারা উহাদের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করা হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের হরিণঘাটা গোপালন ও প্রজনন কেন্দ্রে অনুরূপ পরীক্ষা চলিতেছে। উহাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য প্রদত্ত হইল।

লাল সিন্ধী :—সিন্ধুরাজ্যের করাচি ও হায়দ্রাবাদ অঞ্চলে লাল সিন্ধি জাতীয় গরুর আদি বাস। এই অঞ্চল বর্ত্তমানে পশ্চিম পাকিস্থানের অন্তর্গত। ইহাদের রং গাঢ় লাল। কোন কোন গাভীর দেহে সাদা ছোপ দেখা যায়। ইহারা আকারে বেশী বড় হয় না।

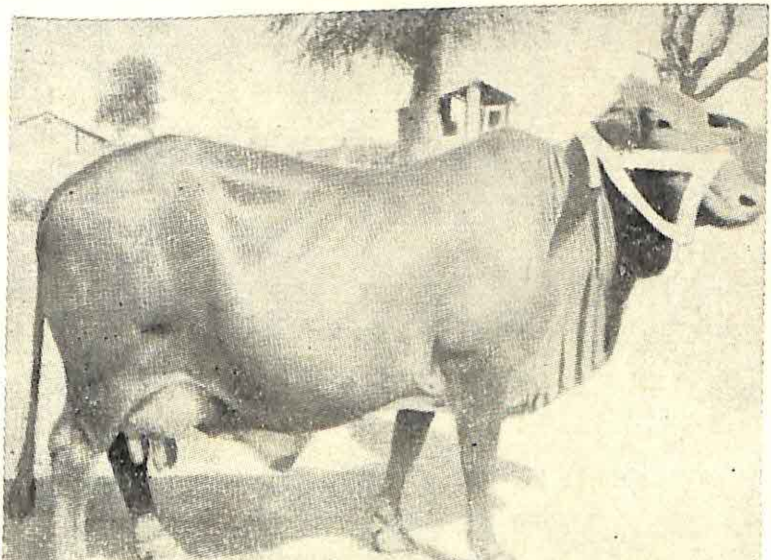
ইহাদের দেহের বিশেষ লক্ষণ—ত্রিভুজাকৃতি, শৃঙ্গ ছোট ও মোটা, অগ্রভাগ ভোঁতা। কুকুদ বড়, গলা ছোট ও মোটা। গলকম্বল ঝোলা ও মাঝারি আকৃতির। সৌষ্ঠবময় দেহ গঠন। প্রকৃতি নম্র। পালান বড়, সামান্য ঝোলা। বাঁট কিছু ঝোলা। দুগ্ধশিরা পরিস্ফুট। যদিও ইহাদের আদি বাসভূমিতে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত বিরল এবং শীত ও গ্রীষ্ম তীব্র কিন্তু ইহারা প্রায় সবরকম জলবায়ু সহ্য করিতে পারে। দেহের ওজন প্রায় ৬৫০—১০০০ পাউণ্ড হয়। ইহারা প্রচুর দুধ দেয়। নিজ দেশে দৈনিক ১৩—১৪ সের দুধ দেয় কিন্তু স্থানান্তরিত করিলে দুধ কমিয়া যায়। দুগ্ধে ৫—৬·৫% স্নেহ (fat) থাকে। ইহারা বাংলা দেশের আর্দ্র আবহাওয়া ভাল সহ্য করিতে পারে না, সহজে রোগাক্রান্ত হয়।

সাঁহিওয়াল বা মণ্টগোমারী ঃ—পশ্চিম পাকিস্থানের অন্তর্গত মণ্টগোমারী জেলায় ইহাদের বাস। ইহারা অতি উৎকৃষ্ট দুগ্ধ প্রদান-কারী গরু। ইহাদের মস্তক ছোট, কপাল বিশেষ প্রশস্ত নয়, শিং প্রায়ই ছোট, চক্ষু বড়, কর্ণ বড় ও ঝোলা। ঘাড় মোটা ও ছোট, মুখ চওড়া, কুকুদ স্বাভাবিক, গলকম্বল বেশ বড় ও দোলায়মান, পৃষ্ঠদেশ সামান্য বাঁকা। লেজ সরু ও লম্বা। পায়ের গঠন প্রশস্ত। উরু পেশীযুক্ত, কোমর চওড়া, গাত্রচর্ম্ম পাতলা। গাত্রবর্ণ সাধারণতঃ শ্বেত, আবার নানা বর্ণবিশিষ্টও হইয়া থাকে, যেমন লোহিত ও শ্বেত মিশ্রিত, লোহিত ও কৃষ্ণ, হরিদ্রা, শ্বেত ও ধূসর এবং ছোপ্ ছোপ্ও দেখা যায়। ইহাদের উদরের নিম্নস্থ চর্ম্ম খুব ঝোলা থাকে। দেহের পশ্চাদভাগ উত্তম বিকশিত। অঙ্গসৌষ্টব সুন্দর। পালান বড়, চওড়া, সমতল ও নমনীয়। বাঁটগুলি সমদূরবর্ত্তী ও লম্বা। দুগ্ধশিরা বেশ বড় ও লম্বা। গাভীর ওজন ৯০০—১২০০ পাউণ্ড। উচ্চতায় ৫ ফুট। নিজ দেশে ইহারা ৮—১০ মাস কাল অবধি দৈনিক ১৫ সের দুধ দিয়া থাকে। স্থানান্তরিত করিলে দুগ্ধ কমিয়া যায়। দুগ্ধে শতকরা ৩·৫—৪·৫% স্নেহ থাকে। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় ইহারা ৬—১০



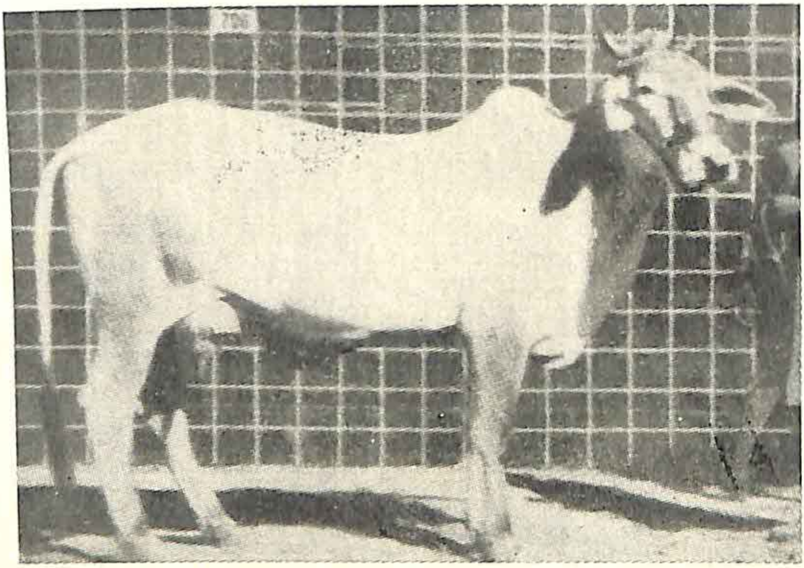
লাল সিন্ধি

I. C. A. R. সৌজন্যে



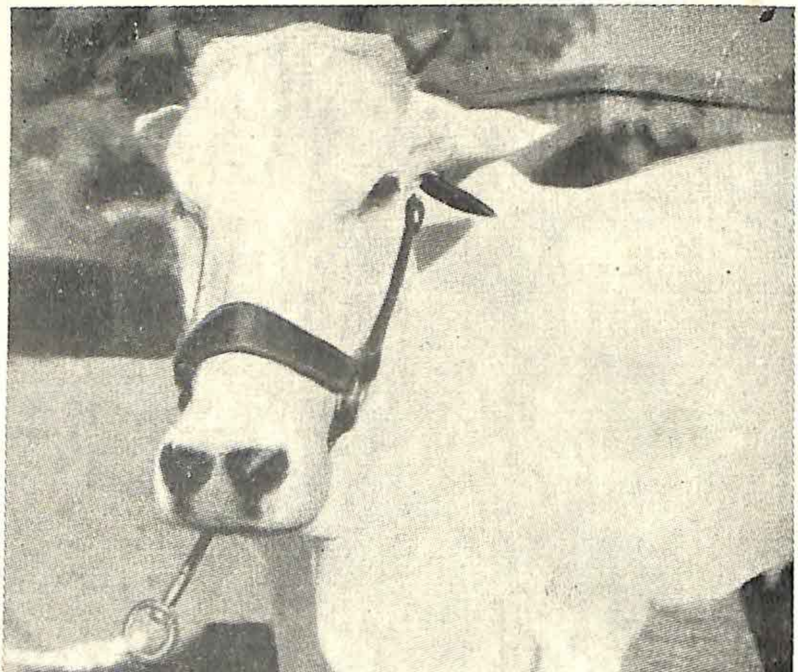
সাঁহিওয়াল বা মণ্টগোমারি

I. C. A. R. সৌজন্যে



হারিয়ানা গাভী

I. C. A. R. সৌজন্যে



হারিয়ানা গাভীর মুখাবয়ব

I. C. A. R সৌজন্যে

সের দুধ দেয়। এই জাতের বলদ দীর্ঘসময় কাজ করিতে পারে না। ইহাদের নাভিদেশের চর্ম্ম বিশেষ বিলম্বিত বলিয়া (Pendulous sheath) গতি শ্লথ হয়। এইজন্য কৃষিকার্য্যের পক্ষে উত্তম পশু বলিয়া বিবেচিত হয় না।

হারিয়ানা, হিসার বা হানসিঃ—পূর্ব্ব পাঞ্জাবের অন্তর্গত হিসার, রোটক ও গুরুগাঁও জেলা এবং রাজস্থানের বিকানীর, জয়পুর প্রভৃতি স্থান হারিয়ানা অঞ্চল বলিয়া অভিহিত। এই অঞ্চলের গরু উক্ত নামে খ্যাত ইহাদের হিসার, হান্‌সিও বলে। এই জাতীয় গরুর শিং কিছু ছোট, সরু ও কৃষ্ণবর্ণ। চক্ষু বড়, কর্ণ লম্বা, বড় ও ঝোলা। কুকুদ বড়, গলকম্বল বড় ও ঝোলা। ল্যাজ সরু ও ছোট। পা সুন্দর, খুব অল্প পরিসর ও শক্ত এবং উত্তম আকৃতি বিশিষ্ট। চর্ম্ম ঢিলা ও পাতলা। শ্বেত অথবা ধূসর ব্যতীত অন্য কোন বর্ণের হয় না। স্কন্ধদেশ ও ঘাড়ের বর্ণ গাঢ়। সাদা কিম্বা ফিকা ধূসর আদর্শ বর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়। পূর্ণ বয়স্ক গরু সাধারণতঃ উচ্চতায় ৫৪″—৬০″ হয়। দৈহিক গঠন দৃঢ়। ইহাদের পালান উত্তম বিকশিত এবং সম্মুখ দিকে প্রসারিত থাকে। দুগ্ধশিরা সুস্পষ্ট। বাঁট দীর্ঘ, লম্বাকৃতি। নিজ বাসভূমিতে ৬—১২ সের দুধ দিয়া থাকে। স্থানান্তরিত করিলে কিছু কমিয়া যায়। দুগ্ধে স্নেহের পরিমাণ ৪·৫%।

এই জাতের বলদ দৃঢ়, কর্ম্মঠ ও শক্তিশালী হয়। কৃষিকার্য্য ও ভারি কার্য্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই জাতীয় পশু দুগ্ধ দান ও শ্রমসাধ্য কার্য্যের উপযোগী (Dual purpose) অর্থাৎ উভয় উদ্দেশ্য সাধক। বাংলাদেশের আবহাওয়া ইহারা বেশ সহ্য করিতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিভাগের মতে এই জাতীয় গরু পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সরকারী গোপালন ক্ষেত্রে ইহারা ১০—১২ সের দুধ দিয়া থাকে এবং দুগ্ধে স্নেহ ৫% পাওয়া যায়। হারিয়ানা ষাঁড় যোগে দেশী গরুর উন্নতি করিবার জন্য কৃষিবিভাগ পরামর্শ দেন। এই কার্য্যে সন্তোষজনক ফল দেখা গিয়াছে।

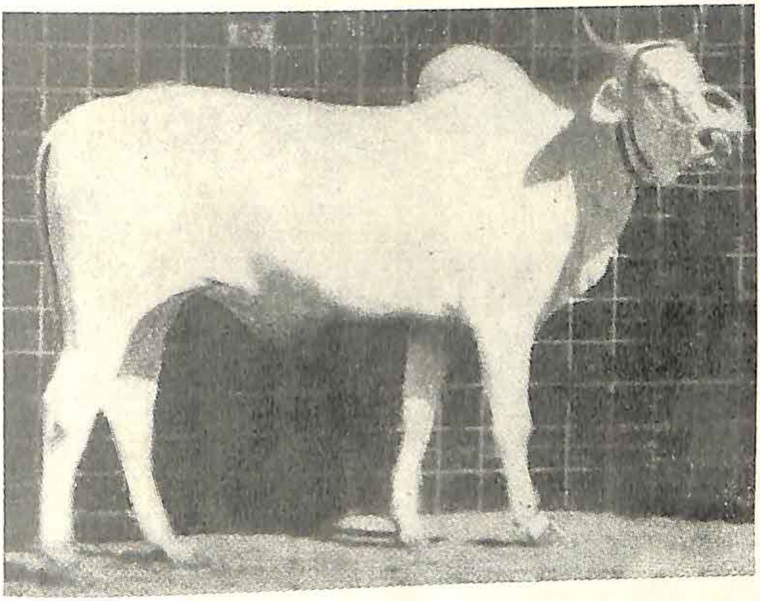
থর্‌পাকড় :—সিন্ধুরাজ্যের দক্ষিণপশ্চিম, হিন্দুস্থানের রাজস্থান এবং কচ্ছের থর্‌ ও পাকড় মরুঅঞ্চলবর্ত্তী স্থানে ইহাদের বাস। ইহারা খুব সবল, মধ্যমাকৃতি পশু। ইহাদের চক্ষু অচঞ্চল, কাণ চওড়া ও সামান্য লম্বা। গলকম্বলের চামড়া পাতলা ঢিলা ও নরম। বলিষ্ঠ পা। শিং ভোঁতা পার্শ্বে হেলান। গাভী অপেক্ষা ষাঁড়ের শিং মোটা ছোট ও খাড়া। লেজের কৃষ্ণবর্ণ গুচ্ছ আভূমিস্পর্শী। গলকম্বলের নীম্নভাগ এবং কর্ণের ভিতরদিক গাঢ় পীতবর্ণ। পৃষ্ঠদেশের মধ্যস্থলে ধূসর বর্ণের ডোরা দাগ থাকে। দেহগঠন অতি সুন্দর। পালান বড়, সম্মুখভাগে বিস্তৃত এবং পশ্চাদভাগ সমতল। পালানের চাম্‌ড়া পাত্‌লা। বাঁট লম্বা, মোটা ও সমদূরবর্ত্তী। প্রতি বিয়ানে গড়ে ৫০ মণ দুধ দেয়।

গীর্‌ :—কাথিওয়াড়ের গীর নামক জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল এইজাতীয় গরুর আদি বাসভূমি। জঙ্গলে পর্য্যাপ্ত চারণভূমি থাকায় গীর্‌ পশুর খুব উন্নতি হইয়াছে। ইহাদের সুরাঠি গরুও বলে। ইহারা ভারতের উৎকৃষ্ট গোবংশের অন্যতম।

ইহাদের স্বভাব নম্র। স্কন্ধদেশ ও গলকম্বল মাংসল ও নরম। কুকুদ মাঝারি, শিং বাঁকা, কাণ দীর্ঘ ও ঝোলা, মাথা চেপ্‌টা, কপালাস্থি চওড়া। পালান মাঝারি আকারের, বিস্তৃত মাংসল ও ঝোলা, বাঁট লম্বা, দুগ্ধশিরা পরিস্ফুট। গীরজাতীয় গরুর মস্তক, শৃঙ্গ ও কর্ণের বৈশিষ্ট্য দেখিয়া সহজে চিনিতে পারা যায়। ইহাদের দুগ্ধদান ক্ষমতা অধিক। প্রতি বিয়ানে ২৫০০ পাউণ্ড দুধ দিয়া থাকে। দুধে স্নেহ ৫-৬% পাওয়া যায়।

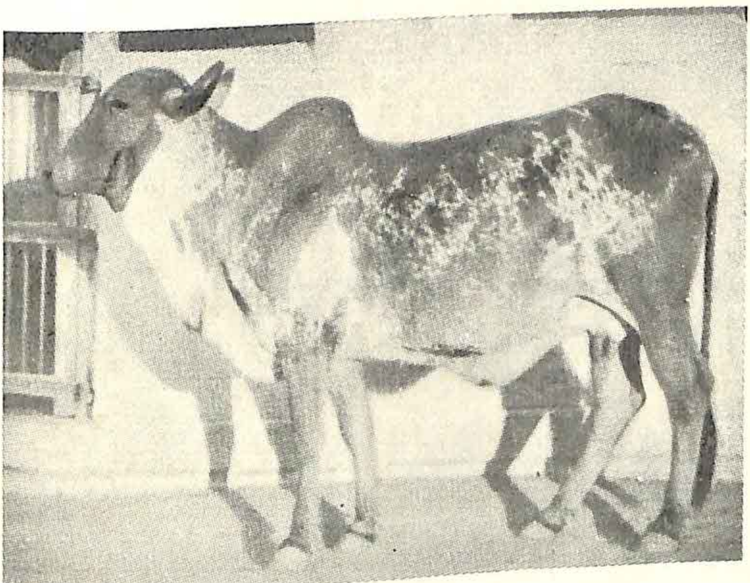
ইহাদের বর্ণ লোহিত, কাহারো গায়ে সাদা ছোপ থাকে, কাহারো গাত্রবর্ণ আবার কৃষ্ণশ্বেতাভ হয়। ইহারা মধ্যমাকৃতির পশু, ওজন ৮০০—১০০০ পাউণ্ড।

কাঁক্‌রেজি :—বোম্বাই প্রদেশের উত্তর ও গুজরাট অঞ্চলে ইহাদের বাস। ইহাদের গুজরাটী গরুও বলা হয়। ইহারা দুইপ্রকার



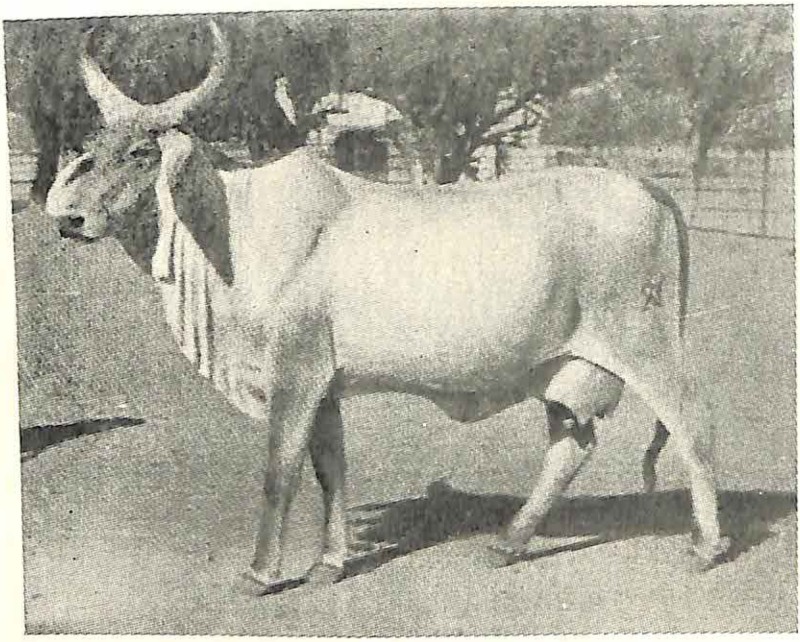
হারিয়ানা বলদ

I. C. A. R. সৌজন্যে



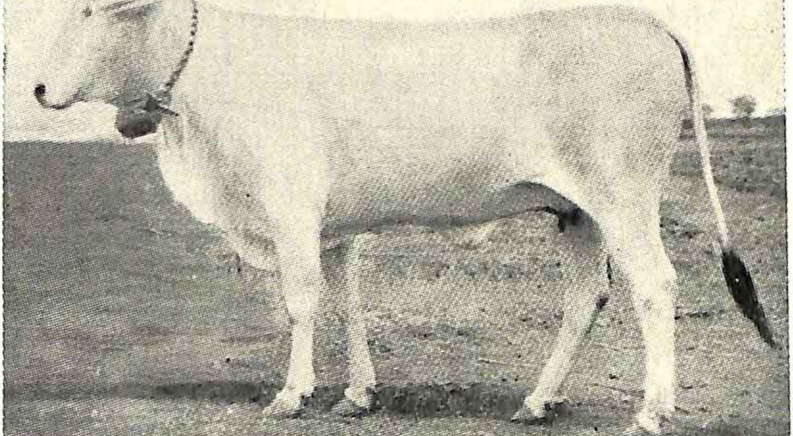
গীর্

I. C. A. R. সৌজন্যে



কাঁক্‌রেজি

I. C. A. R. সৌজন্যে



ওঙ্গল বা নেলোর

I. C. A. R. সৌজন্যে

আকার বিশিষ্ট হয়—বৃহদাকৃতিগুলিকে কাঁক্‌রেজি এবং মাঝারি আকারেরগুলিকে উদিয়াল বলে। কাঁকরেজি বৃহদাকৃতির পশু। ইহারা উৎকৃষ্টজাতির গরু বলিয়া পরিগণিত। দেখিতে বেশ সুশ্রী। চক্ষু বৃহৎ ও উজ্জ্বল, কাণ লম্বা ও ঝোলা, শিং মোটা ও বাঁকা, দুইটি শিং মিলিয়া অৰ্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হইয়া উপরে থাকে। কুকুদ বেশ বড়, লেজ লম্বা। বর্ণ সাদা ও কাল দাগযুক্ত হয়। দেহ মাংসল, বলিষ্ঠ, পেশী সুদৃঢ়। প্রকৃতি ধীর ও শান্ত। পালান উত্তম আকারের। দুগ্ধশিরা সুপরিস্ফুট। পিছনের বাঁট অপেক্ষা সম্মুখের বাঁট বড়। ওজন ৯০০—১০০০ পাউণ্ড। স্বভূমিতে ইহারা ১০-১২ সের দুধ দেয়। দুধে স্নেহ থাকে ৩·৪—৪·০ শতাংশ।

নেলোর বা ওঙ্গল :—দক্ষিণভারতের একটি উৎকৃষ্ট গো বংশ। অন্ধ্রাজ্যের নেলোর ও গণ্টুর অঞ্চলের গরু। ইহারা বৃহদাকৃতির হয়। চক্ষু নাতিবৃহৎ পিঙ্গলবর্ণ ও উজ্জ্বল। চোখের চারিপার্শ্বের চর্ম্ম কৃষ্ণবর্ণ। কপাল প্রশস্ত। কাণ খুব লম্বা নয় সামান্য ঝোলা। কাণের ভিতর পাতলা সোনালী লোমে আচ্ছন্ন থাকে। শিং মোটা ও ছোট। মুখ লম্বা, গলা ছোট ও মোটা, মস্তক সুশ্রী। গলকম্বল মাংসল, ভাঁজকরা, নাভি পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে। লেজ সরু ও লম্বা। লেজের গুচ্ছ ভূতলস্পর্শী। পা দৃঢ় ও বলিষ্ঠ। স্থূলকায়, নম্রভাব, সুন্দর আকৃতি। বর্ণ শ্বেত ও ধূসর। কৃষ্ণ ও হরিদ্রাবর্ণেরও হইয়া থাকে। গাভী উত্তম দুগ্ধবতী, প্রতিবিয়ানে ৩৪—৬০ মণ পর্য্যন্ত দুধ দেয়। দেহের ওজন ৯০০ পাউণ্ড।

লাল সিন্ধী গরু বাংলা দেশের আবহাওয়া বিশেষ সহ্য করিতে পারে না। উহাদের দুগ্ধদান ক্ষমতা এদেশে হ্রাস পায়—এবং উহারা সহজে রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। সাঁহিওয়াল জাতীয় গাভী হরিয়ানা অপেক্ষা অধিক দুধ দিয়া থাকে কিন্তু ইহাদের বলদ কৃষিকার্য্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নয়। থরপাকড় এবং ওঙ্গল জাতীয় গরু অতি বৃহৎ আকারের হইয়া থাকে। হারিয়ানা জাতির গরুর দুগ্ধদান ক্ষমতা ভাল

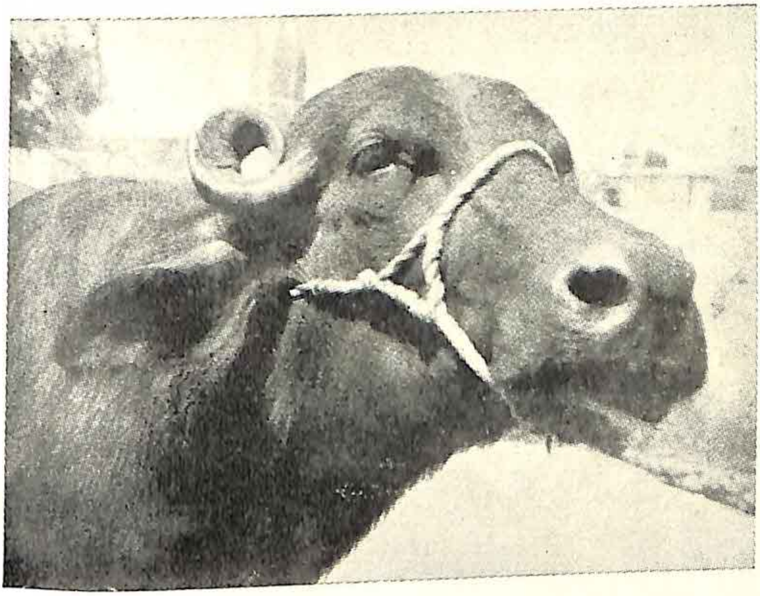
ইহাদের বলদ বিশেষ কার্য্যক্ষম ও বলিষ্ঠ। নানাবিধ কৃষিকার্য্যের পক্ষে সবিশেষ উপযোগী এবং বাংলা দেশের আবহাওয়া ভালভাবে সহ্য করিতে পারে। হারিয়ানা জাতের গরু উভয় উদ্দেশ্য সাধক (Dual purpose) বলিয়া—পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কৃষি বিভাগ এই জাতির গরু বাংলা দেশে পালন করিতে উপদেশ দেন। হারিয়ানা বৃষদ্বারা দেশী গরুর প্রজনন করাইয়া বঙ্গদেশের গোবংশের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করা হইতেছে।

মহিষ

মুড়ামহিষ (Murrah):—দক্ষিণ পাঞ্জাব এবং দিল্লী অঞ্চলের উৎকৃষ্ট জাতির মহিষ। পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে দুধ ও ঘি উৎপাদনের নিমিত্ত ইহাদের পালন করা হয়। ভারতীয় গরু ও মহিষের মধ্যে মুড়া জাতীয় মহিষ সর্ব্বাধিক দুধ দিয়া থাকে। ইহাদের দৈনিক ২০—৩০ সের পর্য্যন্ত দুধ দিতে দেখা যায়। ইহারা বৎসরে—১০০ হইতে ২২৫ মণ দুধ দিয়া থাকে। দুধে স্নেহ ৬·৫—৭ শতাংশ পাওয়া যায়। সরকারী পশুপ্রজনন কেন্দ্রে অন্যান্য জাতির মহিষের সহিত মুড়া মহিষের সংমিশ্রণ ঘটাইয়া উহাদের উন্নতি বিধানের পরীক্ষা করা হইতেছে।

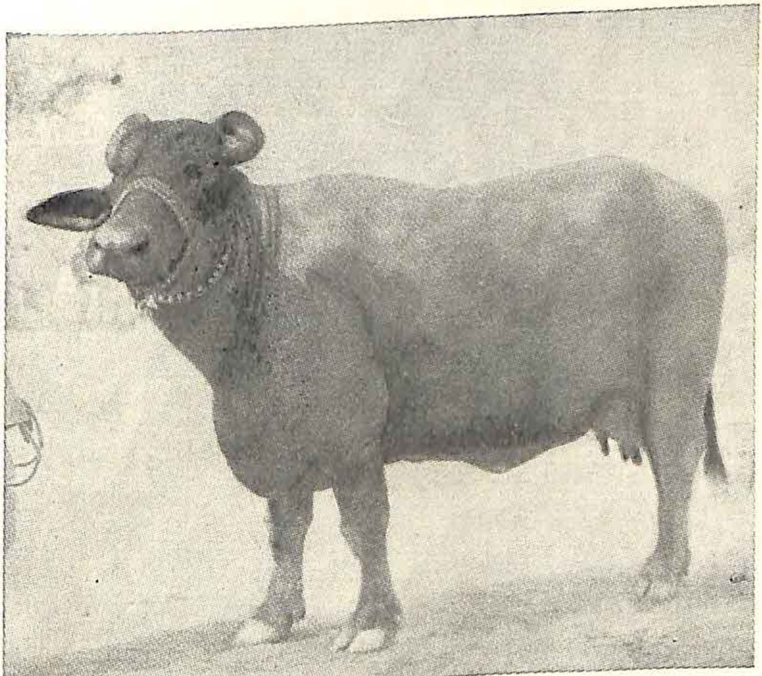
সচরাচর ইহাদের বর্ণ কাল, কখন কখন ফিকা বাদামী (Fawn grey) রং ও দেখা যায়। কোন, কোন মহিষের মুখ, পা এবং লেজের অগ্রভাগ সাদা হয়। ইহারা আকারে বৃহৎ, সুঠাম ও বলিষ্ঠ গঠন হয়। পা ছোট, মোটা ও সুদৃঢ়। পালান সুবৃহৎ ও সমুন্নত। ইহাদের শিং ছোট ও মোড়া। মোড়া শিংএর জন্য ইহাদের ঐ নাম হইয়াছে। মুড়া মহিষ ব্যতীত আর কয়েকটি জাতির উল্লেখযোগ্য মহিষ—

জাফরবাদী বা কাথিওয়াড়ি—কাথিওয়াড়ের গীর অরণ্যের মহিষ। ইহাদের আকার বৃহৎ ও স্থূল। শিং বড় এবং ঘাড়ের দিকে নামিয়া থাকে। ইহাদের বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ। পালান বেশ বড়। ইহারা প্রচুর দুধ দেয় তবে মুড়া মহিষ অপেক্ষা কম।



মুড়া মহিষের মুখাবয়ব

I. C. A. R. সৌজন্যে



মুড়া মহিষ

I. C. A. R. সৌজন্যে

ভাদোয়ারী—উত্তর প্রদেশে এটাওয়া ও আগ্রা এবং গোয়ালিয়ার রাজ্যে ইহারা প্রধানতঃ পালিত হয়। ইহাদের দুগ্ধদান ক্ষমতা কম কিন্তু দুধে স্নেহ অধিক থাকে, এমন কি ১৩ শতাংশ পর্য্যন্ত দেখ যায়। ইহাদের বলদ খুব কষ্টসহিষ্ণু ও কর্ম্মঠ এবং অন্যান্য জাতীয় মহিষ অপেক্ষা অধিক গরম সহ্য করিতে পারে। ঘি উৎপাদনের জন্য ইহারা গ্রামবাসীর বিশেষ আদৃত।

নীলী—শতদ্রুনদীর অববাহিকায় ইহাদের বাস। বর্ত্তমানে উক্ত অঞ্চল সম্পূর্ণ পশ্চিম পাকিস্থানের অন্তর্গত। ভারতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট জাতির মহিষগুলির মধ্যে নীলী মহিষ অন্যতম। প্রচুর দুধ দেয়। আকৃতি মাঝারী, মস্তক লম্বা, মস্তকের উপরিভাগ স্ফীত (bulging), শিং অতিক্ষুদ্র ও দৃঢ়ভাবে পাকান, গ্রীবা সুন্দর, পাতলা ও দীর্ঘ, নাভি ক্ষুদ্র, পালান উত্তম বিকশিত, লেজ দীর্ঘ ভূতলস্পর্শী, বর্ণ কাল অথবা বাদামী।

মুর্গীর বহিরাঙ্গ (External parts of Hen)

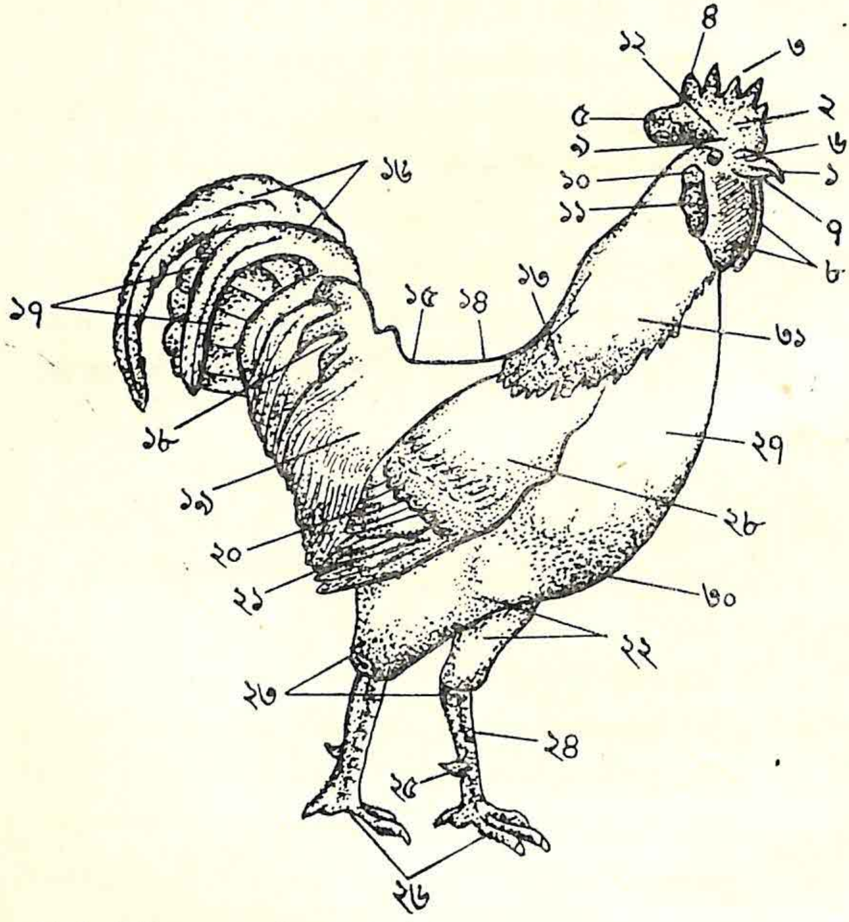
১। উপর ও নীচের ঠোঁট—Beak—upper and lower mandibles
২। মাথার শিখা বা ঝুঁটি—Comb or Spike
২। ঝুঁটির শীষ—Points of spike
৪। ঝুঁটির খাঁজ—Serrations
৫। ঝুঁটির ফলক—Blade
৬। মুখমণ্ডল—Face
৭। চক্ষু—Eyes
৮। কণ্ঠের বিলম্বিত মাংস—Wattles
৯। টুপি—Cap
১০। কান—Ear
১১। লতি বা কানের পাটি—Earlobe or deaf ear

১২। ঝুঁটির মূল—Base of Comb

১৩। স্কন্ধের ঢাকা—Cape

১৪। পিঠ—Back

১৫। জিন্—Saddle



১৬। কাস্তের মত পালক—Sickles

১৭। লেজের প্রধান পালক—Main tail feathers

১৮। লেজের ঢাকা পালক—Tail coverts

১৯। জিনের উপরের পালক—Saddle hackles

২০। ডানার মূলের গৌণ পালক—Secondaries

২১। উড়িবার মুখ্য পালক—Flight feathers or Primaries

২২। ঊরু—Thigh

২৩। জঙ্ঘা সন্ধি—Hocks

২৪। জঙ্ঘা—Shanks

২৫। পায়ের কাঁটা—Spurs

২৬। পদতলের মাংস—Pad

২৭। বুক—Breast

২৮। ডানার ধনুক সদৃশ অংশ—Wing bow

২৯। ডানার ঢাকা—Wing coverts

৩০। বক্ষের নীচের হাড়—Point of keel

৩১। চিরুণীর মত ঘাড়ের পালক—Neck hackles

পৃথিবীর সকল দেশেই মুর্গী পালন করা হয়। বিভিন্ন দেশে ইহারা বিভিন্ন জাতি (breed) বলিয়া পরিগণিত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশিষ্ট মুর্গী—

ব্রাহ্মা (Brahma)—ইহাদের আদি নিবাস ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা। আকারে ইহারা বেশ বড়। কিন্তু ডিম দেয় কম। মাংসের জন্য কদর। ইহাদের মাথার ঝুঁটি মটর ফুলের মত (Pea shaped)। এইরূপ শিখা অন্যান্য জাতের মুর্গীতে দেখা যায় না। ইহারা গাঢ় ও হাল্কা উভয় প্রকার রংএর হয়। পালকের রং সাদা, মধ্যে মধ্যে দুই একটি রূপার মত অতি শুভ্র পালক মিশ্রিত থাকে। ঘাড় ও ডানার অগ্রভাগ ঈষৎ কাল। লেজ সম্পূর্ণ কাল। ইহাদের ইংলণ্ড ও আমেরিকায় লইয়া গিয়া বিশেষ উন্নতি সাধন করা হইয়াছে।

কোচীন মুর্গী (Cochin)—পর্ত্তুগীজগণ এই জাতীয় মুর্গী ভারতবর্ষে আনয়ন করে। ব্রাহ্মা অপেক্ষা ইহারা আকারে অনেক ক্ষুদ্র। ইহাদের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর পালকে আবৃত। ইহাদের শিখা একক। ইহারা সাদা, কাল ও ধূসর বর্ণের হইয়া থাকে। ধূসর বর্ণের মুর্গী অধিক পালিত হয়।

চাটগাঁ (Chittagong) চট্টগ্রাম অঞ্চলের মুর্গী। এশিয়ার প্রাচীন মুর্গীদের অন্যতম। পূর্ব্বে বহুসংখ্যক চট্টগ্রাম মুর্গী বিদেশে রপ্তানী হইত। অনেকের মত গৃহপালিত মুর্গীর মধ্যে চাটগাঁ মুর্গী আদি।

ইহাদের দৃষ্টি চঞ্চল ও রুক্ষ। শারীরিক গঠন ও মাংসপেশী সবল ও দৃঢ়। ইহারা বড় কলহপ্রিয় ও অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু। মাংস সুস্বাদু। মাংসের জন্য ইহারা বিশেষ আদৃত হয়। ওজন ৩—৪ সের হয়। উচ্চতা ৩০ ইঞ্চি। ইহাদের শিখা মটর ফুল বা আখরোটের মত (Pea or Walnut shaped)। গলদেশের মাংসখণ্ড ও লতি ক্ষুদ্র। পালক অল্প, বুকের মধ্যস্থল ও ডানার উপরিভাগে পালক থাকে না বলিয়া লাল দেখায়। ইহারা সাদা, ধূসর ও ঈষৎ পীত বর্ণের হয়। ঘাড়ে দুই চারিটি কাল বা ছাই রংএর পালক থাকে। ইহাদের গলা ও পা খুব লম্বা হয়। চক্ষের উপর ভ্রূ ঝুলিয়া থাকে। লেজ নীচের দিকে নত থাকে। ইহাদের ডিম ছোট ও ঈষৎ গোলাপী।

আস্‌লি বা আসীল (Aseel)—এককালে ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ সখ করিয়া এই জাতীয় মুর্গী পুষিতেন। ইহারা লড়াইএর জন্য প্রসিদ্ধ। যোদ্ধা জাতীয় এই মুর্গী ঐ উদ্দেশ্যে পূর্ব্বে ইউরোপে যথেষ্ট রপ্তানী হইত। ইউরোপে মুর্গীর লড়াইকে ভারতীয় খেল্‌ (Indian game) বলিত। আস্‌লি মুর্গী সাদা, কাল, লাল, সোনালী প্রভৃতি নানা রংএর হয় ইহাদের আকৃতি ও গঠন চাটগাঁ মুর্গীর মত কিন্তু অধিকতর দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও তেজস্বী। ইহাদের শিখা পি ও ওয়াল্‌নাট শ্রেণীর। মাংস সুস্বাদু। কিন্তু ডিম অতি অল্প দিয়া থাকে। ডিমের রং গাঢ় বাদামী।

কালাহস্তী—মাদ্রাজরাজ্যে কালাহস্তী নামে এক জাতের মুর্গী দেখা যায়। ইহাদের পালক উজ্জ্বল লালবর্ণ। মুর্গী অতি অল্পসংখ্যক ডিম দেয়, বৎসরে মাত্র ৩০—৩৫টি। ইহাদের দেহে যথেষ্ট মাংস

থাকে। মুর্গী ৪ পাউণ্ড এবং মোরগ ৫—৫½ পাউণ্ড ওজনের হয়। ইহারা লড়াইএর জন্য প্রসিদ্ধ।

ইজ্জৎনগরে ভারতীয় পশুগবেষণাগারে দেশী মুর্গী নির্ব্বাচন করিয়া একটি উন্নত জাতের মুর্গীবংশ উৎপন্ন করা হইয়াছে। ইহারা বৎসরে গড়ে ১৪০টি ডিম দেয়। কোন কোন মুর্গী ২০০টি পর্য্যন্ত ডিম দিয়া থাকে। ইহাদের দেহ বেশ সুডোল। পালক বাদামী। ঝুঁটি একক, ৫—৬টি খণ্ডে বিভক্ত। ঠোঁট ক্ষুদ্র ও বাঁকা। মুর্গীর ওজন ৪ পাউণ্ড, মোরগ ৫½ পাউণ্ড।

আকার অনুযায়ী মুর্গী দুই প্রকার—ছোট বা হাল্কা জাতের (Light breed) ও বড় বা ভারি জাতের (Heavy breed)। পালনের উদ্দেশ্য অনুসারে উহাদের প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—(i) ডিমের জন্য, (ii) মাংসের জন্য, (iii) ডিম ও মাংস উভয় উদ্দেশ্যে। কেহ কেহ প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যেও পালন করে।

ডিমের জন্য পালিত

ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্ত্তী অঞ্চলের মুর্গী অধিকসংখ্যায় ডিমদানের জন্য বিখ্যাত। ইহাদের আকৃতি ভারতীয় মুর্গীর মত। ইহাদের ওজন সাধারণতঃ ৩—৪ পাউণ্ড হইয়া থাকে। এইজন্য ইহাদের ছোট বা হাল্কা জাতের মুর্গী বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহারা বেশ কষ্টসহিষ্ণু ও চঞ্চল প্রকৃতির। প্রায় সব দেশের জলবায়ু বিশেষ গ্রীষ্মাঞ্চলের আবহাওয়া সহ্য করিতে পারে। ইহারা শীঘ্র পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ৫-৬ মাস বয়ঃক্রম হইতে ইহারা ডিম দিতে আরম্ভ করে। ইহাদের ডিমের ওজন সচরাচর ২ আউন্স হয়। ডিমের আকার হাঁসের ডিমের মত সাদা ও লম্বা। ইহারা বৎসরে ২০০—২৫০ পর্য্যন্ত ডিম দিয়া থাকে। ইহারা ডিমে তা দিতে চায় না। সর্ব্বদা ছুটাছুটি করিতে ভালবাসে। ইহাদের মাংস তেমন সুস্বাদু হয় না।

ইহাদের শিখা ও গলদেশের মাংসখণ্ড বেশ বড়, লম্বা ও গাঢ় রক্তবর্ণ। শিখাটি সাধারণতঃ মাথার একপার্শ্বে হেলিয়া থাকে।

ইহাদের কাণের লতি সাদা। লেগ্‌হর্ণ, মিন্‌রকা, অ্যাণ্ডাল্‌সিয়ান প্রভৃতি উক্ত জাতির বিশিষ্ট মুর্গী।

মাংসের জন্য পালিত

এশিয়ার উৎকৃষ্ট জাতীয় মুর্গীগুলি সাধারণতঃ স্থূলকায়। ইহারা বড় বা ভারি জাতের মুর্গী (Heavy breed)। আকারে ইহারা বেশ বড় হয়। মোরোগের ওজন ৪—৫ পাউণ্ড হইয়া থাকে। মাংসের জন্য ইহারা আদৃত হয়। মাংসল মুর্গীর প্রায়ই মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সারা দেহ পালকে আবৃত থাকে। অন্যশ্রেণীর মুর্গীর পায়ে পালক থাকে না। ইহারা শান্ত প্রকৃতির হইয়া থাকে, ছুটাছুটি করিতে ভালবাসে না। ইহাদের শরীরে চর্ব্বি অধিক থাকে এবং খাইতে সুস্বাদু।

৮-৯ মাস বয়স হইতে ইহারা ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে। ইহাদের ডিমের সংখ্যা অল্প হয়। শীতঋতু ব্যতীত অন্যসময়ে ডিম দেয় না। ডিমের আকার ছোট, রং ঈষৎ গোলাপী, গাঢ়বাদামীও হয়। ডিমের খোলা মোটা। যাহারা কম সংখ্যক ডিম পাড়ে তাহাদের ডিমের খোলা মোটা হইয়া থাকে। ইহারা ডিমে তা দিতে ভালবাসে।

আস্‌লি, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মা, কোচিন, কালাহস্তী প্রভৃতি এই শ্রেণীর মুর্গী।

উভয় উদ্দেশ্যসাধক :—যে সব জাতের মুর্গী হইতে প্রচুর ডিম ও যথেষ্ট মাংস পাওয়া যায় সেইগুলিই সাধারণতঃ অধিক পালন করা হয়। এই প্রকার মুর্গী আকারে বেশ বড় হয় ওজন ৫-৬ পাউণ্ড পর্য্যন্ত হয়। ৭-৮ মাস বয়সেই ইহারা ডিম দিতে আরম্ভ করে। ইহাদের প্রকৃতি ধীর ও শান্ত, লেগহর্ণের মত সহসা ভীত হয় না বা ঐরূপ ছুটাছুটি করে না। সিঙ্গল ও রোজ উভয় প্রকার শিখা ইহাদের মাথায় দেখা যায়। রোড আইল্যাণ্ড রেড, অরপিংটন, প্লাইমাউথরক্ ওয়ানডট প্রভৃতি মুর্গী এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

কয়েকটি বিশিষ্ট জাতের মুর্গীর পরিচয়

লেগ্‌হর্ণ (Leghorn)

ইটালী দেশের অন্তর্গত লেগ্‌হর্ণ নামক স্থানের মুর্গী। এই জাতের মুর্গীর রং সাদা, কাল ও বাদামী হইয়া থাকে। সাদা রংএর লেগহর্ণ মুর্গী সচরাচর অধিক পোষা হয়। ইহাদের দেহের উপরিভাগের গঠন ধনুকের মত অর্থাৎ ঘাড় হইতে পিঠ এবং লেজ সুন্দর চক্ররেখায় ধনুকেরমত দেখায়। ইহাদের ঠোঁট ও পা গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ। কিন্তু ডিম পাড়ার সময় সাদা হইয়া যায়। ডিম পাড়া বন্ধ হইলে পুনরায় হলুদবর্ণ ধারণ করে। ইহারা প্রচুর ডিম দেয়। ডিমের রং সাদা এবং এবং লম্বাকৃতি, খোলা পাত্‌লা। খোলা পাতলা বলিয়া ডিম বেশীদিন রাখা যায় না। ইহাদের দুইপ্রকার শিখা দেখা যায় সিঙ্গল ও রোজ। সাধারণতঃ মোরগের ওজন ৬ এবং মুর্গীর ওজন ৪½ পাউণ্ড হইয়া থাকে।

লেগহর্ণ বড় ভীতু মুর্গী সহজে ভয় পায়। ইহারা সবরকম জলবায়ু সহ্য করিতে পারে এবং বেশ কষ্টসহিষ্ণু। বাংলাদেশের জলবায়ুতে ইহারা ভালই থাকে। ইহাদের মাংসও সুস্বাদু ডিম ও মাংস উভয় উদ্দেশ্যে ইহাদের পালন করা হয়। ইহারা অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির সেইজন্য ডিম ফুটান বা বাচ্চা প্রতিপালন করিতে চায় না।

রোড আইল্যাণ্ড রেড (Rhode Island Red)

ইহাদের বাস আমেরিকার নিকটস্থ রোড আইল্যাণ্ড দ্বীপ। ইহাদের পালকের রং গাঢ় ব্র্যাণ্ডির মত, ডানার অগ্রভাগ সামান্য কাল, লেজ দীর্ঘ। লেজের পালক কাল বা গাঢ় নীলবর্ণ। ইহাদের শিখা সিঙ্গল ও রোজ উভয়প্রকার হয়। সিঙ্গল শিখাযুক্ত মুর্গী সাধারণতঃ দেখা যায়। পা হলুদবর্ণ, চক্ষু উজ্জ্বল। চঞ্চু লাল্‌চে। ইহারা লেগহর্ণের মত প্রচুর ডিম পাড়ে। ডিমের রং বাদামী। ডিমে ভাল তা দেয় (good sitters)। ইহারা আরামপ্রিয়। ইহাদের শরীরে চর্ব্বি বৃদ্ধি পাইলে ডিম দেওয়া বন্ধ করে। ইহারা অত্যধিক গরম ও

রৌদ্র সহ্য করিতে পারে না। রৌদ্রতাপে ইহাদের পালকের রং ম্লান হইয়া যায়। গ্রীষ্মকালে ইহাদের ছায়া শীতল স্থানে রাখিতে হয়। পার্ব্বত্য ও উপত্যকা অঞ্চলে এবং নিম্নবঙ্গে ইহারা ভাল থাকে। ইহাদের দেহ বেশ মাংসল ও চর্ব্বিযুক্ত হয়। লেগহর্ণ অপেক্ষা ইহাদের মাংস অধিক সুস্বাদু সেইজন্য ইহাদের উভয় উদ্দেশ্যে পালন করা হয়। মোরগের ওজন ৮½ পাউণ্ড এবং মুর্গীর ওজন ৬½ পাউণ্ড হয়।

প্লাইমাউথ্ রক্ (Plymouth rock)

আমেরিকায় এই মুর্গী অধিক সংখ্যায় পালিত হয়। ইহাদের দেহ বেশ বড় এবং মাংস সুস্বাদু। লেগহর্ণ বা রোড আইল্যাণ্ডের মত ডিমের সংখ্যা অধিক না হইলে ও ডিম মন্দ দেয় না। ভালভাবে পালন করিলে ডিমের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ইহারা সাদা, কাল এবং ঈষৎ পীত বর্ণের হয়। সাদা ও পীতবর্ণের মুর্গীর প্রচলন অধিক। ইহাদের মাথার ঝুঁটি সিঙ্গল। দেহগঠন সামান্য লম্বা ও বেশ চওড়া, বক্ষ প্রশস্ত, অঙ্গসৌষ্ঠব সুন্দর। সাধারণ মোরগের ওজন ৯½ এবং মুর্গী ৭½ পাউণ্ড।

ব্ল্যাক্ মিন্‌রকা (Black Minorca)

দীর্ঘ দেহ, বৃহৎ শিখা ও প্রলম্বিত লতির জন্য কালমিন্‌রকা বিখ্যাত। দীর্ঘ পিঠ, কাঁধ হইতে লেজের গোড়া পর্য্যন্ত ঢালু। লেজ বেশ প্রশস্ত।

মোরগের ওজন ৯ এবং মুর্গীর ৭½ পাউণ্ড। ইহাদের পালক উজ্জ্বল কাল। ঠোঁট কাল, পায়ের অঙ্গুলি গাঢ় শ্লেট বর্ণের। ইহারা ভাল ডিম দেয় না।

ওয়ান্‌ডট (Wandotte)

দেহ বেশ গোলগাল, ঘন পালকে আবৃত। মাংস ও ডিম উভয় উদ্দেশ্যে পালন করা হয়। কাহারও রোজ, কাহারও বা শিঙ্গল শিখা

থাকে। মোরগের ওজন সচরাচর ৮½ এবং মুর্গীর ৬½ পাউণ্ড। ইহাদের রং সাদা, ফিকা পাংশু অথবা রূপার মত হইয়া থাকে।

ভাল মুর্গীর লক্ষণ

(i) যে সব মুর্গী প্রথম বৎসর ২০০টির অধিক ডিম পাড়ে এবং গড়ে এক ছটাক ওজনের ডিম দেয় তাহারা খুব ভাল মুর্গী বলিয়া গণ্য হয়।

(ii) যে সব মুর্গী সুস্থ, সবল, তেজী, চক্ষু উজ্জ্বল, চঞ্চু ও পায়ের নখ ছোট, শিখা রক্তবর্ণ, বুক ও পিঠ প্রশস্ত, তলপেটের নিচের দিকে সামান্য ঝোলা এবং বুকের হাড় ও তলপেটের হাড়ের মধ্যে ৪—৫ অঙ্গুলি ব্যবধান থাকে।

(iii) অধিক ডিমপ্রসূ মুর্গীর পাগুলি কৃশ ও গ্রীবা ক্ষুদ্র হইয়া থাকে। দীর্ঘ গ্রীবা অপকৃষ্ট মুর্গীর লক্ষণ। ডিম পাড়িতে আরম্ভ করিলে ঠোঁট, পা ও চক্ষু তারকার স্বাভাবিক হরিদ্রাবর্ণ ক্রমশঃ ফ্যাকাসে বা সাদা হইয়া যায় এবং পালক পরিত্যাগকালে (moulting) পুনরায় স্বাভাবিক হরিদ্রা বর্ণ ফিরিয়া আসে। ডিম দেওয়ার পক্ষে অনুপযুক্ত মুর্গীর ঐরূপ বর্ণ পরিবর্তন হয় না।

মুর্গীর ডিম দিবার ক্ষমতা নিম্নোক্ত পরীক্ষা দ্বারা বোঝা যায়—বাম হস্ত দ্বারা বেষ্টন করিয়া মুর্গীকে বাম বগলে ধরিয়া দক্ষিণ-হস্তের অঙ্গুলিগুলি দ্বারা বক্ষপঞ্জর (Breast bone) হইতে বস্তিগহ্বরের পঞ্জর অস্থির মধ্যের ব্যবধান নির্ণয় করিতে হয়। ঐ ব্যবধান ৪—৬ অঙ্গুলি হইলে মুর্গীটি ডিম দিবার পক্ষে উৎকৃষ্ট, দুই অঙ্গুলির কম হইলে অনুপযুক্ত বিবেচিত হয়।

ভাল মোরগের লক্ষণ

বলিষ্ঠ ও তেজস্বী হইবে। কণ্ঠস্বর তীব্র এবং ঘন ঘন চীৎকার করে। চক্ষু উজ্জ্বল, বুক ও পিঠ প্রশস্ত। পা মোটা, লম্বা ও সুদৃঢ়।

শিখা সোজা গাঢ় রক্ত বর্ণের। দেহ যথেষ্ট ভারী। বংশগত বৈশিষ্ট্য চিহ্ন সুস্পষ্ট।

মুর্গীকে এক বৎসর বয়সের পূর্ব্বে সঙ্গম করিতে দিলে বাচ্চা দুর্ব্বল হয়।

মোরগ এক বৎসর বয়সের পূর্ব্বে ও তিন বৎসর বয়সের পরে মুর্গীর সহিত সঙ্গম করিতে দেওয়া অনুচিত। ১০—১২টি মুর্গীর সহিত একটি মোরগ রাখাই বিধেয় ইহার অধিক রাখা বাঞ্ছনীয় নয়।

সপ্তম অধ্যায়

Numbering, Castration with Burdizzo's Castrator, ageing, casting and drenching etc.

চিহ্নিত করা (Numbering)

গৃহপালিত পশুদের সনাক্ত করিবার জন্য উহাদের নানাপ্রকারে চিহ্নিত করা হয়। একত্রে বহু পশু প্রতিপালিত হইলে উহাদের চিহ্নিত করা বিশেষ প্রয়োজন হয়। চিহ্ন দেখিয়া প্রত্যেকটি পশুকে সহজে চিনিয়া লওয়া যায়।

গরুকে চিহ্নিত করিবার জন্য নানাপ্রকার উপায় অবলম্বিত হয়। চিহ্ন দুই প্রকারে করা হইয়া থাকে—(ক) অস্থায়ী চিহ্ন, (খ) স্থায়ী চিহ্ন।

অস্থায়ী চিহ্ন :—উল্কিছাপ যন্ত্রে (Tatooing forcep) উল্কি কালি (Tatooing Ink) লাগাইয়া ছাপ দেওয়া হয়। এই কালির চিহ্ন দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ভিন্ন স্থান হইতে একত্রে গরু নির্ব্বাচন কালে সাধারণতঃ উহাদের নিতম্বদেশের উপরে এইরূপ ছাপ দিয়া চিহ্নিত করা হয়। খামারে আনিবার পরে স্থায়ী চিহ্ন দেওয়া হয়। নিম্নোক্ত প্রকারে স্থায়ী চিহ্ন দেওয়া হয়—

স্থায়ী চিহ্ন :—(i) (Branding) **দাগান**—অক্ষর বা সংখ্যাযুক্ত লৌহের ছাপা যন্ত্র (Branding Iron) অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া দক্ষিণ উরুর উপরে ছাপ দাগিয়া দেওয়া হয়। পশুর গাত্র গভীরভাবে পুড়াইয়া ছাপ দেওয়া অনুচিত। চামড়ার উপরিভাগ কেবল ঝল্‌সাইয়া যাইলে ছাপ স্থায়ী হইয়া যায়। তপ্ত লৌহ যন্ত্রদ্বারা ছাপ দিবার কালে গরুর যন্ত্রণা হয়। সেইজন্য ছাপ দিয়াই কার্ব্বলিক তৈল, তিল বা তিসির তৈল অথবা কোন প্রকার দগ্ধক্ষতের মলম ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিতে হয়। এইপ্রকার চিহ্ন স্থায়ী হয়। অল্প বয়সেই গোবৎসকে দাগিয়া চিহ্নিত করা উচিত। দুধ ছাড়িবার পরেই এইরূপ করা প্রশস্ত।

(ii) ছুরি দিয়া কাটিয়া কানে চিহ্ন করা হয়।

(iii) একপ্রকার ছিদ্রকারী যন্ত্রদ্বারা কানে উল্কি দেওয়া হয়; কান কাটিয়া চিহ্ন করা অপেক্ষা এইপ্রকারে স্থায়ী উল্কি দেওয়া শ্রেয়;

(iv) কান ছিদ্র করিয়া ধাতব চাক্‌কি আঁটিয়া দেওয়া হয় (Ear tagging);

(v) কখন কখন চিহ্নিত পিতলের চাক্‌তি গরুর শিংএ পরাইয়া দেওয়া হয়;

(vi) গলায় চেন পরাইয়া তাহাতে চিহ্নিত ফলক লাগাইয়া দেওয়া হয়।

মুর্গীকে চিহ্নিত করা

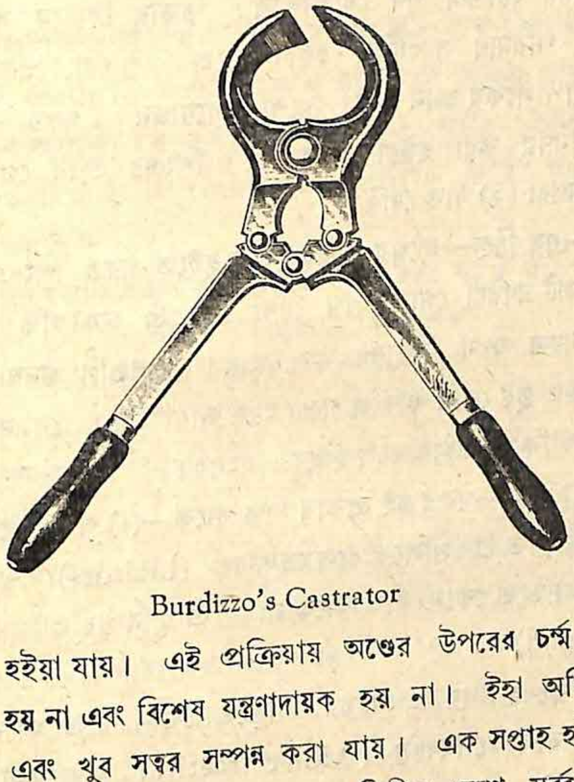
মুর্গীকে চিহ্নিত করিবার জন্য একটি ক্ষুদ্র পিতলের চিহ্নিত চাক্‌তি আংটি বা রিংএর সাহায্যে পায়ে পরাইয়া দেওয়া হয় অথবা পায়ের পাতায় Toe Punching যন্ত্রদ্বারা চিহ্ন খোদাই করা হয়।

খাসি করা (Castration)

পুংপশুর অণ্ডদ্বয় অপসারণ করাকে খাসি করা বলে। খাসি করার উদ্দেশ্য—(i) পশুকে সংযত করিয়া শ্রমসাধ্য কার্যোপযোগী করা, (ii) অবাঞ্ছিত বৃষকে খাসি করিয়া দুর্ব্বল নিকৃষ্ট বৎস উৎপাদন রোধ করা, (iii) মাংস প্রদায়ী পশুপক্ষীর দেহে মাংস ও মেদ বৃদ্ধি এবং উহা সুস্বাদু করা।

খাসি করিবার সময়—খাসি করিবার উদ্দেশ্যে সুস্থ, সবল বৎস নির্ব্বাচন করা হয়। ২—৮ মাস পর্য্যন্ত বয়সের পুং গোবৎস খাসি করা সহজ এবং কোন অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। ২—৪ মাস বয়সের গোবৎসকে খাসি করিলে উৎকৃষ্ট পরিশ্রমী বলদে পরিণত হয়। স্থায়ী দাঁত উঠিবার পরে অর্থাৎ অধিক বয়সে খাসি করিলে বলদ দুর্ব্বল ও তেজহীন হয়। শীতকাল খাসি করিবার প্রকৃষ্ট সময়। ২—৩ মাসের ছাগ খাসি করার পক্ষে উপযুক্ত।

প্রক্রিয়া ঃ—দুইরকম প্রথায় খাসি করা হয়—(i) অণ্ডথলি (Scrotum) চিরিয়া বীর্য্যবাহীনালী যাহা দ্বারা অণ্ড ও জনেন্দ্রীয় যুক্ত থাকে, ছেদ করিয়া অণ্ডদ্বয় বাহির করিয়া ফেলা হয় ; (ii) Burdizzo's Castrator নামক একপ্রকার যাঁড়াশী যন্ত্রদ্বারা অণ্ডের ১"—২" উপরে বীর্য্যবাহী নালীকা পিষিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে ঐ নালী



Burdizzo's Castrator

অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। এই প্রক্রিয়ায় অণ্ডের উপরের চর্ম্ম কাটিয়া রক্তপাত হয় না এবং বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক হয় না। ইহা অতি সহজ প্রক্রিয়া এবং খুব সত্বর সম্পন্ন করা যায়। এক সপ্তাহ হইতে দশ দিনের মধ্যে বৎস সুস্থ হইয়া যায়। প্রগতিশীল দেশে সর্ব্বত্রই এই যন্ত্রের সাহায্যে গরু, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া প্রভৃতি খাসি করা হয়।

বয়স নির্ণয় করা (Ageing)

এক বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ককে গোবৎস (Calf) বলে। তাহার পর প্রথম প্রসব না হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থাকে বকন (Heifer) বলে। বৎস জন্মিলে গাভী বলা হয় (Cow)। জন্মকাল হইতে পূর্ণ বয়স্ক না হওয়া

পর্য্যন্ত পুংবৎসকে এঁড়ে বাছুর (Bull calf) বলে। মুস্কহীন বা খাসিকরা পশুকে বলদ (Bullock) বলে। গরুর আয়ুকাল ২৫—২৮, অশ্বের ২৭, ছাগলের ১৫, ভেড়ার ১২, শূকরের ১০, মুর্গীর ৪ বৎসর।

সাধারণতঃ দুই বৎসর বয়স হইতে গরুর যৌবন আরম্ভ হয়। ২½—৩ বৎসর বয়সে প্রথম বৎস প্রসব করে। গরু ও মহিষের ৩—৫ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ যৌবনকাল। তৃতীয় বিয়ানে সাধারণতঃ দুগ্ধদানের পরিমাণ সর্ব্বাধিক হইয়া থাকে। সুতরাং গরুর বয়স সম্বন্ধে গোপালকের জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। গরুর বয়স দুই উপায়ে নির্ণয় করা হইয়া থাকে—(১) শিংএর উপর গোল চিহ্ন দেখিয়া অথবা (২) দাঁত দেখিয়া।

শিং-এর চিহ্ন—জন্মের তৃতীয় বৎসর হইতে গরুর শিং-এ প্রতি-বৎসর একটি করিয়া গোল দাগ দেখা দেয় ঐ চক্রাকৃতি দাগগুলি দেখিয়া গরুর বয়স নির্দ্ধারণ করা যায়। দাগগুলি গনণা করিয়া উহার সহিত দুই যোগ করিলে গরুর বয়স জানা যায়। যেমন শিং-এ ৬টি দাগ থাকিলে উহার বয়স হইবে ৮ বৎসর।

দন্তোদ্গম—গরুর দুই প্রকার দাঁত থাকে—(i) সম্মুখভাগে নীচের মাড়ির লম্বাকৃতি দাঁতগুলিকে বলে ছেদনদন্ত (Incisors) সম্মুখভাগের উপরের মাড়িতে কোন দাঁত থাকে না। ঐ স্থান খুব কঠিন (Hard dental pad)।

(ii) কষের উপর ও নীচের মাড়িতে চওড়া দাঁত থাকে। ঐ গুলিকে বলে পেষণদন্ত (Molar teeth)। তৃণভোজী পশুর পেষণদন্তগুলি খুব সবল ও বেশ বিকশিত হইয়া থাকে। পেষণ-দন্ত ও ছেদনদন্তের মধ্যে মাড়ির অনেকটা স্থান ফাঁকা, কোন দাঁত থাকে না। দাঁতের উপর ভাগ এনামেল বা কলাইদ্বারা আবৃত থাকে। উহাকে দাঁতের মাথা (Crown) বলে। দাঁতের মূল অংশ (Root portion) মাড়ির মধ্যে নিবদ্ধ থাকে। ছেদনদন্তে মাথা ও মূলের সংযোগ স্থান কলসির গলার মত সামান্য সরু হয় ঐ স্থানকে দাঁতের

ঘাড় (Neck) বলে। পেষণদন্তে ঘাড় থাকে না। বৎসকালে দাঁতের সংখ্যা নিম্নপ্রকার থাকে—

সম্মুখভাগে উপরের মাড়িতে কোন দাঁত থাকে না।
,, ,, নীচের মাড়িতে ছেদকদন্ত—৮
কষের উপর মাড়িতে পেষণদন্ত— ৬
,, নীচের ,, ,, — ৬

এইগুলি অস্থায়ী দাঁত। ইহাদের বলে দুধে দাঁত (Milk or temporary teeth)। এই দাঁতগুলি বৎসকালে পড়িয়া যায়। ইহার পর নূতন দন্তোদগম হয় এবং গরুর বৃদ্ধিকাল অবধি ঐগুলি থাকে। ঐগুলি স্থায়ী দাঁত (Permanent teeth)। স্থায়ী দাঁত এইরূপ সংখ্যায় থাকে—

সম্মুখভাগের উপরের মাড়িতে কোন দাঁত থাকে না।
,, নীচের মাড়িতে ছেদকদন্ত—৮
কষের উপরের মড়িতে পেষণদন্ত —১২
,, নীচের মাড়িতে ,, —১২

পেষণদন্তগুলি প্রথমটি হইতে শেষটি পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে আকারে বড় হইয়া থাকে।

গরু খাইবার সময় নীচের ছেদনদন্ত ও উপরের কঠিন মাড়ির সাহায্যে তৃণাদি দৃঢ়রূপে চাপিয়া লম্বা জিহ্বা দ্বারা ছিঁড়িয়া লয়। ছেদনদন্ত দেখিয়া সাধারণতঃ গরুর বয়স নির্ণয় করা হয়।

গোবৎসের জন্ম সময়ে নীচের মাড়িতে দুইটি অস্থায়ী ছেদনদন্ত থাকে, উপরের মাড়িতে কোন দাঁত থাকে না। জন্মের দ্বিতীয় সপ্তাহে চারিটি দাঁত দেখা দেয় এবং তৃতীয় সপ্তাহে ছয়টি। মাস পূর্ণ হইলে ৮টি দুধে দাঁত সম্পূর্ণ হয় এবং ৩টি পেষণদন্ত থাকে। ৬ মাস পর্য্যন্ত এই দাঁতগুলি পরিস্কার ও সমান থাকে! ৬ মাসের পর ঐগুলি বিবর্ণ হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। ৬ মাসে চতুর্থ পেষণদন্ত নির্গত হয়। এক বৎসর হইতে এক বৎসর তিনমাসের মধ্যে পঞ্চম পেষণদন্ত নির্গত হয়। এক বৎসর নয় মাসে অস্থায়ী ছেদনদন্তের স্থানে স্থায়ী

ছেদকদন্ত এবং ষষ্ঠ পেষণদন্ত বহির্গত। সম্মুখের স্থায়ী ছেদকদন্তগুলি আকৃতিতে বড় হয়।

দ্বিতীয় বৎসরে স্থায়ী ছেদনদন্ত সম্পূর্ণ বিকশিত হয়। তাহার পর ইহারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। এই সময় প্রথম ও দ্বিতীয় অস্থায়ী পেষণদন্তের স্থানে স্থায়ী পেষণদন্ত নির্গত হয়।

দুই বৎসর তিন মাসে দ্বিতীয় স্থায়ী ছেদকদন্ত বহির্গত হয়। ঐ দুইটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। দুই বৎসর নয় মাসে তৃতীয় জোড়া স্থায়ী ছেদকদন্ত ও তৃতীয় পেষণদন্ত নির্গত হয়। ৪—৫ বৎসরে দাঁতগুলির ধারের দিক সামান্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং এক একটি দাঁত স্পষ্ট হইয়া উঠে। অতএব তিন বৎসর ছয় মাসের পর দন্তক্ষয়ের অবস্থা দেখিয়া মোটামুটি বয়স নির্দ্ধারণ করা যায়। পাঁচ বৎসরের শেষে আটটি স্থায়ী দাঁত নির্গত হইয়া দন্তোদগম সম্পূর্ণ হয়। ঐ দাঁতগুলি এক সমতলে সজ্জিত থাকে। এই সময় প্রথম ও দ্বিতীয় জোড়া দাঁত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ইহার পর দাঁত দেখিয়া বয়স নির্ণয় করা কঠিন। অতি অভিজ্ঞ ব্যক্তি দাঁতের ক্ষয় পরীক্ষা করিয়া মোটামুটি বয়স অনুমান করিতে পারে মাত্র। ছয় বৎসরের পর হইতে পশু বয়োবৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে তদনুযায়ী উহার মূল্য কমিয়া যায়। ৭ বৎসর বয়সে দাঁতের বর্হিভাগ প্রায় অর্দ্ধেক ক্ষয় পায়। দশ বৎসর বয়সে দাঁতের মাথার (crown) অধিকাংশ ক্ষয় হইয়া যায়, সামান্য এনামেল অবশিষ্ট থাকে। ১৩—১৬ বৎসরে সম্পুর্ণ এনামেল উঠিয়া যায়।

গরুকে শায়িত করা (Casting)

গরুর চিকিৎসার জন্য, খাসি করিবার জন্য, বলদের খুরে লোহার নাল আঁটিবার জন্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনে গরুকে শোয়াইবার প্রয়োজন হয়। শোয়াইবার পূর্ব্বে কয়েকটি সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। ১২ ঘণ্টা পূর্ব্বে উহার আহার বন্ধ করিয়া দিতে হয়। উদর পূর্ণ থাকিলে পতনকালে উদরদেশে আঘাত লাগিয়া হানী হইতে পারে। আবহাওয়া চরম থাকিলে শোয়াইয়া ফেলা উচিত নয়। আবহাওয়া

মৃদু ও বায়ুতাপ স্বাভাবিক থাকিলে উন্মুক্ত তৃণাচ্ছাদিত স্থানে গরুকে শায়িত করা বিধেয়। তৃণাচ্ছাদিত স্থানের অভাবে ভূমির উপর যথেষ্ট খড় বিছাইয়া পরিষ্কার জল দিয়া সামান্য ভিজাইয়া দিতে হয়। জলে কোন বিশোধক (antiseptic) মিশাইয়া দেওয়া ভাল। শোয়াইবার স্থানে ইট, পাথরের টুক্‌রা প্রভৃতি কোন কঠিন বস্তু থাকিবে না।

গরুকে শোয়াইবার সময় একজন গরুর শিং দুইটি ধরিয়া মস্তক একপার্শ্বে কাত করিয়া শক্তভাবে ধরিয়া রাখে, অন্যজন একটা বড় শক্ত দড়ি গরুর পিঠ ও উদর বেষ্টন করিয়া জোরে কষিতে থাকে। অল্প সময়ের মধ্যে গরুটি এক পার্শ্বে কাত হইয়া পড়িয়া যায়। গরু পড়িয়া যাইবার কালে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয় যাহাতে আঘাত না লাগে। তাহার পর আবশ্যকবোধে উহার পাগুলি বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

ঔষধ সেবন করান (Drenching)

গরুকে ঔষধ সেবন করাইবার প্রয়োজন হইলে উহার দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বামবাহু উহার মাথার উপর দিয়া ঘুরাইয়া তিনটি অঙ্গুলি—তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা ছেদনদন্ত ও পেষণদন্তের মধ্যে দন্তশূন্য মাড়ি চাপ দিয়া ধরিয়া দক্ষিণ হস্ত দিয়া ঔষধের বোতল ধরিয়া উহার গলদেশে ঔষধ ঢালিয়া দিতে হয়।

শিং ছেদন করা (Dehorning)

গরুর শিং থাকিলে (i) মানুষ অথবা অন্য পশুকে আহত করিবার সম্ভাবনা থাকে, (ii) অপর গরুর পালান অথবা কোন অঙ্গে স্থায়ী ক্ষতিসাধন করিয়া উহাকে চিরতরে গোশালার অনুপোযোগী বা অকর্ম্মণ্য করিয়া দিতে পারে, (iii) বিশেষতঃ শিং বিশিষ্ট গরু সাধারণতঃ লড়াই প্রিয় হয় সুতরাং উহাদের অধিক দূরত্বের ব্যবধানে রাখিবার জন্য খাটাল বড় করা প্রয়োজন। এই সব কারণে গরুর শিং ছেদন করা আবশ্যক।

শিং ছেদনের প্রকৃষ্ট সময়—শিংএর মাথা (horn bottons) উদ্‌গমের পূর্ব্বেই উহা বিনষ্ট করিয়া দেওয়া। ৩—১০ দিন বয়সেই বাছুরের শিং উদ্‌গম বিনষ্ট করিবার প্রকৃষ্ট সময়।

শিং ছেদন প্রণালী

(i) বাছুরের শিং নির্গমের স্থানের (horn bottons) চতুর্দ্দিকের লোম কাঁচি দিয়া সম্পূর্ণ ছাঁটিয়া দিতে হয় এবং শিংএর উপরের মরা চামড়া চাঁচিয়া ফেলিতে হয়। তাহার পর শিংএর গোড়ার চারিধারে এমন ভাবে Vaseline লাগাইতে হয় যাহাতে শিংএর উপরিভাগে না লাগে। রবারের দস্তানা হাতে পরিয়া অথবা মোটা কাগজ বা তুলা দ্বারা একটি কস্টিক পটাশ বর্ত্তিকা (Caustic Potash Pencil) লইয়া উহার অগ্রভাগ জলে সামান্য ভিজাইয়া শিংএর উপর চক্রাকারে ঘষিতে হয়, যতক্ষণ না পর্য্যন্ত ঐ স্থান সম্পূর্ণ পুড়িয়া যায় বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তাহার পর পূর্ব্ব স্থানে আর একবার Vaseline লাগাইয়া দিতে হয়। এইসব কার্য্য সমাধা হইলে উপর হইতে দড়ি ঝুলাইয়া ১—২ ঘণ্টা বাছুরটিকে বাঁধিয়া রাখিতে হয় যাহাতে বাছুর দেয়ালে মাথা ঘষিতে না পারে। Caustic Potash চর্ম্মে লাগিলে ক্ষত সৃষ্টি করে সেইজন্য শিংএর বহির্ভাগের চর্ম্মের উপর Vaseline লাগাইয়া দিতে হয় এবং প্রয়োগকারীর সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। অধুনা বাজারে Collodian Caustic Potash পাওয়া যায়। ইহা ব্যবহারে জ্বালা যন্ত্রণা হয় না ও গড়াইয়া পড়ে না।

(ii) শিং বিশিষ্ট গরুর করাত বা শিং কাটা যন্ত্র (Saws or Clippers) দ্বারা শিং কাটিয়া দেওয়া হয়। শিং ও চর্ম্মের সংযোগ স্থানের ¼ ইঞ্চি নিম্নে কর্ত্তন করিলে নূতন চর্ম্ম গজাইয়া শিং উদ্গম স্থান আচ্ছাদন করিয়া দেয়, সুতরাং আর শিং গজাইতে পারে না।

ক্ষতস্থানে Pine tar oilএর সহিত tannic acid মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে মাছির উপদ্রব নিবারিত হয়।

(iii) প্রগতিশীল দেশে Electric hot iron দ্বারা ১৫ সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে একটি শিং ছেদন করা হয়।

ষষ্ঠ ভাগ

মৎস্য চাষ (Pisiculture)

Syllabus

Fisheries—(i) Different types of fisheries—inland (tanks, beels, paddy fields and rivers), estuarine and marine.

(ii) Nutritional value of fish as a dietory constituent ; broad classification and characteristics of common fish of West Bengal ; life history of Indian major carp like Rohu, Katla and Mirgel.

প্রথম অধ্যায়

বিভিন্ন প্রকার মৎস্যস্থলী

(Different types of fisheries)

জলের অবস্থিতি ও উহার উপর প্রাকৃতিক প্রভাব অনুযায়ী জলকে দুই রূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে—স্রোতের জল, ও বদ্ধ জল। উভয় প্রকার জল নানা জাতির মাছের আবাস। স্রোতের জল বলিতে সমুদ্র, নদী, খাড়ি প্রভৃতি বুঝায়, এবং বিল, ঝিল, পুকুর, ডোবা, জলা প্রভৃতি বদ্ধ জলাশয়।

সমুদ্র, নদী, খাড়ি প্রভৃতি জলস্রোতের মাছ কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে সব সময় থাকে না, স্রোতের সহিত উহারা ভাসিয়া বেড়ায়। তাহাদের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও বংশ বিস্তার প্রাকৃতিক বিধানে চলিয়া থাকে। একমাত্র তাহাদের ধরিয়া লওয়া ব্যতীত মানুষ আর কিছু করিতে পারে না। মানুষ কেবলমাত্র বদ্ধ জলাশয়ের মাছের পালন, রক্ষণ বৃদ্ধি প্রভৃতি নানা উপায়ে করিয়া তাহাদের বিস্তার সাধন করিতে পারে। যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া মানুষ এইসব কার্য্য করে তাহাকে মাছের চাষ বলে। পশ্চিমবঙ্গে সমুদ্র, নদী, খাড়ি, বিল, ঝিল, ভেড়ী, ধান ক্ষেত, পুষ্করিণী প্রভৃতি নানাপ্রকার জলাশয় হইতে মৎস্য পাওয়া যায়।

সমুদ্র ও নদীর মোহনা—অগ্রসর দেশে জাহাজ যোগে যে প্রকারে গভীর সমুদ্র হইতে মাছ ধরা হয়, এদেশে এতদিন পর্য্যন্ত সেইরূপ কোন ব্যবস্থা ছিল না। সম্প্রতি রাজ্য সরকার ট্রলারযোগে গভীর সমুদ্র হইতে মাছ ধরিবার জন্য অগ্রণী হইয়াছেন।

সমুদ্র উপকূলবাসী মৎস্যজীবীরা নৌকা লইয়া উপকূল সমুদ্র, নদীর মোহনা বা খাড়ি হইতে নানাপ্রকার মাছ ধরিয়া থাকে। বর্ত্তমানে কলিকাতার সহিত এই অঞ্চলের কতকাংশের রাস্তার সংযোগ হওয়ায়

মটর লরিযোগে মাছ চালান দেওয়ার সুবিধা হইয়াছে। তাহার ফলে পূর্ব্বাপেক্ষা এ অঞ্চলে অধিক মাছ ধরা হইতেছে। রাস্তাঘাট এবং পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হইলে এই অঞ্চলে মাছ ধরা বৃদ্ধি পাইবে।

ভেড়ী—নদীর নিকটবর্ত্তী বিস্তৃত নিম্নভূমির চারিদিকে উচ্চ বাঁধ দিয়া ঘেরা হয়। চৈত্র, বৈশাশ মাসে নদীর জোয়ারের জল ঐ জমির ভিতর প্রবেশ করান হয়। ইহাকে ভেড়ী বলে। স্রোত জলের সহিত নানাপ্রকার লোনা জলের মাছ, যেমন ভেট্‌কি, পার্শ্বে, ট্যাংরা ভাঙ্গড়, গুড়জাওয়ালি, ভোলা প্রভৃতি মাছের ডিম পোনা এবং চিংড়ি উহার মধ্যে প্রবেশ করে ও বৃদ্ধি পায়। শীতকালে ঐসব মাছ ধরিয়া লওয়া হয়। এইসব মাছ অতি সুস্বাদু।

ধানক্ষেতের ঘেরী—নদী তীরবর্ত্তী বিস্তৃত নিম্ন ধান জমিতে ভেড়ীর মত উচ্চ বাঁধ দিয়া চৈত্র, বৈশাখ মাসে জোয়ার জল প্রবেশ করান হয়। বৃষ্টি পড়িয়া জলের লোনা কমিয়া যাইলে শ্রাবণ মাসে উহাতে ধান (Deep water saline paddy) রোপণ করা হয়। এই প্রকারে ধানি জমিতে মৎস্য উৎপাদনকে ঘেরীতে মাছ চাষ বলে। এই প্রকারে একই জমি হইতে ধান ও মাছ উভয়ই পাওয়া যায়।

ধানক্ষেতে মাছের চারা পালন—উক্ত প্রকার নিম্নস্থানের জমি অপেক্ষা কিছু উঁচু ধানক্ষেতে যেখানে বর্ষার শেষে দেড়, তুই ফুট জল থাকে তাহার চারিদিকে উঁচু বাঁধ দিয়া মাছের পোনা ছাড়িয়া দিলে প্রায় দেড় মাসের মধ্যে ঐগুলি অতি দ্রুত বাড়িয়া যায়। বর্ষার শেষে পুকুর বা জলাশয়ের সহিত নালা কাটিয়া ধানক্ষেতের সহিত সংযোগ করিয়া দিলে চারা মাছগুলি আপনা হইতে গভীর জলে চলিয়া যায়।

বর্ষাকালে বাহিরের জলের সহিত নানাপ্রকার মাছ ও চিংড়ি ধান ক্ষেতের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। জল কমিতে থাকিলে, উহাদের ধরা হয়।

নালা, খন্দ, প্রভৃতিতে বর্ষাকালে নানাভাবে জলের সহিত চূনা, পুঁটি, ট্যাংরা, ছোট চিংড়ি প্রভৃতি প্রবেশ করিয়া থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র উপকূল, নদী মোহনা ব্যতীত নদীর উপর অঞ্চলেও নানাপ্রকার মাছ ধরা হয়। বিল, ঝিল হইতেও মাছ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে খৃঃ পূঃ ৩৫০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে মাছ পালনের ইতিহাস পাওয়া যায়। কালক্রমে পুষ্করিণীতে মৎস্য পালন বৃদ্ধি পায়। বিল, ঝিল, পুষ্করিণী প্রভৃতি বদ্ধ জলাশয়ে মাছ পালন পদ্ধতি প্রায় একইরূপ। পুষ্করিণী সম্বন্ধে আলোচনা ঐগুলির প্রতিও প্রযোজ্য হইবে।

বিভিন্নপ্রকার পুষ্করিণী ও তাহাদের নির্ব্বাচন

(Different types of Tanks and their selection)

বাংলাদেশে নানাপ্রকার পুষ্করিণী দেখা যায়। স্থান বিশেষে উহাদের অবস্থিতি এবং প্রকৃতি অনুযায়ী নিম্নরূপে ভাগ করা যায়ঃ

(১) নিম্নস্থানের পুকুর, যেগুলি বর্ষাকালে ভাসিয়া যায় এবং গ্রীষ্মকালে উহাদের মধ্যে ৫—৬ ফুট জল থাকে। এই প্রকার পুষ্করিণী মাছ চাষের পক্ষে উৎকৃষ্ট হইলেও ভাসিয়া যাওয়ার জন্য মাছ চাষের পক্ষে অনুকূল নয়।

(২) পাড় বেষ্টিত উচ্চ অথবা নিম্নস্থানে অবস্থিত পুষ্করিণী, যেগুলি বর্ষায় ভাসিয়া যায় না এবং নিকটবর্ত্তী জলাশয়ের সহিত নালী কাটিয়া সংযোগ করিয়া উহার মধ্যে জল প্রবেশ করান যায়। এই প্রকার পুষ্করিণী রুই, কাত্‌লা মৃগেল প্রভৃতি পোনা মাছ চাষের পক্ষে উৎকৃষ্ট বিবেচিত হয়।

(৩) নিম্নস্থানের পুকুর, বর্ষাকালে ভাসিয়া যায় এবং গ্রীষ্মকালে সম্পূর্ণ অথবা প্রায় শুকাইয়া যায়, এইরূপ পুকুরে চারা পোনা ভাল বৃদ্ধি পায়, কিন্তু ভাসিয়া যাওয়ার জন্য কোন কাজে আসে না।

(৪) উচ্চ জমিতে এমন স্থানে অবস্থিত যে বর্ষায় ভাসিয়া যায়

না এবং অন্যস্থান হইতে উহাতে জল প্রবেশ করান যায় না এবং গ্রীষ্মকালে অন্ততঃ ৫—৬ ফুট জল থাকে এইরূপ পুকুর মাছ চাষের পক্ষে উপযোগী।

(৫) উচ্চ জমিতে অবস্থিত পুকুর গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া যায়। গভীরতা অনুযায়ী চারা পোনা পালনের পক্ষে উপযোগী হয়।

(৬) উচ্চ পাড় বেষ্টিত পুরাতন পুষ্করিণী সংস্কারের অভাবে পঙ্কিল হইয়া গিয়াছে এবং গ্রীষ্মকালে ৪·—৫ ফুট জল থাকে। এই প্রকার পুষ্করিণী শোল, ল্যাটা, চিতল, বাইন, কই, মাগুর, সিঙ্গি প্রভৃতি জেয়ল মাছ চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

পুষ্করিণীর তলদেশের মাটির গুণানুসারে মাছ চাষের উপযোগীতা নির্ভর করে। সাধারণতঃ অম্লযুক্ত মাটি (acid soil) মাছের বৃদ্ধির পক্ষে প্রতিকূল এবং ক্ষার মাটি (alkaline soil) বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় স্থানের মাটি ক্ষারময়। যে সব পুষ্করিণীতে অধিক জলজ উদ্ভিদ, লতা, পাতা প্রভৃতি বহুদিন ধরিয়া পচিতে থাকে সেই সব পুকুরের মাটি অম্লময় হইয়া যায়। ঐ প্রকার পুকুর বড় মাছের পক্ষে অনুপযুক্ত, উহাতে মাছ বাড়ে না এবং মাছ সুস্বাদু হয় না। যে সকল পুকুরের তলদেশে এক ফুট পর্য্যন্ত নরম কাল পলিমাটি বা পাঁক থাকে সেইরকম পুকুর পোনা মাছ উৎপাদনের পক্ষে উৎকৃষ্ট। যাহাদের তলদেশে বালি, কাঁকর প্রভৃতি অধিক পরিমাণে থাকে, সেইপ্রকার পুকুরে মাছ ভাল বাড়ে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

খাদ্যোপাদানে মৎস্যের পরিপোষণ মূল্য

(Nutritional value of fish as a dietory constituent)

মাছ অতি পুষ্টিকর খাদ্য। উহার পরিপোষণ ক্ষমতা খুব বেশী। অর্থাৎ আমাদের শরীর মাছের অধিকাংশই গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্টি লাভ করে। মাছের শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ আমাদের শরীরে গৃহীত হয়। মাছের প্রোটিনের শতকরা ৯৭ ভাগ এবং চর্ব্বির শতকরা ৯০ ভাগ আমাদের দেহ লইতে পারে। মাংস অপেক্ষা মাছে প্রোটিন কিছু কম থাকে। রন্ধন করা মাংসে প্রোটিন থাকে ২০—৩০ শতাংশ রন্ধন করা মাছে ১১—২৫ শতাংশ। চর্ব্বি হইতে আমরা জীবনী শক্তি তেজ (Energy) লাভ করি। জীবনীশক্তি সঞ্চারক হিসাবে চর্ব্বিযুক্ত মাছ প্রায় মাংসের সমতুল্য। একমাত্র ভাইটামিন সি ব্যতীত মাছে অন্যান্য প্রায় সকল প্রকার ভিটামিন থাকে, বিশেষ ভিটামিন এ ও ডি মাছের তৈলে প্রচুর থাকে। আইওডিন ও যথেষ্ট থাকে, বিশেষ সামুদ্রিক মাছে।

খাদ্য হিসাবে মাছকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—(১) যাহাদের দেহে শতকরা দুইভাগের অধিক চর্ব্বি থাকে তাহাদের বলে "মোটা মাছ" (Fat fish), আর (২) যাহাদের দেহে শতকরা দুইভাগের কম চর্ব্বি থাকে তাহাদের বলে হাল্‌কা বা লঘু মাছ (Lean fish)। রুই, কাত্‌লা, মৃগেল প্রভৃতি প্রথম প্রকার মাছ, এবং মৌরলা, পুঁটি, কৈ, মাগুর, সিঙ্গি প্রভৃতি দ্বিতীয় প্রকার মাছ। লঘু মাছে চর্ব্বি কম বলিয়া সহজ পাচ্য, এইজন্য দুর্ব্বল ও রোগীদের পথ্য হিসাবে খাইতে দেওয়া হয়।

কয়েকটি মাছের পুষ্টিকর উপাদান

	প্রোটীন	চর্ব্বি (fat)	শরীরে গ্রহনোপযোগী লৌহ	চূণ (Calcium)	ফস্‌ফরাস
	গ্র্যামে			মিলিগ্র্যামে	
রুই—	১৬.৬	১.৪	০.৫	৬৮০.০	১৫০.০
কাত্‌লা—	১৯.৫	২.৪	.৫৫	৫১০.০	২১০.০
মৃগেল—	১৯.৫	.৮	০.৪১	৩৫০.০	২৮০.০
কালবোস—	১৪.৭	১.০	০.২৬	৩২০.০	৩৮০ ০
মাগুর—	১৫.০	১.০	০.৭৫	২১০.০	২৯০.০
সিঙ্গি—	২২.৮	০.৬	০.৯৭	৬৭০.০	৬৫০.০
কৈ—	১৪.৮	৮.৮	০.৭৪	৪১০.০	৩৯০.০
ট্যাংরা—	১৯.২	৬.৪	০.৩১	২৭০.০	১৭০.০
শোল—	১৬.২	২.৩	০.৭৫	১৪০.০	৯৫.০
বোয়াল—	১৫.৪	২.৭	০.৩৬	১৬০.০	৪৯০.০

মাছের সাধারণ শ্রেণীবিভাগ এবং পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মাছের বৈশিষ্ট্য

(Board classification and characteristics of common fish of West Bengal)

জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ আকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মাছকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন—অস্থিযুক্ত মাছ (Boney fish), ও উপাস্থিবিশিষ্ট মাছ (Cartilaginous fish)। এই পুস্তকের প্রাণিবিদ্যা অংশে দ্রষ্টব্য।

বসবাস অনুযায়ী মাছকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) **সামুদ্রিক মৎস্য** (Marine fish), যেমন পম্‌ফ্রেড, পায়রা চাঁদা, ম্যাকারেল্‌, রিবন্‌, প্রভৃতি; (২) নদীর **মোহনা** বা খাড়ি অঞ্চলের **লোনা জলের মাছ** (Salt water fish), যেমন পার্শে, ভাঙ্গড়, গুড়জাওয়ালি, ভেট্‌কি, ভোলা, ইলিশ, ট্যাংরা প্রভৃতি, (৩) **মিঠা**

জলের মাছ (Fresh water fish), খাল, বিল, পুকুর, নদী, প্রভৃতি মিঠা জলের মাছ যেমন রুই, কাত্‌লা, মৃগেল, কালবোস ইত্যাদি। আবার মাছের ও জলের প্রকৃতি অনুযায়ী মিঠা জলের মাছকে দুইভাগ করা যায়—(ক) পরিস্কার জলের মাছ, (খ) পঙ্কিল, বদ্ধ, অপরিস্কার জলের মাছ।

পরিস্কারজলের মাছ—মহাশোল, ধাঁই, চিতল, রুই, কাত্‌লা, মৃগেল, বোয়াল, আড় প্রভৃতি। মহাশোল ও ধাঁই বৃহৎ নদী ভিন্ন অন্যত্র থাকে না। অপরগুলি নদী, হ্রদ, পুকুর, বিল, ঝিল প্রভৃতিতে বাস করে। রুই কাত্‌লা প্রভৃতি পোনা মাছ কিন্তু পুকুরে ডিম পাড়ে না, অপর পক্ষে বোয়াল চিতল, আড় প্রভৃতি মাছ বদ্ধ জলে ডিম ছাড়ে।

পঙ্কিল, অপরিস্কার জলের মাছ

ঝিল, বিল, জলা, ডোবা, পচা পুকুর প্রভৃতির পঙ্কিল, অপরিস্কার জলে মাগুর, সিঙ্গি, কৈ, শোল, সাল, ল্যাঠা প্রভৃতি মাছ বাস করে এবং ডিম পাড়ে। এইরূপ জলাশয়ে মাগুর, সিঙ্গি প্রভৃতি মাছ ঘাস, আগাছা জলজ উদ্ভিদ প্রভৃতি দিয়া সুন্দর বাসা প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে ডিম পাড়ে।

ইলিশ মাছ নদীর লোনা ও মিঠা অর্থাৎ উভয় প্রকার জলে থাকে, পুকুরে থাকে না। কিন্তু নদীর উজানে মিঠা জলে আসিয়া ডিম ছাড়ে। ট্যাংরা, বোয়াল প্রভৃতি উভয় প্রকার জলে নদী ও পুকুরে থাকে এবং ঐসব স্থানে ডিম ছাড়ে। জীববিদ্যা অনুযায়ী চিংড়ি যদিও মাছ শ্রেণীর অন্তর্গত নয় কিন্তু মাছের মত প্রিয় খাদ্য হিসাবে উচ্চ মর্য্যাদা লাভ করে। ইহাদের মধ্যে বাগ্‌দা ও গল্‌দা চিংড়ি বাঙ্গালীর অতি রসনা তৃপ্তিকর। বাগ্‌দা চিংড়ি খাড়ি, মোহনা, ভেড়ী প্রভৃতি লোনা জলের এবং গল্‌দা বা মোচা চিংড়ি মিঠা জলের জীব।

রুই, কাত্‌লা, মৃগেল প্রভৃতি ভারতীয় প্রধান জাতির মৎস্যের জীবনবৃত্তান্ত

(Life history of Indian major carp like Rohu, Katla and Mrigel)

রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবোস প্রভৃতিকে সমষ্টিগতভাবে পোনা মাছ বলা হয়। ইহাদের জীবনবৃত্তান্ত একই প্রকার। ইহারা মিঠা জলের মাছ। নদী ও বদ্ধ জলাশয় উভয় স্থানে থাকে। কিন্তু বদ্ধ জলাশয়ে ডিম পাড়ে না। ইহাদের প্রয়োজনের জন্য জলে প্রচুর অক্সিজেন থাকা আবশ্যক। বদ্ধ জলাশয়ের জলে অক্সিজেন কম থাকে। বৃষ্টির জলে যথেষ্ট অক্সিজেন থাকে। বর্ষাকালে পুকুরে বৃষ্টির জল পড়িলে ও পুরাতন জল অধিক থাকায় উহাদের প্রজননের পক্ষে প্রয়োজনীয় পর্য্যাপ্ত অক্সিজেন পাওয়া যায় না। বিস্তৃত স্থানে বৃষ্টির জল অগভীর হইয়া জমিলে উহার উপর দিয়া অবাধে বায়ু চলাচল করে, ঐ প্রকার জলে যথেষ্ট অক্সিজেন দ্রবীত হয়। এইরূপ জল পোনা মৎস্যের প্রজননের পক্ষে উপযোগী।

নদীর কিনারার নিকটে যেখানে জল গভীর নয়, অগভীর জলমগ্ন চড়ায় (Shallow water) এবং নদী তীরের নিকটস্থ বিস্তৃত নীচু জমির উপর নূতন বৃষ্টির জল পড়িয়া নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়—এইরূপ জলে পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী ও পুং পোনা মৎস্য প্রবেশ করে এবং ডিম পাড়ে। এইসব জল অঞ্চল ব্যতীত মেদিনীপুর, বাঁকুড়া পুরুলিয়া প্রভৃতি জেলায় বাঁধ নামক বৃহৎ জলাশয়ে পোনা মাছের ডিম হয়। পশ্চিমবঙ্গে ভাগিরথী, দামোদর, সুবর্ণরেখা, কংসাবতী প্রভৃতি নদী এবং বাঁধ জলাশয় হইতে পোনা মাছের ডিম ধরা হয়। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র ও বাহিরের বহুস্থানে ঐ ডিম পোনা চালান দেওয়া হয়। ঐ ডিম পোনা পুকুর প্রভৃতি জলাশয়ে ছাড়িয়া মাছ চাষ করা হয়।

গ্রীষ্মকাল হইতে স্ত্রী মৎস্যের ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণু জন্মিতে থাকে। বর্ষার প্রথম দিক অর্থাৎ জৈষ্ঠ হইতে শ্রাবণ মাস, জুন হইতে আগষ্ট

মাস পর্য্যন্ত স্ত্রী মাছ উক্ত প্রকার জলে ডিম ছাড়ে। পুং মৎস্য ঐ ডিমগুলির উপর বীর্য্য ছড়াইয়া দেয়, তাহাতে ডিমগুলি পরিপুষ্ট (fertilised) হয়। ১৫—১৬ ঘণ্টার মধ্যে ডিমের বহিরাবরণ ফাটিয়া যায় এবং লম্বা বাচ্ছা বাহির হইয়া আসে। মাছ একসঙ্গে বহু ডিম প্রসব করে। একটি রুই মাছ প্রায় ১০ লক্ষ ডিম ছাড়ে। কিন্তু পোনা মাছ নিজেরা বহু ডিম খাইয়া ফেলে। সদ্যজাত পোনা মাছের ডিম আকারে সরিষার মত। ডিম হইতে বাহির হইবার পর প্রথমে বাচ্ছার মুখ থাকে না পরে মুখ দেখা দেয়। তখন উহারা এককোষী শৈবাল ও এককোষী প্রাণী খাইতে থাকে। একটু বড় হইলে ক্ষুদ্র চিংড়ি, জলের মাছি (water fleas) ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট প্রভৃতি খায়। পরে বহুকোষী শৈবাল ও নানাপ্রকার আধ পচা জলজ উদ্ভিদ খাইয়া থাকে। নদীর ধারের বদ্ধ জলের বাচ্ছাগুলি ক্রমশঃ নদীতে নামিয়া আসে। জেলেরা সরু জাল দিয়া ছাঁকিয়া ঐ বাচ্ছাগুলি ধরে।

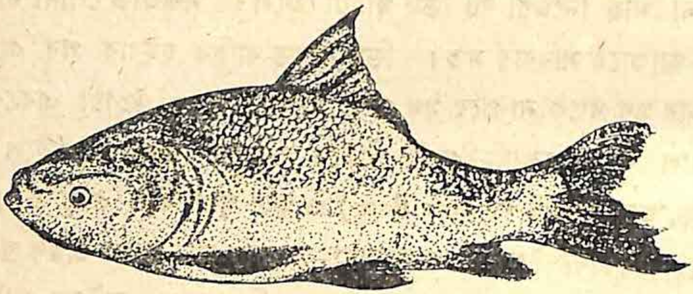
বঙ্গদেশে চল্‌তি কথায় পোনার বাচ্ছাকে **ডিম পোনা**, ধানের মত আকার বিশিষ্টকে **ধানি পোনা**, ১″—৩″ আকারের পোনাকে **চারা পোনা** এবং ৩″—৬″ পোনাকে **চালা পোনা** বলা হয়। ইংরাজীতে এক ইঞ্চি অবধি ডিম পোনাকে Fry, ১″—৬″ দীর্ঘ পোনাকে Fingerling, এবং ৬″ অধিক দীর্ঘ হইলে Carp বলে। পোনা মাছ দুই বৎসরের হইলে প্রজননক্ষম হয় (Sexually ripe)।

বিভিন্ন জাতীয় পোনা মাছ সাধারণতঃ জলের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বাস করে এবং ঐসব স্তর হইতে খাদ্য গ্রহণ করে। সুতরাং ঐসব স্তরে খাদ্য পাইবার সুযোগ অনুযায়ী উহাদের বৃদ্ধি নির্ভর করে।

কাতলা মাছ—কাত্‌লা মাছ সাধারণতঃ জলের উপর স্তরে থাকে। জলের উপর দিকে যে সব ক্ষুদ্র চিংড়ি, জলের মাছি (water fleas) ও কীট পতঙ্গাদি থাকে সেইগুলি খায়। জলে এইসব না থাকিলে কাত্‌লা মাছ বাড়ে না, কারণ উহারা শেওলা প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদ বিশেষ পছন্দ করে না। যে সব জলাশয়ের মধ্যে অধিক

নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ (submerged weeds) থাকে সেইরূপ জলে কাত্লা মাছ বাড়ে না।

সকলপ্রকার পোনা মাছের মধ্যে কাত্লা মাছ সর্ব্বাপেক্ষা তাড়াতাড়ি বাড়িয়া থাকে, এমন কি একমাসে ৩"—৪" পর্য্যন্ত বাড়িতে দেখা গিয়াছে। সাধারণতঃ প্রথম বৎসরে ইহারা ১৫"—১৮" দীর্ঘ



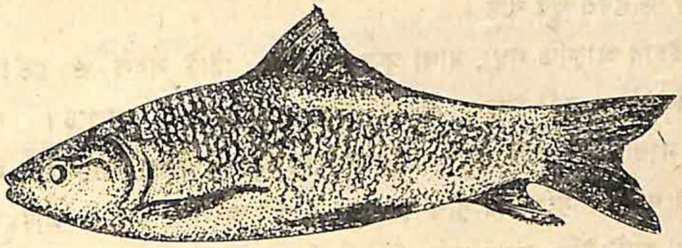
কাত্লা মাছ

হয়। কাতলা মাছ ৪ ফুটেরও অধিক বড় হয়। ইহার দেহকাণ্ড প্রশস্ত, দেহের অনুপাতে মাথার আকার বড় হয়। মুখগহ্বর বড় ও উপর দিকে বিস্তৃত। ঠোঁট সমান ও বার্বেল্হীন। পৃষ্টপাখ্না (Dorsal fin) প্রশস্ত, উহাতে ১৪—১৬টি কাঁটা (Rays) থাকে। সাধারণতঃ দেহবর্ণ অস্বচ্ছ শুভ্র কিন্তু জলজ উদ্ভিদপূর্ণ জলে থাকিলে বর্ণ কাল্চে (darkish) হইয়া যায়।

কাত্লার ডিম পোনার মাথা শরীর অনুপাতে বড় ও প্রশস্ত হয়। ফুলকার লাল আভা পাত্লা কানকুয়ার উপর হইতে দেখা যায়। চওড়া পৃষ্ঠপাখ্নার কিনারা পাঁশুটে বর্ণ এবং দেহের রং ফিকা হয়। ঠোঁটের উপরিভাগ অপেক্ষা নিম্নভাগ বড় হয়।

রুই মাছ—রুই মাছ জলের মধ্যস্তরে থাকে এবং সাধারণতঃ ঐ স্থানের খাদ্যের উপর উহারা নির্ভর করে। রুই মাছ প্রায় সর্ব্বপ্রকার ঈষৎ পচা (Semi rotten) নরম জলজ উদ্ভিদ অধিক খাইয়া থাকে। মাটি, বালিও খায়। রুই মাছ ও দ্রুত বাড়িয়া থাকে, কিন্তু কাত্লা

মাছের মত অত তাড়াতাড়ি বাড়ে না। প্রথম বৎসরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ১৪"—১৬" হয়। রুই মাছ ৩ ফুটের অধিক দীর্ঘ হয়। সর্ব্ব-প্রকার পোনা মাছের মধ্যে রুই মাছ স্বাদে শ্রেষ্ঠ। ইহার ক্ষুদ্র, সরু মস্তক দেখিয়া সহজে চেনা যায়। মুখবিবর ক্ষুদ্র, নিম্ন ওষ্ঠ কুঞ্চিত (fringed)। দেহকাণ্ডের উভয় পার্শ্বের আঁশের রং মেটে লালচে

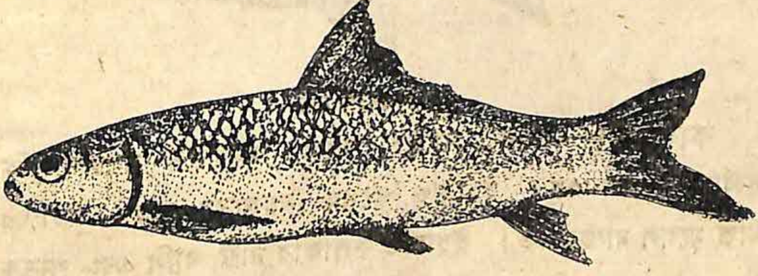


রুইমাছ

(dull redish) এবং পাখ্‌নার রং ফিকা লাল। পৃষ্ঠপাখ্‌নায় ১২—১৩টি কাঁটা থাকে। ইহার দেহকাণ্ড কাত্‌লা অপেক্ষা দীর্ঘ হইয়া থাকে।

রুই মাছের ডিম পোনার লেজের গোড়ার কাছে সুস্পষ্ট কাল দাগ থাকে। কিছু বড় হইলে ঐ দাগ অদৃশ্য হইয়া যায়। নিম্নোষ্ঠ অপেক্ষা উপরোষ্ঠ দীর্ঘ ও কুঞ্চিত। পাখ্‌নার নরম কাঁটাগুলি লালবর্ণ বিশিষ্ট দেখায়।

মৃগেল—পোনা মাছের মধ্যে রুই, কাত্‌লার পরেই মৃগেল মাছের স্থান। ইহারা জলের নিম্নস্তরের মাছ। জলাশয়ের নিম্নে যে সব

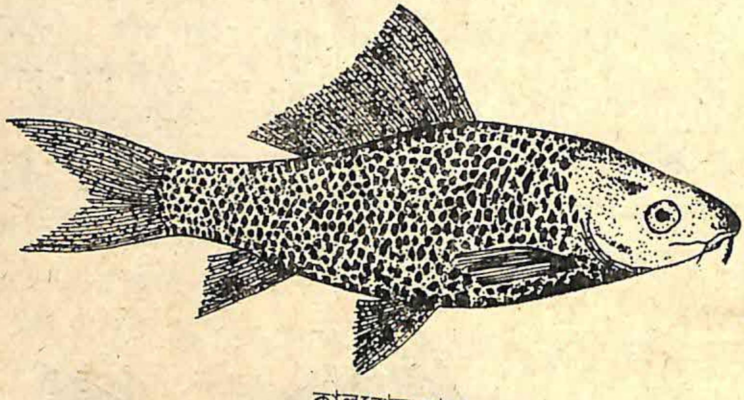


মৃগেল মাছ

খাদ্য পাওয়া যায় প্রধানতঃ তাহাই উহারা খাইয়া থাকে। ইহারা পুকুরের তলার মাটি ও বালি খায়। মাটির মধ্যে জান্তব পদার্থ এবং লবণের জন্য উহারা মাটি খাইয়া থাকে। পুকুরের তলায় পলিমাটি থাকিলে এই জাতীয় মাছ শীঘ্র বাড়ে। ইহারা কাত্‌লার মত জলজ কীটাণু ও ক্ষুদ্র চিংড়ি খাইতে ভালবাসে এবং পচা ও অর্দ্ধপচা জলজ উদ্ভিদও খুব খায়।

ইহার আকৃতি লম্বা, মাথা ক্ষুদ্র ও লম্বা, ঠোঁট সরল ও ভোঁতা, মুখবিবর ক্ষুদ্র, বর্ণ উজ্জ্বল রূপার মত এবং পাখ্‌না লাল্‌চে। পৃষ্ঠ-পাখ্‌নায় ১২—১৩টি কাঁটা থাকে। দেহকাণ্ড কাত্‌লা অপেক্ষা দীর্ঘ হইয়া থাকে। মৃগেলের বৃদ্ধি কাত্‌লা ও রুই অপেক্ষা ধীর। আটমাসে ইহারা আট ইঞ্চি, কখন কখন কিছু বেশী লম্বা হয়। ইহারা ৩ ফুটের অধিক বড় হয়।

মৃগেলের ডিম পোনার ঠোঁট পাত্‌লা ও সমান এবং ওষ্ঠের কিনারা সাদা। লেজের গোড়ার কছে হীরকাকার একটা কাল দাগ থাকে এবং দেহের পৃষ্ঠভাগ ফিকা সবুজ বর্ণের আভাময় দেখায়।



কালবোস মাছ

কালবোস—পোনা মাছের মধ্যে কালবোস মাছের বৃদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা কম হয়। ইহারাও জলের নিম্নস্তরের মাছ। ইহাদের খাদ্য মৃগেল মাছের মত। ইহারাও তলাকার মাটি, বালি এবং শামুক ও পোকামাকড় অধিক খায়। জলজ উদ্ভিদও খায়।

ইহার রং কাল, ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র মাথা, কুঞ্চিত ঠোঁট এবং কাল ক্ষুদ্র বার্‌বেল্‌ দেখিয়া সহজে চেনা যায়। ইহাদের পৃষ্ঠপাখ্‌নায় ১২—১৬টি কাঁটা থাকে। ইহারা অতি ধীরে ধীরে বাড়ে। প্রথম বৎসরে ১০"—১২" অধিক বড় হইতে দেখা যায় না। সচরাচর কালবোস মাছ ২½ ফুটের অধিক বড় হয় না।

কালবোসের ডিম পোনার দেহ ধূসরবর্ণ এবং কাল বার্‌বেল্‌ থাকে। ইহাদের উপর ওষ্ঠ বড়, লেজের গোড়ায় একটি সাদা স্থানের চারিদিকে ছোট কাল, কাল বিন্দু দেখা যায়।
